স্থানান্তর করাকে ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার বলা হয়। ইন্টারনেট হলো সবচেয়ে বহুল ব্যবহারিক তথ্য-প্রযুক্তি। নানা ধরনের software মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যেমন :

১. Telenet (Telephone Network): এর মাধ্যমে ইন্টারনেটের সাহায্যে এক কম্পিউটারকে অন্য কম্পিউটারের সাথে সংযুক্ত করা হয়।
২. FTP Session (File Transfer Protocol): এর মাধ্যমে এক কম্পিউটার থেকে অন্য কম্পিউটারে ফাইল আদান-প্রদান করা হয়।
৩. IRC (Internet Relay Chat): এর মাধ্যমে অনেক ইন্টারনেট ব্যবহারকারী নিজেদের সাথে আলাপ-আলোচনা করতে পারে।
৪. E-mail (Electronic Mail): এর মাধ্যমে একজন ইন্টারনেট ব্যবহারকারী তাৎক্ষণিক ভাবে অন্য ইন্টানেট ব্যবহারকারীর সাথে তথ্য আদান-প্রদান করতে পারে।
৫. Copies: এর মাধ্যমে খুব সহজে ফাইল কপি করা যায়।
৬. WWW (World Wide Web): এখানে তথ্যগুলো মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে একই সময়ে চিত্র ও শব্দ সহকারে পাওয়া যায়।
৭. Net News: এর মাধ্যমে খুব সহজে নিউজ গ্রুপগুলোর মধ্যে তথ্য আদান-প্রদান করা হয়।

ইন্টারনেট প্রোটোকল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে তথ্য আদান-প্রদানে কিছু নিয়মনীতি প্রদান করে। যাতে সহজে তথ্য ব্যবহার ও আদান প্রদান করা যায়। যেমন :

১. Internet Network Information Center বা INIC এরা ডোমেইন নামে রেজিস্ট্রি করে।
২. Internet Society–ইন্টারনেট প্রোটোকল কি হবে তা নিয়ন্ত্রণ করে।
৩. World Wide Wel Consortium–ভবিষ্যতে ওয়েব প্রোগ্রামিং ভাষা কি হবে।

বর্তমানে প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে নানা অসাধ্য কাজ সম্ভব হয়েছে। এটি ব্যবহার করে কিছু দেশ যেমন উন্নতি করেছে; সাথে সাথে উন্নয়নশীল দেশগুলোতেও এই তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে অবস্থার উন্নয়ন করার চেষ্টা করছে। বাংলাদেশেও আধুনিক সময়ে ব্যাপক ভাবে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার হচ্ছে। সরকারি কাজে বর্তমানে তথ্য সংরক্ষণের জন্য ব্যাপকভাবে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার করা হচ্ছে। ভর্তিপরীক্ষা, চাকরিপরীক্ষা ইত্যাদিতে এই প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়। যেমন: কালিয়াকৈরে ২৬৪ একর জমির উপর 'হাইটেক পার্ক' এবং মহাখালিতে ৪৭ একর জমির উপর 'তথ্যপ্রযুক্তি পল্লি' স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া আমাদের দেশে তথ্য-প্রযুক্তির শিক্ষাপ্রদানের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণ করা হয়েছে। যাতে আগামী প্রজন্ম তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহারে দক্ষ ও উন্নতি সাধন করতে পারে।

দ্বিতীয় খণ্ড

সাহিত্য

বঙ্গবাণী
আবদুল হাকিম

কিতাব পড়িতে যার নাহিক অভ্যাস।
সে সবে কহিল মোতে মনে হাবিলাষ ॥
তে কাজে নিবেদি বাংলা করিয়া রচন।
নিজ পরিশ্রম তোষি আমি সর্বজন ॥

আরবি ফারসি শাস্ত্রে নাই কোনো রাগ।
দেশি ভাষে বুঝিতে ললাটে পুরে ভাগ ॥
আরবি ফারসি হিন্দে নাই দুই মত।
যদি বা লিখয়ে আল্লা নবির ছিফত ॥
যেই দেশে যেই বাক্য কহে নরগণ।
সেই বাক্য বুঝে প্রভু অপে নিরঞ্জন ॥
সর্ববাক্য বুঝে প্রভু কিবা হিন্দুয়ানী।
বঙ্গদেশি বাক্য কিবা যত ইতি বাণী ॥
মারফত ভেদে যার নাহিক গমন।
হিন্দুর অক্ষর হিংসে সে সবের গণ ॥
যে সবে বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী।
সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি ॥
দেশি ভাষা বিদ্যা যার মনে ন জুয়ায়।
নিজ দেশ তেয়াগী কেন বিদেশ ন যায় ॥
মাতা পিতামহ ক্রমে বঙ্গেত বসতি।
দেশি ভাষা উপদেশ মনে হিত অতি ॥

কবি-পরিচিতি
আবদুল হাকিম ১৬২০ খ্রিষ্টাব্দে (আনুমানিক) সন্দ্বীপের সুধারাম গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। মধ্যযুগের খুবই গুরুত্বপূর্ণ কবি তিনি। যে সময় অনেকে বাংলা ভাষা ব্যবহার না করে পরভাষার প্রতি অনুরাগী ছিলেন, সে সময় তিনি ঐ মনোভাবের তীব্র বিরোধিতা করেন। এ কবির আটটি কাব্যগ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য: 'নূরনামা', 'ইউসুফ-জলিখা', 'নসীহৎ-নামা', 'কারবালা ও শহরনামা' ইত্যাদি। মাতৃভাষার প্রতি অপরিসীম দরদের জন্য বাঙালির হৃদয়ে এ কবির স্থান অম্লান হয়ে থাকবে। ১৬৯০ খ্রিষ্টাব্দে (আনুমানিক) তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

মূল বক্তব্য

আবদুল হাকিমের 'নূরনামা' কাব্যগ্রন্থ থেকে এই কবিতাংশটুকু 'বঙ্গবাণী' নামে গ্রহণ করা হয়েছে। কবি এখানে বক্তব্য-প্রধান। তিনি লক্ষ করেছিলেন, অনেকে বাংলা ভাষাকে অপ্রধান ও অবজ্ঞা করে আরবি-ফার্সি ভাষাকে বড় করে ভাবেন। অথচ, তাদের জন্ম এই দেশে এবং বাংলাই তাদের মাতৃভাষা। যারা এরূপ ভাবেন তাদের উদ্দেশে কবি স্পষ্ট করে বলেছেন, আরবি-ফারসি ভাষা ও সেই ভাষায় লিখিত গ্রন্থের প্রতি তাঁর কোনো বিরাগ নেই। কিন্তু যারা বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং বাংলা যাদের মাতৃভাষা তারা কেন বাংলাকে বাদ দিয়ে পরভাষার প্রতি আকৃষ্ট হবে? সৃষ্টিকর্তা সব ভাষাই বোঝেন। তাই বাংলাকে বাদ দিয়ে অন্য ভাষার প্রতি অতি দুর্বলতা ভালো নয়। কবিতার শেষ দিকে তিনি ক্ষোভ গোপন রাখতে না পেরে বলেছেন, তারপরও যদি কেউ মাতৃভাষার চেয়ে পরভাষাকে বেশি ভালোবাসে এবং নিজভাষাকে হিংসা করে তাহলে সে দেশ ছেড়ে চলে যায় না কেন? মা-বাবা পরম্পরায় বাংলাদেশে বাস করবে আর বাংলাদেশ, বাংলা ভাষা, বাঙালি সংস্কৃতির বিরোধিতা করবে–তা হবে না। স্বদেশ ও স্বভাষার প্রতি অনুগত্যের চেয়ে হিতকর আর কিছু নেই।

বঙ্গভাষা

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন;
তা সবে, (অবোধ আমি!) অবহেলা করি,
পর-ধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।
কাটাইনু বহু দিন সুখ পরিহরি!
অনিদ্রায়, নিরাহারে সঁপি কায়, মনঃ,
মজিনু বিফল তপে অবরণ্যে বরি;–
কেলিনু শৈবালে; ভুলি কমল-কানন!
স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী কয়ে দিলা পরে;–
"ওরে বাছা মাতৃ-কোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারী-দশা তবে কেন তোর আজি?
যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যা রে ফিরি ঘরে!"
পালিলাম, আজ্ঞা সুখে; পাইলাম কালে
মাতৃ-ভাষা-রূপে খনি, পূর্ণ মণিজালে ॥

কবি-পরিচিতি

১৮২৪ খ্রিষ্টাব্দে যশোরের সাগরদাঁড়ি গ্রামে মধুসূদন দত্ত জন্মগ্রহণ করেন। কপোতাক্ষ নদের তীরবর্তী ছোট্টগ্রাম সাগরদাঁড়িতে প্রাথমিক লেখাপড়া শেষ করলে মধুসূদন দত্তকে পাঠানো হয় কলকাতাতে উচ্চশিক্ষা নেবার জন্য। তাঁর পিতা ছিলেন প্রখ্যাত আইনজীবী রাজনারায়ণ দত্ত ও মাতা জমিদারকন্যা জাহ্নবী দেবী। কলকাতাতে পড়তে এসে মধুসূদন দত্ত পাশ্চাত্য উদার ধ্যানধারণার সাথে পরিচিত হন এবং তাঁর মনে কবি হবার ইচ্ছে জাগে। ইংরেজিতে কাব্যচর্চা করবেন বলে তিনি বাঙালির সবই বিসর্জন দেন। ভাষা ত্যাগ করেন; পোশাক পাল্টান; ফ্যাশনে ইংরেজ হতে চান এমনকি ধর্মও পরিবর্তন করে খ্রিস্ট ধর্ম নেন। তাঁর নাম হয় মাইকেল মধুসূদন দত্ত। এতো কিছু বিসর্জন দিলেও ইংরেজ পরিমণ্ডলে তাঁর ঠাঁই হয়নি। তিনি ফিরে আসেন বাংলার রাজ্যে, বাংলার সংস্কৃতির আদরে। বাংলা যে সহনশীলা! মায়ের মতো অবোধ সন্তান মধুসূদনকে বাংলা বুকে তুলে নেয়। এরপর মধুসূদন লিখতে থাকেন তাঁর নাটক; ১৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দে লেখেন 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' নামে দুটো প্রহসন; ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে লেখেন 'পদ্মবর্তী', নাটক; ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দে বের হয় নাটক 'কৃষ্ণকুমারী'। ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দেই লেখেন 'তিলোওমাসম্ভব কাব্য'; ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দে রচনা করেন তাঁরই শুরু অমর কাব্য নয়, বাংলা কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে চিরভাস্বর কাব্য 'মেঘনাদবধ কাব্য' নামের মহাকাব্য। এরপর বের হয় 'ব্রজঙ্গানা কাব্য' (১৮৬১), 'বীরাঙ্গনা কাব্য' (১৮৬২)। ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দে মধুসূদন দত্ত ফ্রান্সের ভার্সাই থাকাকালে লেখেন সনেট, যেগুলো,

'চতুর্দশপদী কবিতা' নামে প্রকাশ পায়। শেষজীবনে তিনি কলকাতায় ছিলেন এবং সেখানে ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দের ২৯শে জুন মৃত্যুবরণ করেন। সাহিত্যের সবক্ষেত্রে মধুসূদন বিদ্রোহ করেছেন। বিষয়ে এনেছেন নতুনত্ব, আঙ্গিকে এনেছেন অভিনবত্ব। তাই তাঁকে বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিদ্রোহী লেখক হিসেবেও অভিহিত করা হয়।

মূল বক্তব্য

'বঙ্গভাষা' মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'চতুর্দশপদী কবিতাবলি' নামের সনেটগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত। কবি তখন ফ্রান্সের ভার্সাই-এ। তাঁর মনে স্বভাষা ও স্বসংস্কৃতিকে একদা অবজ্ঞা করার জন্য এখন দুঃখবোধ কাজ করছে। আক্ষেপ ও মনস্তাপে কবি বাংলা ভাষার ঐশ্বর্য ও সম্ভাবনার কথা এখানে তুলে ধরেছেন। কবি বলেছেন, বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির ভাণ্ডারে বহু রত্ন আছে। কিন্তু তা আমি আগে বুঝতে পারিনি। মনে করেছি অন্য ভাষা ও সংস্কৃতিই শ্রেষ্ঠ। অন্য ভাষা ও সংস্কৃতির জন্য জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়টুকু ব্যয় করার পর বুঝতে পারলাম আমি ভুল করেছি। পদ্মফুল ফেলে আমি শৈবাল নিয়ে খেলেছি। কিন্তু একদিন স্বপ্নে কুললক্ষী দেখা দিলেন। তিনি বললেন, তুই কী করছিস? মাতৃভাষায় এতো ঐশ্বর্য রেখে তুই পরভাষার মরুভূমিতে বিচরণ করছিস? এ ভিখেরির দশা কেন তোর? সেই কুললক্ষীর আজ্ঞাতেই আমি পথ ফিরে পেলাম, আবার বাংলার খনিতে মুক্তোর সন্ধানে নেমে মুঠো ভরে পেলাম মনিমুক্তো। আসলে এই কবিতার মধ্য দিয়ে মাইকেল মধুসূদন দত্ত নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে জানিয়েছেন, বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি সবদিক থেকেই পরিপূর্ণ। আমরা কেউ যেন একে আর অবজ্ঞা না করি।

খাঁচার ভিতর অচিন পাখি

লালন সাঁই

খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়।
ধরতে পারলে মনোবেড়ি দিতাম পাখির পায় ॥

আট কুঠুরী নয় দরজা আঁটা
মধ্যে মধ্যে ঝলকা কাটা
তার উপরের সদর কোঠা
আয়না-মহল তায় ॥

কপালের ফ্যার নইলে কি আর
পাখিটির এমন ব্যবহার
খাঁচা ভেঙ্গে পাখি আমার
কোন-বনে পালায় ॥
মন তুই রইলি খাঁচার আশে
খাঁচা যে তোর কাঁচা বাঁশে
কোনদিন খাঁচা পড়বে ধ্বসে
ফকির লালন কেঁদে কয় ॥

কবি-পরিচিতি

লালন সাঁইয়ের জন্মের বছর নিয়ে মতান্তর থাকলেও ১৭৭২ সালে তাঁর জন্ম ও ১৭ই অক্টোবর, ১৮৯০ সালে তাঁর মৃত্যু বলে অনেকেই মনে করেন। তাঁর জন্মস্থান নিয়েও মতান্তর আছে। অনেকে মনে করেন, বাংলাদেশের ঝিনাইদহ জেলার হরিণাকুণ্ড উপজেলার হারিশপুর গ্রামে তাঁর জন্ম, অনেকের মতে কুষ্টিয়ার কুমারখালি থানার চাপড়া ইউনিয়নের অন্তর্গত ভাড়ারা গ্রামে জন্মেছিলেন লালন। তবে তিনি যে বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী একজন বাঙালি, ছিলেন একাধারে আধ্যাত্মিক বাউল সাধক, মানবতাবাদী, সমাজসংস্কারক ও দার্শনিক এ ব্যাপারে কোনো তর্ক নেই। আর সবাই জানেন, তিনি ছিলেন অসংখ্য গানের গীতিকার, সুরকার ও গায়ক। লালনকে বাউল গানের অগ্রদূতদের একজন হিসেবে বিবেচনা করা। তাঁর গানের মাধ্যমেই উনিশ শতকে শতকে বাউল গান বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। তাঁকে 'বাউল সম্রাট' হিসেবেও আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। লালন ছিলেন একজন মানবতাবাদী, যিনি ধর্ম, বর্ণ, গোত্রসহ সকল প্রকার জাতিগত বিভেদ থেকে সরে এসে মানবতাকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছিলেন। অসাম্প্রদায়িক এই মনোভাব থেকেই তিনি তাঁর গান রচনা করেছেন। তাঁর গান ও দর্শন যুগে যুগে প্রভাবিত করেছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম ও অ্যালেন গিন্সবার্গের মতো বহু খ্যাতনামা কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক, বুদ্ধিজীবীসহ অসংখ্য মানুষকে। লালনের জীবদ্দশায় তাঁর একমাত্র স্কেচটি অঙ্কন করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভ্রাতা

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। লালনের মৃত্যুর বছরখানেক আগে ৫ই মে, ১৮৮৯ সালে পদ্মায় তাঁর বোটে বসিয়ে তিনি এই পেন্সিল স্কেচটি করেন। নিজ সাধনাবলে লালন সাঁই হিন্দুধর্ম এবং ইসলামধর্ম উভয় শাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন। তাঁর রচিত গানে এর পরিচয় পাওয়া যায়। 'প্রবাসী' প্রত্রিকার নিবন্ধে বলা হয়, লালনের সকল ধর্মের লোকের সাথেই সুসম্পর্ক ছিল। মুসলমানদের সাথে তাঁর সুসম্পর্কের কারণে অনেকে তাকে মুসলমান বলে মনে করত। আবার বৈষ্ণবধর্মের আলোচনা করতেন দেখে হিন্দুরা তাঁকে বৈষ্ণব মনে করত। প্রকৃতপক্ষে লালন ছিলেন মানবতাবাদী এবং তিনি ধর্ম, জাত, কুল, বর্ণ, লিঙ্গ ইত্যাদি অনুসারে মানুষের ভেদাভেদ বিশ্বাস করতেন না। গানে নিজের নামের সঙ্গে তিনি প্রয়োজন মতো 'ফকির' শব্দটি অনেক ব্যবহার করেছেন। ১৮৯০ সালের ১৭ই অক্টোবর ১১৬ বছর বয়সে কুষ্টিয়ার কুমারখালির ছেউড়িয়াতে নিজ আখড়ায় লালন সাঁই মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর দিন ভোর ৫টা পর্যন্ত তিনি গানবাজনা করেন এবং এক সময় তাঁর শিষ্যদের বলেন: 'আমি চলিলাম' এবং এর কিছু সময় পরই তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁরই উপদেশ অনুসারে ছেউড়িয়ায় নিজ আখড়ায় একটি ঘরে তিনি সমাধিস্থ আছেন। আজও বাউলেরা অক্টোবর মাসে ছেউড়িয়ায় মিলিত হয়ে লালনের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। 'বাড়ির কাছে আরশি নগর', 'আমার ঘরখানায় কে বিরাজ করে', 'জাত গেল জাত গেল বলে' ইত্যাদি বহু গানের মধ্য দিয়ে লালন সাঁই বিভেদমুক্ত এক মুক্ত পৃথিবীর স্বপ্ন প্রকাশ করেন।

মূল বক্তব্য

বাংলার মরমী সাহিত্যে দেহকে নানা অনুষঙ্গের সঙ্গে তুলনা করতে দেখা যায়। 'চর্যাপদে'র প্রথম পদে দেহকে বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। লালন সাঁই নিজস্ব মরমীচিন্তায় দেহকে খাঁচা আর আত্মাকে অচেনা পাখির সঙ্গে তুলনা করেছেন। লালন ছিলেন মূলত আত্মার স্বরূপ-সন্ধানী মরমী দার্শনিক। তিনি আত্মার অদৃশ্য গমনাগমনের রহস্য উন্মোচনে আগ্রহী। দেহাভ্যন্তরে আত্মা কী করে প্রবিষ্টি হয়, কী করেই–বা তার নির্গমন ঘটে–এই দার্শনিক জিজ্ঞাসা ছিল তাঁর আজন্মলালিত। লালন সাঁই বলেছেন, মানুষ দেহের দিকেই নজর বেশি দেয়, এর পরিচর্যাতেই সময়ক্ষেপণ করে, কিন্তু এই খাঁচা যতোই সুন্দর হোক, একদিন তা খসে পড়বে এবং আত্মারূপী অচেনা পাখিটি উড়ে যাবে। এই অচেনা পাখিটির স্বরূপ আবিষ্কারই ছিল তাঁর মুখ্য ভাবনা। বহির্জগতের আড়ম্বরতায় নয়, আত্মিক প্রশান্তিতেই হোক জীবনের পরিসমাপ্তি–এখানে এই কামনাই প্রধান।

নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের 'পর,

কেমনে পশিল গুহার আঁধারে প্রভাত-পাখির গান।
না জানি কেন রে এতদিন পরে
জাগিয়া উঠিল প্রাণ।
জাগিয়া উঠেছে প্রাণ,
ওরে উথলি উঠেছে বারি,
ওরে প্রাণের বাসনা প্রাণের আবেগ
রুধিয়া রাখিতে নারি।
থর থর করি কাঁপিছে ভূধর,
শিলা রাশি রাশি পড়িছে খসে,
ফুলিয়া ফুলিয়া ফেনিল সলিল
গরজি উঠিছে দারুণ রোষে।
হেথায় হেথায় পাগলের প্রায়
ঘুরিয়া ঘুরিয়া মাতিয়া বেড়ায়,
বাহিরিতে চায়, দেখিতে না পায়,
কোথায় কারার দ্বার।
কেন রে বিধাতা পাষাণ হেন,
চারি দিকে তার বাঁধন কেন?
ভাঙ্ রে হৃদয় ভাঙ্ রে বাঁধন,
সাধ্ রে আজিকে প্রাণের সাধন,
লহরীর পরে লহরী তুলিয়া
আঘাতের পরে আঘাত কর।
মাতিয়া যখন উঠেছে পরান
কিসের আঁধার, কিসের পাষাণ!
উথলি যখন উঠিছে বাসনা,
জগতে তখন কিসের ডর!

আমি ঢালিব করুণাধারা,
আমি ভাঙিব পাষাণকারা,
আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া

আকুল পাগল-পারা;
কেশ এলাইয়া, ফুল কুড়াইয়া,
রামধনু-আঁকা পাখা উড়াইয়া,
রবির কিরণে হাসি ছড়াইয়া *

দিব রে পরান ঢালি।

শিখর হইতে শিখরে ছুটিব,
ভূধর হইতে ভূধরে লুটিব,
হেসে খলখল গেয়ে কলকল
তালে তালে দিব তালি।
এত কথা আছে এত গান আছে
এত প্রাণ আছে মোর,
এত সুখ আছে এত সাধ আছে

প্রাণ হয়ে আছে ভোর॥

কী জানি কী হল আজি জাগিয়া উঠিল প্রাণ,
দূর হতে শুনি যেন মহাসাগরের গান–
ওরে, চারি দিকে মোর
এ কী কারাগার ঘোর–
ভাঙ্ ভাঙ্ ভাঙ্ কারা, আঘাতে আঘাত কর্ ।
ওরে, আজ কী গান পেয়েছে পাখি,
এয়েছে রবির কর ॥

কবি-পরিচিতি

১২৬৮ বঙ্গাব্দের ২৫শে বৈশাখ (১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই মে) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলকাতার সম্ভ্রান্ত ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আর মাতার নাম সারদা দেবী। রবীন্দ্রনাথ মা-বাবার চতুর্দশ সন্তান ও অষ্টম পুত্র। স্কুলজীবনে তিনি মনোযোগী ছিলেন না কিন্তু শিক্ষাজীবন তিনি যাপন করেন উন্মুক্তভাবে। তাই বাংলা মাধ্যম, ইংরেজি মাধ্যম, বিদেশের স্কুল সর্বত্রই তিনি কমবেশি পড়েছেন। কিন্তু কোথাও কোর্স সমাপ্ত করেননি। ১৮৭৮ খ্রিষ্টাব্দের আগেই 'জ্ঞানাঙ্কুর'ও 'প্রতিবিম্ব' পত্রিকায় 'বনফুল' নামের কাব্য এবং 'ভারতী' প্রত্রিকায় 'কবি-কাহিনী' নামের কাব্য রচনা করেন। সেই থেকে সাহিত্যরচনার প্রতি রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ দেখা যায়। তাই পরবর্তীকালে তিনি বাংলাসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, ছোটগল্পকার, প্রাবন্ধিক, সঙ্গীতরচয়িতা এবং সেরা দার্শনিক, সুরস্রষ্টা, চিত্রশিল্পী ইত্যাদি হিসেবে অভিহিত হন। বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে তিনি রোমান্টিকতার আবহে নব আধুনিকতার সূত্রপাত করেন। মধুসূদন দত্তের আধুনিকতার চেয়ে রবীন্দ্রনাথে আধুনিকতা সম্মুখবর্তী এ কারণে যে, বাংলা কবিতায় বিষয়ধারণের সর্বময় ক্ষমতা তিনি এতে প্রয়োগ করেন এবং সফল হয়। 'মানসী' বা 'কল্পনা' তে যেমন অতীন্দ্রিয় অনুভবকে, তেমনি 'পুনশ্চ' বা 'শ্যামলী' তে আটপৌরে বিষয় ও ভাবকে তিনি ধারণ করেছেন। তাঁর কাব্যকলায় অসামান্য

অবদানের স্বাক্ষর হিসেবে 'গীতাঞ্জলি' গ্রন্থটি ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হয়। তিনি ৫৬টি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। এগুলোর মধ্যে 'সোনার তরী' (১৮৯৪), 'চিত্রা' (১৮৯৬), 'বলাকা' (১৯১৫) ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৮৮৩ সালের ৯ই ডিসেম্বর যশোরের (বর্তমান খুলনা) কন্যা ভবতারিণী দেবীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিয়ে হয়। ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ২২শে শ্রাবণ (১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই আগস্ট) তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

মূল বক্তব্য

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবির আত্মজাগরণের কথামালা। কবি প্রথমজীবনে যে বিশ্বাস ও ধারার কবিতা লিখেছেন এই কবিতার মাধ্যমে সেই পূর্বতন ধারা যেন ছিন্ন হলো, তিনি কাব্যকলার নবপ্রভাতের দর্শন পেলেন। এই নবপ্রভাত পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনে সত্যি সূর্যালোকিত উজ্জ্বল দিবস এনে দিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে যে ধারায় কবিতা লিখে বাঙালির চিত্তকে জয় করেছিলেন এবং বিশ্বব্যাপী সমাদৃত হয়েছিলেন তার সূচনাবার্তা যেন এই কবিতা। তিনি এই কবিতায় বলেছেন, তাঁর চিত্তের জাগরণ ঘটেছে, যেমন করে পর্বত কেঁপে ওঠে, রাশি রাশি শিলা খসে পড়ে, সাগরে ঢেউ ওঠে এবং যেকোনো অব্যক্ত কিছুই ব্যক্ত হতে চায় ঠিক সেভাবে। কিন্তু এই প্রকাশমানতার বাধা প্রাকৃতিকভাবেই সর্বত্র। সেই বাধা অতিক্রম করে আত্মজাগরণে চিত্তকে সুচারু করা আবশ্যক। নিজের মধ্যে যখন করুণার ধারা প্রবাহিত করার মানসিকতা, চতুর্দিকে পাষাণ প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করার অভীপ্সা এবং মহানন্দে জগৎ উপভোগ করার জন্য নিজের মনোপাখি সতত অস্থির, তখন ঘরে বসে আত্মকুণ্ডলায়নের পথে সংস্কারের আয়োময়ে আবদ্ধ থাকা নয়। কবি উল্লেখ করেছেন, মনের মধ্যে যদি ইচ্ছের জাগরণ থাকে তাহলে সেই মহাসাগরের গান মানুষকে নিয়ে যেতে পারে অনন্তের পথে। আর এই গান শুনবার জন্যে মনোজগতের অদৃশ্য কারাকে আঘাতে চূর্ণ করাই প্রথম কর্তব্য।

আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে

কাজী নজরুল ইসলাম

আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে
মোর মুখ হাসে মোর চোখ হাসে মোর টগবগিয়ে খুন হাসে
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে।

আজকে আমার রুদ্ধ প্রাণের পল্বলে–
বান ডেকে ঐ জাগল জোয়ার দুয়ার-ভাঙা কল্লোলে।
আসল হাসি, আসল কাঁদন
মুক্তি এল, আসল বাঁধন,
মুখ ফুটে আজ বুক ফাটে মোর তিক্ত দুঃখের সুখ আসে।
ঐ রিক্ত বুকের দুখ আসে–
আজ সৃষ্টি-সুখের-উল্লাসে!

আসল উদাস, শ্বসল হতাশ,
সৃষ্টিছাড়া বুক-ফাটা শ্বাস,
ফুলল সাগর দুলল আকাশ ছুটল বাতাস,
গগন ফেটে চক্র ছোটে, পিনাক-পাণির শূল আসে!
ঐ, ধূমকেতু আর উল্কাতে
চায় সৃষ্টিটাকে উল্টাতে,

আজ তাই দেখি আর বক্ষে আমার লক্ষ বাগের ফুল হাসে
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে!
আজ হাসল আগুন, শ্বসল ফাগুন,
মদন মারে খুন-মাখা তূণ
পলাশ অশোক শিমুল ঘায়েল
ফাগ লাগে ঐ দিক-বাসে
গো দিগবালিকার পীতবাসে;

আজ রঙ্গন এল রক্ত-প্রাণের অঙ্গনে মোর চারপাশে
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে!
আজ কপট কোপের তূণ ধরি,
ঐ আসল যত সুন্দরী,
কারুর পারে বুক-ডলা খুন, কেউ বা আগুন,
কেউ মানিনী চোখের জলে বুক ভাসে!
তাদের প্রাণের 'বুক-ফাটে-তাও-মুখ, ফোটে-না' বাণীর বীণা মোর পাশে
ঐ তাদের কথা শোনাই তাদের
আমার চোখে জল আসে

আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে!
আজ আসল ঊষা, সন্ধ্যা, দুপুর,
আসল নিকট, আসল সুদূর
আসল বাধা-বন্ধ-হারা ছন্দ-মাতন
পাগলা-গাজন-উচ্ছ্বাসে!
ঐ আসল আশিন শিউলি শিথিল
হাসল শিশির দুর্ব্বাসে
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে!

আজ জাগ্‌ল সাগর, হাস্‌ল মরু
কাঁপ্‌ল ভূধর, কানন-তরু
বিশ্ব-ডুবান্ আস্‌ল তুফান, উছলে উজান
ভৈরবীদের গান ভাসে,
মোর ডাইনে শিশু সদ্যোজাত জরায়-মরা বামপাশে!
মন ছুটছে গো আজ বল্গাহারা অশ্ব যেন পাগ্‌লা সে!
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে!
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে!

কবি-পরিচিতি

বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম ১৩০৬ বঙ্গাব্দের ১১ই জ্যৈষ্ঠ (২৪শে, ১৮৯৯) পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম কাজী ফকির আহমদ আর মায়ের নাম জাহেদা খাতুন। রবীন্দ্র-সমকালে কবিতা লিখে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ এবং রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থ-উৎসর্গ প্রাপ্তি কাব্যজগতে তাঁর প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করে। 'বিদ্রোহী' কবিতা রচনা করে নজরুল বাংলাকাব্যের প্রথাগত তছনছ করে দেন। নিজের কবিতায় তিনি ব্যতিক্রমী এমন সব বিষয় ও শব্দ ব্যবহার করেন, যা আগে কখনও ব্যবহৃত হয়নি। কবিতায় তিনি সমকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক যন্ত্রণাকে ধারণ করায় অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। তবে জাতপাতের সমস্যা, নর-নারীভেদ, হিন্দু-মুসলিম বিভেদ ইত্যাদির মতো মানবসভ্যতার কয়েকটি সমস্যাও ছিল তাঁর কবিতার উপজীব্য। নজরুল তাঁর সৃষ্টিকর্মে হিন্দু-মুসলিম মিশ্র ঐতিহ্যের পরিচর্যা করেন। কবিতা ও গানে তিনি এ মিশ্র ঐতিহ্যচেতনাবশত প্রচলিত বাংলা ছন্দোরীতি ছাড়াও অনেক সংস্কৃত ও আরবি ছন্দ ব্যবহার করেন। নজরুলের ইতিহাস-চেতনা ছিল সমকালীন কিন্তু তিনি দূর ও নিকট অতীতের ইতিহাসও সমভাবে স্বদেশ ও আন্তর্জাতিক বিশ্বজিজ্ঞাসার আধারে গ্রহণ করেছেন। তাই তাঁর কবিতায় তুর্কি, ফারসি, আরবি শব্দ ও কাব্যভুবন গুরুত্বের সাথে এসেছে। কবিতা লেখার কারণে নজরুলকে ব্রিটিশ শাসক জেলে বন্দি করে। নজরুল রচিত কয়েকটি কাব্যগ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হলো: 'অগ্নি-বীণা' (১৯২২), 'দোলন-চাঁপা' (১৯২৩), 'বিষের বাঁশি' (১৯২৪), 'ভাঙার গান' (১৯২৪), 'ছায়ানট' (১৯২৫), 'চিত্তনামা' (১৯২৫), 'সাম্যবাদী' (১৯২৫), 'পুবের হাওয়া' (১৯২৬), 'সর্বহারা' (১৯২৬), 'সিন্ধু হিন্দোল' (১৯২৫), 'ফণী-মনসা' (১৯২৭), 'জিঞ্জীর' (১৯২৮), 'চক্রবাক' (১৯২৯), 'প্রলয় শিখা' (১৯৩০) ইত্যাদি। এই গ্রন্থগুলো রচনার প্রেক্ষাপট একদিনে তৈরি হয়নি। ৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯২২ সংখ্যায় নজরুল সম্পাদিত 'ধূমকেতু' পত্রিকায় তাঁর 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতাটি প্রকাশিত হওয়ায় নজরুলের নাম গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়। বন্দি নজরুল বিচারাধীন থাকা অবস্থায় রাজনৈতিক বন্দির

মুক্তির দাবিতে ও জেলের ভেতরের নানা অব্যবস্থার প্রতিবাদে অনশন শুরু করেন। এই অনশনের খবরে সারা দেশ সচকিত হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ স্নেহভাজন কবিকে তারবার্তা পাঠিয়ে অনশন প্রত্যাহারের অনুরোধ জানান এই ভাষায়, 'অনশন ত্যাগ করো–আমাদের সাহিত্য তোমাকে চায়'। অবশেষে নজরুল তাঁর অনশন ভঙ্গ করেন। সরকারও বন্দিদের দাবি মেনে নেয়। দশমাস বন্দিজীবন যাপনের পর নজরুল জেল থেকে ছাড়া পান। জেল থেকে বেরিয়ে নজরুল নতুন উদ্যমে রাজনৈতিক কাজ ও কবিতা রচনা আরম্ভ করেন। ১৯২৫ সালে প্রকাশিত 'লাঙল' পত্রিকার প্রধান পরিচালক হয়েছিলেন নজরুল। এর প্রথম সংখ্যাতেই তিনি লেখেন, 'গাহি সাম্যের গান/ যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা ব্যবধান/গাহি সাম্যের গান।' এরপর 'লাঙল' পত্রিকাতেই তিনি লিখেছিলেন বিখ্যাত 'সাম্যবাদী' কবিতাগুচ্ছ। যেখানে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর সাম্যবাদী চিন্তাধারা এবং জগৎটাকে পালটে দিয়ে নতুন সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষা। 'সাম্যবাদী' কবিতাগুচ্ছে রয়েছে 'ঈশ্বর', 'মানুষ', 'পাপ', 'নারী', 'বারাঙ্গনা', 'কুলিমজুর' ইত্যাদি কবিতা। নজরুলের কবিতায় যেমন বিদ্রোহীভাব আছে তেমনি আছে প্রেমের আকাঙ্ক্ষা। আসলে প্রেম আর বিদ্রোহ একীভূত হয়ে আছে নজরুলের কবিতায়। তিনি উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ, নাটকসহ নানা আঙ্গিকের রচনায় ছিলেন সিদ্ধহস্ত। কাজী নজরুল ইসলাম ১২ই ভাদ্র, ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ২৯শে আগস্ট ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকায় পরলোকগমন করেন।

মূল বক্তব্য

কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে' কবিতায় গভীর আবেগ ও অনুভূতির মাধ্যমে সৃষ্টি সুখের আনন্দ ব্যক্ত করেছেন। কবি বর্তমানে সৃষ্টি সুখের উল্লাস করেন। কারণ সৃষ্টির আনন্দে কবির চোখে মুখে হাসির আভাস পাওয়া যায়। এক সময় কবির যে প্রাণ বদ্ধ ছিল, তা বর্তমানে নদীর বানের জোয়ারের মতো দুকূল ছাপিয়ে যায়। সৃষ্টির পরে কবি হাসি, কান্না, মুক্তি ও বাঁধন ফিরে পান। দুঃখের পরে কবির জীবনে সুখ আসার পর মুখে আনন্দের আভাস ও রিক্ত বুকে অনাবিল সুখ আসে। কবি মনে করেন, সৃষ্টি ছাড়া তাঁর বুক ফাটা শ্বাস সম্ভব ছিল না। সাগর, আকাশ, বাতাস সৃষ্টির উচ্ছ্বাসে নতুনভাবে জেগে ওঠে। সৃষ্টির উল্লাসের কারণে ধূমকেতু, উল্কা সৃষ্টিটাকে উল্টাতে চায়। সৃষ্টি সুখের আনন্দে কবির বুকে যেন লক্ষ বাগানের ফুল ফোটে। সৃষ্টি সুখের আনন্দে আগুন হাসে, ফাগুন হাসে বিশেষ করে পলাশ, অশোক, শিমুলে নতুন করে প্রকৃতি সাজে–যেগুলো কোনো বালিকার মনেও সৌন্দর্য সৃষ্টি করে। কবির প্রাণের চারপাশে রক্তপ্রাণ জেগে ওঠে। কবি এখানে সুন্দরী নারীর বর্ণনা অতি ভাবাবেগের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। এই কবিতায় নারীর প্রাণের গভীরতর বিষয় উন্মোচন করা হয়েছে। তাঁর ধারণা নারীদের মনের ভাবাবেগ হলো তাদের বুক ফাটে তারপর মুখ ফোটে না বা মুখ দিয়ে মনের লুকানো কথা বলতে পারে না। কবি তাদের কথা বলতে গিয়ে নিজের মধ্যে দারুণ উত্তেজনা বোধ করেছেন। তিনি বলেছেন, সৃষ্টি সুখের উল্লাসের জন্য কবির কাছে সকাল, সন্ধ্যা, দুপুর সন্নিকটে মনে হয়। সকল বাধা, বন্ধন, ছন্দ হারিয়ে পাগলা বাতাসের উচ্ছ্বাসে কবির কাছে সুদূরও নিকটে আসে। প্রকৃতিতে আগমন হলো আশ্বিন মাসের শিউলি ফুল, দুর্বাঘাসের উপর শিশির–কবির কাছে তা মনোমুগ্ধকর মনে হয়; সাগর, মরুভূমি, পাহাড়, বন–জঙ্গল, তুফান ও জোয়ারে ভৈরবীদের গান ভেসে আসে। এখানে একপাশে বা একদিকে সদ্য জন্ম নেওয়া মানবশিশু, অন্যদিকে রোগে ভোগা মানুষের লাশ! কবি আজ নিজের মনের আনন্দকে ধরে রাখতে পারছেন না। ভাবনায় ও বিশ্বাসে অসাধারণ আবেগ অনুভূতি ও উচ্ছ্বাসের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন। পরস্পর বিপরীত চিত্র ও অবস্থানের মধ্যেই কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর সৃষ্টির সুখ নিয়ে উত্থিত।

বাংলার মুখ আমি

জীবনানন্দ দাশ

বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ
খুঁজিতে যাই না আর : অন্ধকারে জেগে উঠে ডুমুরের গাছে
চেয়ে দেখি ছাতার মতন বড়ো পাতাটির নিচে বসে আছে
ভোরের দুয়েলপাখি–চারিদিকে চেয়ে দেখি পল্লবের স্তূপ
জাম–বট–কাঁঠালের–হিজলের–অশত্থের করে আছে চুপ;
ফণীমনসার ঝোপে শটিবনে তাহাদের ছায়া পড়িয়াছে!
মধুকার ডিঙা থেকে না জানি সে কবে চাঁদ চম্পার কাছে
এমনই হিজল–বট–তমালের নীল ছায়া বাংলার অপরূপ রূপ

দেখেছিল; বেহুলাও একদিন গাঙুড়ের জলে ভেলা নিয়ে–
কৃষ্ণা দ্বাদশীর জ্যোৎস্না যখন মরিয়া গেছে নদীর চড়ায়–
সোনালি ধানের পাশে অসংখ্য অশ্বত্থ বট দেখেছিল, হায়,
শ্যামার নরম গান শুনেছিল–একদিন অমরায় গিয়ে
ছিন্ন খঞ্জনার মতো যখন সে নেচেছিল ইন্দ্রের সভায়
বাংলার নদী মাঠ ভাঁটফুল ঘুঙুরের মতো তার কেঁদেছিলো পায়।

কবি-পরিচিতি

কবি জীবনানন্দ দাশ ১৮৯৯ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারি বরিশালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের আদি নিবাস ছিল বিক্রমপুরের গাওপাড়া গ্রামে। তাঁর পিতা সত্যানন্দ দাশ স্কুলশিক্ষক ও সমাজসেবক; মাতা কুসুমকুমারী দাশ ছিলেন একজন কবি। তিনি বরিশাল ব্রজমোহন স্কুলে শিক্ষাজীবন শুরু এবং কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরেজিতে অনার্সসহ বি.এ. (১৯১৯) ও এম.এ. (১৯২১) পাস করেন। জীবনানন্দ ছিলেন বাংলা তিরিশের দশকের কাব্যান্দোলনের রবীন্দ্ররীতিবিরোধী অন্যতম কবি। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ঝরাপালক' প্রকাশিত হয় ১৯২৭ সালে। জীবনানন্দ দাশ রচিত অন্য কাব্যগ্রন্থগুলি হচ্ছে: 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' (১৯৩৬), 'বনলতা সেন' (১৯৪২), 'মহাপৃথিবী' (১৯৪৪), 'সাতটি তারার তিমির' (১৯৪৮), 'রূপসী বাংলা' (রচনাকাল ১৯৩৪, প্রকাশকাল ১৯৫৭), 'বেলা অবেলা কালবেলা' (১৯৬১) ইত্যাদি। মূলত কবি হলেও তিনি অনেক ছোটগল্প, বেশ কিছু উপন্যাস ও প্রবন্ধগ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' থেকেই তিনি হয়ে ওঠেন মৌলিক ও ভিন্ন পথের অনুসন্ধানী কবি। 'রূপসী বাংলা' কাব্যগ্রন্থে এই বাংলার রূপবৈচিত্র্য অন্তরের গভীরতর সূত্রে গ্রথিত হয়েছে। রবীন্দনাথের স্বাভাবিক প্রকৃতিচেতনা জীবনানন্দের কবিতায় দর্শন ও জীবনানুভবের বহুমাত্রায় আকর্ষণীয় হয়ে এসেছে। গ্রামবাংলার ঐতিহ্যময় নিসর্গ ও রূপকথা-পুরাণের জগৎ তাঁর কাব্যে হয়ে উঠেছে চিত্ররূপময়। বিশেষত, 'রূপসী বাংলা' কাব্যগ্রন্থে যেভাবে আবহমান বাংলার চিত্ররূপ ও অনুসূক্ষ্ম যৌন্দর্য প্রকাশিত হয়েছে, তাতে তিনি 'রূপসী বাংলার কবি'

হিসেবে খ্যাত হয়েছেন। তবে প্রকৃতির পাশাপাশি জীবনানন্দের শিল্পজগতে মূর্ত হয়েছে বিপন্ন মানবতার ছবি এবং আধুনিক নগরজীবনের অবক্ষয়, হতাশা, নিঃসঙ্গতা ও সংশয়বোধ। জীবনানন্দ ছিলেন একজন কালসচেতন ইতিহাসচেতন কবি। তিনি ইতিহাসচেতনা দিয়ে অতীত ও বর্তমানকে অচ্ছেদ্য সম্পর্কসূত্রে বেঁধেছেন। কবিতায় উপমা প্রয়োগে জীবনানন্দের নৈপুণ্য তুলনাহীন। তাই বলা হয়, 'উপমা জীবনানন্দ দাশস্য'। ১৯৫৪ সালের ২২শে অক্টোবর কলকাতায় তাঁর মৃত্যু হয়।

মূল বক্তব্য

কবি জীবনানন্দ দাশ তাঁর 'বাংলার মুখ আমি' কবিতায় প্রাকৃতির সৌন্দর্যের লীলাভূমি বাংলার নিসর্গের প্রশংসা করেছেন। কবি এদেশের বাংলার অপরূপ সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছেন। তাঁর নিকট বাংলার সৌন্দর্য এতই মনোমুগ্ধকর যে, তিনি আর পৃথিবীর অন্যান্য সৌন্দর্য দেখতে চান না। তাঁর মতে, পৃথিবীর সকল সৌন্দর্যের চেয়ে বাংলার সৌন্দর্য অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। এজন্য তিনি পৃথিবীর অন্যদেশের তার কোনো সৌন্দর্য দেখতে চান না। এ দেশের প্রকৃতির অন্যতম একটি নিদর্শন হলো ডুমুর গাছ, যা রাতের অন্ধকারে তার পাতার নিচে ছায়ার মতো লুকানো ডুমুর অসাধারণ সৌন্দর্যের সৃষ্টি করে। তাছাড়া এখানে ভোরবেলায় দোয়েলের ডাক দেখা যায়। ভোরবেলায় আরো সুন্দর শোভা সৃষ্টি করে গাছের সবুজ পাতা। বাংলায় আরো পাওয়া যায় জাম, বট, কাঁঠাল, হিজল ও অশখ গাছের সবুজের সমারোহ। আর এসব গাছের ছাড়া ফনিমনসার ঝোপটাকে আরো বেশি সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছে। এসব সবুজ হিজল, বট ও তমালের গাছে মৌমাছি আসা-যাওয়া করে, যা অপরূপ সৌন্দর্যের সৃষ্টি করে। এগুলো বাংলার সৌন্দর্যকে বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়। কবি আরো লক্ষ করেন, বেহুলার নদীর জলে ভেলা নিয়ে যাওয়া। অবশ্য বাইরের পরিবেশে তখন কৃষ্ণ পক্ষের জ্যোৎস্নায় নদীর চর পড়া অসাধারণ সৌন্দর্যের সৃষ্টি করে। মাঠে মাঠে সোনালি ধানের সমারোহও প্রকৃতিকে অনন্য শোভা দান করে। কবি অশ্বত্থ ও বটের ছায়ায় নিজের আত্মতৃপ্তির কথা মনে হয়। কবি স্বর্গে গিয়ে শ্যামার গান শুনেছিলেন বলে মনে হয়। কবির মনে হয় তিনি যেন ছিন্ন খঞ্জনার মতো ইন্দ্রের সভায় নেচেছিল। কবির কাছে বাংলার নদী মাঠ ও ভাঁটফুলের সৌন্দর্য কোনোদিন ভুলবার নয়। তাই কবি পৃথিবীর অন্য কোনো সৌন্দর্য আর দেখতে চান না, কারণ বাংলার নৈসর্গিক সৌন্দর্যে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন। বাংলার অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বর্ণনাই এই কবিতার বীজমন্ত্র।

অমর একুশে

হাসান হাফিজুর রহমান

আম্মা তাঁর নামটি ধরে একবারও ডাকবে না তবে আর?

ঘূর্ণি ঝড়ের মতো সেই নাম উন্মথিত মনের প্রান্তরে
ঘুরে ঘুরে জাগবে, ডাকবে,
দুটি ঠোঁটের ভেতরে থেকে মুক্তোর মতো গড়িয়ে এসে
একবারও উজ্জ্বল হয়ে উঠবে না, সারাটি জীবনেও না?

কি করে এই গুরুভার সইবে তুমি, কতোদিন?

আবুল বরকত নেই; সেই অস্বাভাবিক বেড়ে-ওঠা
বিশাল শরীর বালক, মধুর স্টলের ছাদ ছুঁয়ে হাঁটতো যে তাঁকে ডেকো না;
আর একবারও ডাকলে ঘৃণায় তুমি কুঁচকে উঠবে–
সালাম, রফিকউদ্দিন, জব্বার– কি বিষণ্ন থোকা থোকা নাম;
এই এক সারি তার নাম বর্শার তীক্ষ্ণ ফলার মতো এখন হৃদয়কে হানে;

বিচ্ছেদের জন্যে তৈরী হওয়ার আগেই আমরা ওদেরকে হারিয়েছি
কেননা, প্রতিক্রিয়ার গ্রাস জীবন ও মনুষ্যত্বকে সমীহ করে না;
ভেবে ওঠার আগেই আমরা ওদেরকে হারিয়েছি
কেননা প্রতিক্রিয়ার কৌশল এক মৃত্যু দিয়ে হাজার মৃত্যুকে ডেকে আনে।

আর এবার আমরা হারিয়েছি এমন কয়জনকে
যাঁরা কোনদিন মন থেকে মুছবে না,
কোনদিন কাউকেও শান্ত হতে দেবে না;
যাঁদের হারালাম তাঁরা আমাদেরকে বিস্তৃত করে দিয়ে গেল
দেশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে, কণা কণা করে ছড়িয়ে দিয়ে গেল
দেশের প্রাণের দীপ্তির ভেতর মৃত্যুর অন্ধকারে ডুবে যেতে যেতে।

আবুল বরকত, সালাম, রফিকউদ্দিন, জব্বার
কি আশ্চর্য, কি বিষণ্ন নাম! একসার জ্বলন্ত নাম ॥

কৃষাণ যেমন বর্ষার পলিসিক্ত মাঠে রোয়া ধানের চারাগুলো
রেখে আসে সোনালী শস্যের জন্মের আকাঙ্ক্ষায়
তেমনি আমার সরু সরু অনুভূতিগুলো জনতার গভীরে বুনে এসেছি:
দেশ আমার, ইতিহাসের ধারা যে জ্ঞান আমাকে দিয়েছে তারই
পবিত্র সন্তান একটি দিনে তোমার হৃদয়ের বিদীর্ণ আভাকে
দেখিয়েছ–বিদীর্ণ আভায় জ্বলেছিল;

যে আভারই আকস্মিক স্পর্শে হয়তো
কহিতুর চূর্ণ হয়ে ছড়িয়েছিল প্রাণপ্রার্থী প্রান্তরে প্রান্তরে।
দেশ আমার, তোমার প্রাণের গভীর জলে স্নান করে এবার এলাম ॥
তোমার প্রাণের গভীর জন্মে স্নান করে এলাম;
শ্রমিক তার শিল্পে প্রতিভার স্বাদ মেশাতে পেরে
যে তৃপ্তিতে বিশাল হয়ে ওঠে তারই স্পর্শের পরাগ
সারা চেতনায় মেখে একবার আকাশের দিকে তাকালাম,
একবার তোমার গ্রাম যমুনার ঘোলা স্রোতে দৃষ্টিকে ডুবিয়ে নিয়ে
লক্ষ লক্ষ চারা ধানের মতো আদিগন্ত প্রাণের সবুজ
শিখাগুলো দেখি,
কি আশ্চর্য প্রাণ ছড়িয়েছ–একটি দিন আগেও তো বুঝতে
পারি নি,
কি আশ্চর্য দীপ্তিতে তোমার কোটি সন্তানের প্রবাহে প্রবাহে
সংক্রমিত হয়েছ–
একটি দিন আগেও তো বুঝতে পারি নি, দেশ আমার।।

জন্মদাতা পিতার বাষ্পস্তব্ধ চোখ দুটোকে একবার মনে করো,
একটি মাত্র ভাইকে হারিয়ে বোনের অকস্মাৎ আর্ত চিৎকারকে,
সময়ের নিভৃত মন্দিরে সংগোপনে এসে যারা পরস্পরে
হৃদয়ের সততার কথা বলে গেছে
তাদের একজন আজ নেই
যুগল পাখির একটি আজ নেই
করুণ-আঁখি হরিণী তার কোমল শাবকটিকে হারিয়েছে,
সমুদ্রে আকুল ঢেউয়ের মতো সীমাক্লান্ত কান্না,
দিকে দিকে প্লাবিত কান্না, দৃষ্টিমান তার চক্ষুকে হারিয়েছে;

হে আমার জ্ঞান, একটি মাত্র উচ্চারণের বিষ আমাকে দাও;
যা হৃদয় থেকে হৃদয়ে ছড়ায়,
ওষধি জন্মের মতো একবার স্পন্দিত হয়ে যে ঘৃণা আর
কখনো মৃত্যুকে জানে না, হে আমার জ্ঞান !

আয়ুর প্রথম হৃদয়মথিত শব্দ,
মনুষ্যত্বের প্রথম দীক্ষা যে উচ্চারণে
তারই সম্মানের জন্যে তাঁরা যূথবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল;
বুদ্ধ আর মোহাম্মদের দৃষ্টির মতো দীপ্তি

ফল্গুর মুখদেশের মতো উন্মথিত আবেগ,
আকাশের যে সাতটি তারা সমস্ত নীলিমার ভেতর চিহ্নিত হয়ে আছে
তাদেরই মতো অনন্য–
আর জীবনের শত্রু শয়তানেরা সেই পবিত্র দেহগুলো ছিনিয়ে

নিয়ে গেছে,
আর তাঁদের আত্মা এখন আমরা হৃদয়ে হৃদয়ে পোষণ করিনা ।।

তাঁদের একজন আজ নেই,
না, তাঁরা পঞ্চাশজন আজ নেই–
আর আমরা সেই অমর শহীদদের জন্যে
তাঁদের প্রিয় মুখের ভাষা বাংলার জন্যে একচাপ পাথরের মতো
এক হয়ে গেছি,
হিমালয়ের মতো অভেদ্য বিশাল হয়ে গেছি ॥

হে আমার দেশ, বন্যার মতো
সমস্ত অভিজ্ঞতার পলিমাটিকে এনে একটি চেতনাকে উর্বর করেছি,
এখানে আমাদের মৃত্যু ও জীবনের সন্ধি,
সমুদ্র-সৈকতে দুঃসাহসী নাবিকের করোটির ভেতর যেমন
দূর দিগন্তের হাওয়া হাহাকার করে
তেমনি এখানে রয়েছে একটি কোমল নারীর আশাহত সখিনা-হৃদয়,
এখানে রয়েছে মা আর পিতা,
ভাই আর বোন, স্বজন বিধুর পরিজন
আর তুমি আমি, দেশ আমার!

এখানে আমরা ফ্যারাউনের আয়ুর শেষ কটি বছরের ঔদ্ধত্যের মুখোমুখি,
এখানে আমরা পৃথিবীর শেষ দ্বৈরথে দাঁড়িয়ে,
দেশ আমার, স্তব্ধ অথবা কলকণ্ঠ এই দ্বন্দ্বের সীমান্তে এসে
মায়ের স্নেহের পক্ষে থেকে কোটি কণ্ঠ চৌচির করে দিয়েছি:
এবার আমরা তোমার ॥

বস্তিবাসিনী মা অকস্মাৎ স্বাস্থ্যবান একটি সন্তানকে বুকের কাছে
ধরতে পারলে

যেমন করে আহত দিনের অসংখ্য মৃত্যুকে ভুলে থাকতে পারে
তেমনি পঞ্চাশটি শহীদ ভাইয়ের মৃত্যুকে ভুলেছি
মা, তোমাকে পেয়েছি বলে।

আজ তো জানতে এতটুকু বাকী নেই মাগো,
তুমি কি চাও, তুমি কি চাও, তুমি কি চাও।

কবি-পরিচিতি

হাসান হাফিজুর রহমান ছিলেন কবি ও সাংবাদিক। ১৯৩২ সালের ১৪ই জুন তৎকালীন ময়মনসিংহ জেলার জামালপুর শহরে মাতুলালয়ে তাঁর জন্ম। পৈতৃক নিবাস জামালপুরেরই ইসলামপুরে। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫১ সালে বি.এ. এবং ১৯৫৫ সালে বাংলায় এম.এ. ডিগ্রি লাভ করেন। তাঁর পেশা ছিল সাংবাদিকতা। ছাত্রাবস্থায় ১৯৫২ সালে সাপ্তাহিক

'বেগম' পত্রিকায় সহকারী সম্পাদক হিসেবে তিনি মূলত কর্মজীবন শুরু করেন। 'দৈনিক বাংলা' সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি হন পরে। ১৯৭৩ সালে মস্কোস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রেস কাউন্সিলরও ছিলেন তিনি। ১৯৪৬ সালে স্কুল পড়া অবস্থায় 'অশ্রুভেজা পথ চলতে' নামের ছোটগল্প তাঁর প্রথম রচনা হিসেবে 'সওগাত' পত্রিকায় প্রকাশ পায়। ১৯৪৯ সালে নলিনী গুহ সম্পাদিত 'সোনার বাংলা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কবিতা। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন এবং এ বছরই তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'অমর একুশে' রচিত হয়। ১৯৫৩ সালে তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ওপর দেশের প্রথম সংকলনগ্রন্থ 'একুশে ফেব্রুয়ারী'। হাসান হাফিজুর রহমানের কাব্যগ্রন্থাবলি মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: 'বিমুখ প্রান্তর' (১৯৬৩), 'আর্ত শব্দাবলী' (১৯৬৮), 'অন্তিম শরের মতো'(১৯৬৮), 'যখন উদ্যত সঙ্গীন' (১৯৭২), 'বজ্রে চেরা আঁধার আমার' (১৯৭৬), 'শোকার্ত তরবারী' (১৯৮২), 'আমার ভেতরের বাঘ' (১৯৮৩)। এছাড়া তিনি 'আধুনিক কবি ও কবিতা' (১৯৬৫) নামে গুরুত্বপূর্ণ একটি সমালোচনাগ্রন্থ লিখেছেন। তিনি এককভাবে বাংলায় অনুবাদ করেন হোমারের 'ওডিসি' (১৯৮৭)। হাসান হাফিজুর রহমানের সম্পাদনায় ১৫ খণ্ডে 'বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ: দলিলপত্র' (১৯৮২-৮৩) প্রকাশিত হয়। এটি তাঁর জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ১৯৮৩ সালের ১লা এপ্রিল মস্কো সেন্ট্রাল ক্লিনিক্যাল হাসপাতালে তাঁর জীবনাবসান ঘটে।

মূল বক্তব্য

১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের নামজানা শহিদদের শোকের সঙ্গে নাম না-জানা শহিদদের স্মরণ এই কবিতাকে ভিন্ন মাত্রায় নিয়ে গেছে। এক মাকে সম্বোধন করে হাজার মাকে বোঝানো হয়েছে, সেই মাদের শোকাপ্লুত অনুভূতি বাণীরূপ দেয়া হয়েছে এই কবিতায়। এই মা যেন প্রতীকী অনুভব। আসলে, উনিশ শ বায়ান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারি শহিদত্ব পাওয়া বরকত, সালাম, রফিক, জব্বারকে স্মরণ করার সঙ্গে মনে করা হচ্ছে শহিদদের আত্মা যেন প্রতিটি বাঙালিকে উজ্জীবিত করেছে, অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে যূথবদ্ধ করেছে। এক থেকে বহুতে উত্তীর্ণ হওয়ার মন্ত্রই যেন দিয়ে গেছে একুশে ফেব্রুয়ারি। তাই শুধু শোক নয়, শোক থেকে শক্তি পাবার অনুপ্রেরণা এই একুশে।

স্মৃতিস্তম্ভ

আলাউদ্দিন আল আজাদ

স্মৃতির মিনার ভেঙেছে তোমার? ভয় কি বন্ধু, আমরা এখনো
চারকোটি পরিবার
খাড়া রয়েছি তো! যে-ভিৎ কখনো কোনো রাজন্য
পারেনি ভাঙতে
হীরের মুকুট নীল পরোয়ানা খোলা তলোয়ার
খুরের ঝটিকা ধূলায় চূর্ণ যে-পদ প্রান্তে
যারা বুনি ধান
গুণ টানি, আর তুলি হাতিয়ার হাপর চালাই
সরল নায়ক আমরা জনতা সেই অনন্য।

ইটের মিনার ভেঙেছে, ভাঙুক। ভয় কি বন্ধু, দ্যাখো একটায় আমরা জাগরী
চারকোটি পরিবার ॥

এ-কোন মৃত্যু? কেউ কি দেখেছে মৃত্যু এমন,
শিয়রে যাহার ওঠে কান্না, ঝরে না অশ্রু?
হিমালয় থেকে সাগর অবধি সহসা বরং
সকল বেদনা হয়ে ওঠে এক পতাকার রং
এ-কোন মৃত্যু? কেউ কি দেখেছে মৃত্যু এমন,
বিরহে যেখানে নেই হাহাকার? কেবল সেতার
হয় প্রপাতের মোহনীয় ধারা, অনেক কথার
পদাতিক ঋতু কলমেরে দেয় কবিতার কাল?

ইটের মিনার ভেঙেছে, ভাঙুক। একটি মিনার গড়েছি আমরা
চারকোটি কারিগর
বেহালার সুরে, রাঙা হৃদয়ের বর্ণলেখায়।
পলাশের আর
রাম ধনুকের গভীর চোখের তারায় তারায়
দ্বীপ হয়ে ভাসে যাদের জীবন, যুগে যুগে সেই
শহীদের নাম
এঁকেছি প্রেমের ফেনিল শিলায়, তোমাদের নামে।
তাই আমাদের
হাজার মুঠির বজ্র শিখরে সূর্যের মতো জ্বলে শুধু এক
শপথের ভাস্কর।।

কবি-পরিচিতি

আলাউদ্দিন আল আজাদের জন্ম ৬ই মে ১৯৩২; নরসিংদী জেলার রায়পুর থানার রামনগর গ্রামে। তাঁর পিতার নাম গাজী আব্দুস সোবহান। তিনি সেখানকার নারায়ণপুর শরাফতউল্লাহ উচ্চবিদ্যালয়

থেকে প্রবেশিকা (১৯৪৭) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় স্নাতকসহ (১৯৫৩) স্নাতকোত্তর (১৯৫৪) ডিগ্রি নেন। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ. ডি. ডিগ্রি লাভ করেন ১৯৭০ সালে। কর্মজীবনে তিনি চট্টগ্রাম বিশ্বদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। বিশ শতকের পঞ্চাশের দশকে সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর আবিভাব। প্রগতিশীল ও মানবতাবাদী ভাবধারায় তিনি সাহিত্যচর্চা করেছেন। প্রথমে জীবনে গ্রামের মানুষ ও তাদের সংগ্রাম, প্রকৃতির ঐশ্বর্য ও সংহারমূর্তি দুইই তাঁর মনে ছাপ ফেলে গেছে। সেগুলো তিনি তাঁর সৃষ্টিতে ধারণ করেছেন। আলাউদ্দিন আল আজাদের কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে 'মানচিত্র' (১৯৬১), 'ভোরের নদীর মোহনায় জাগরণ' (১৯৬২), 'লেলিহান পাণ্ডুলিপি' (১৯৭৫), 'নিখোঁজ সনেটগুচ্ছ' (১৯৮৩), 'সাজঘর' (১৯৯০) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি প্রত্যক্ষভাবে ১৯৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন এবং এসময়ই তিনি লেখেন তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'স্মৃতিস্তম্ভ'। কবিতা ছাড়া তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ: 'জেগে আছি' (১৯৫০), 'ধানকন্যা' (১৯৫১), 'জীবন জমিন' (১৯৮৮); উপন্যাস 'তেইশ নম্বর তৈলচিত্র' (১৯৬০), 'কর্ণফুলী' (১৯৬২); কাব্যনাট্য: 'ইহুদির মেয়ে' (১৯৬২), 'রঙিন মুদ্রারাক্ষস' (১৯৯৪) ইত্যাদি। তিনি সমালোচনাসাহিত্য রচনাতে সিদ্ধহস্ত। আর সে ধারাবাহিকতাতেই তিনি লিখেছেন 'শিল্পীর সাধনা' (১৯৫৮), 'সাহিত্যের আগন্তুক ঋতু' (১৯৭৪) ইত্যাদি গ্রন্থ। ২০০৯ সালের তরা জুলাই এই লেখকের মৃত্যু হয়।

মূল বক্তব্য

কবি আলাউদ্দিন আল আজাদ রচিত 'স্মৃতিস্তম্ভ' একটি ভাষা আন্দোলনভিত্তিক কবিতা। এই কবিতায় ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালির মনে বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনার বহিঃপ্রকাশ পাওয়া যায়। ১৯৫২ সালে ভাষা শহিদদের স্মরণে ঢাকা মেডিকের কলেজের পাশে শহিদ মিনার স্থাপন করা হয় ভাষা শহিদদের সম্মান প্রদর্শনের জন্য, কিন্তু পাক বাহিনীরা সেই স্মৃতির মিনারকে ভেঙে দেয়। কবির মনে হয় তারা বাঙালির স্মৃতির মিনার ভাঙলেও কোনো ভয় নেই। কারণ তখন চার কোটি মানুষ প্রতিরোধ করতে প্রস্তুত ছিল। বাঙালির এই ঐক্যবদ্ধ শক্তিকে কোনো অতীতে রাজারা ভাঙতে পারেনি। তাদের অস্ত্রের আক্রমণকে প্রতিহত করার মতো শক্তি বাঙালির আছে। তারা তলোয়ারের সামনেও মাঠে ধান উৎপাদন, নৌকার মাঝিদের গুণটানা ও নানা প্রকার হাতিয়ার চালাতে এই বাঙালি জনতা অনন্য। তারা ইটের মিনার ভাঙলেও বাঙালির কোনো ভয় নেই, কারণ তার পেছনে চার কোটি বাঙালির জাগরণ মানসিকতা আছে। বাঙালির ওপর পাক বাহিনীরা এমন হত্যাযজ্ঞ চালায় যার মতো নির্মম জাতির মৃত্যু আর কেউ দেখেনি। তারপরও এই জাতির মৃত্যুর জন্য অশ্রু ঝরে না, তারা কাঁদে না। দেশের উত্তরের হিমালয় থেকে দক্ষিণের বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বাঙালির এই কান্নার বেদনা দেশের শক্তিরূপ পতাকার রং ধারণ করে। এমন নির্মম মৃত্যুর জন্য এই বাঙালি জাতির মধ্যে কোনো হাহাকার নেই। কেবল তারা তাদের এমন পতনকে সেতারের মতো শক্তিতে রূপান্তর করে। চার কোটি মানুষের চেতনায় একটি ইটের মিনার বাঙালি গড়েছে। তা ভাঙলেও কবির হৃদয়ে কোনো বেদনার আভাস পাওয়া যায় না। কবির হৃদয়ে বেহুলার সুরে নানা কথায় জন্ম হয়। যারা ভাষার জন্য শহিদ হয়েছেন, তারা আজ বাঙালি জাতির আকাশে তারার দ্বীপে পরিণত হয়েছে। তা যেন আকাশে রামধনুর সাত রঙের মতো। বাঙালির হৃদয়ের ভালোবাসার ফেনা দিয়ে সেইসব আত্মত্যাগী ভাষা শহিদের নাম এঁকেছেন। হাজার হাজার বাঙালি সেই চেতনায় সূর্যের মতো জ্বলে ওঠে, হৃদয়ে এই বাঙালি জাতি বাঙালি জাতীয়তাবোধের চেতনাকে শপথের ভাস্করে পরিণত করে।

তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা

শামসুর রাহমান

তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা,
তোমাকে পাওয়ার জন্যে
আর কতবার ভাসতে হবে রক্তগঙ্গায়?
আর কতবার দেখতে হবে খাণ্ডবদাহন?

তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা,
সাকিনা বিবির কপাল ভাঙল,
সিঁথির সিঁদুর মুছে গেল হরিদাসীর।
তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা,
শহরের বুকে জলপাইয়ের রঙের ট্যাংক এলো
দানবের মতো চিৎকার করতে করতে
তুমি আসবে বলে, হে স্বাধীনতা,
ছাত্রাবাস, বস্তি উজাড় হলো। রিকয়েললেস রাইফেল
আর মেশিনগান খই ফোটালো যত্রতত্র।
তুমি আসবে বলে ছাই হলো গ্রামের পর গ্রাম।
তুমি আসবে বলে বিধ্বস্ত পাড়ায় প্রভুর বাস্তুভিটার
ভগ্নস্তূপে দাঁড়িয়ে একটানা আর্তনাদ করল একটা কুকুর।
তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা
অবুঝ শিশু হামাগুড়ি দিল পিতামাতার লাশের উপর।

তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা, তোমাকে পাওয়ার জন্যে
আর কতবার ভাসতে হবে রক্তগঙ্গায়?
আর কতবার দেখতে হবে খাণ্ডবদাহন।
স্বাধীনতা, তোমার জন্যে থুত্থুরে এক বুড়ো
উদাস দাওয়ায় বসে আছেন–তাঁর চোখের নিচে অপরাহ্নের
দুর্বল আলোর ঝিলিক, বাতাসে নড়ছে চুল।
স্বাধীনতা তোমার জন্যে
মোল্লাবাড়ির এক বিধবা দাঁড়িয়ে আছে
নড়বড়ে খুঁটি ধরে দগ্ধ ঘরের।

স্বাধীনতা, তোমার জন্যে
হাড্ডিসার এক অনাথ কিশোরী শূন্য থালা হাতে
বসে আছে পথের ধারে।

তোমার জন্যে,
সগীর আলী, শাহবাজপুরের সেই জোয়ান কৃষক,
কেষ্ট দাস, জেলেপাড়ার সবচেয়ে সাহসী লোকটা,
মতলব মিয়া, মেঘনা নদীর দক্ষ মাঝি,
গাজী গাজী বলে যে নৌকো চালায় উদ্দাম ঝড়ে
রুস্তম শেখ, ঢাকার রিক্‌শাওয়ালা, যার ফুসফুস
এখন পোকার দখলে
আর রাইফেল কাঁধে বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানো
সেই তেজি তরুণ যার পদভারে
একটি নতুন পৃথিবীর জন্মে হতে চলেছে–
সবাই অধীর প্রতীক্ষা করছে তোমার জন্যে, হে স্বাধীনতা।

পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে জ্বলন্ত
ঘোষণার ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তুলে,
নতুন নিশান উড়িয়ে, দামামা বাজিয়ে দিগ্বিদিক
এই বাঙলায়
তোমাকে আসতেই হবে, হে স্বাধীনতা।

কবি-পরিচিতি

কবি শামসুর রাহমান ১৯২৯ সালের ২৩শে অক্টোবর পুরান ঢাকার ৪৬ নম্বর মাহুতটুলিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক বাড়ি তৎকালীন ঢাকা জেলার রায়পুর থানার পাড়াতলী গ্রামে। কবির পিতা মোখলেসুর রহমান চৌধুরী এবং মাতা আমেনা খাতুন। তিনি ঢাকার পোগোজ স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন (১৯৪৫) করেন। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিষয়ে অনার্স নিয়ে ভর্তি হলেও পরীক্ষা দেননি; ১৯৫৩ সালে বি.এ. (পাস কোর্স) পাস করেন। ১৯৪৩ সালে তার প্রথম কবিতা 'উনিশ শ' উনপঞ্চাশ' প্রকাশিত হয় নলিনীকিশোর গুহ সম্পাদিত 'সোনার বাংলা' পত্রিকায়। ১৯৬০ সালে শামসুর রাহমানের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে' প্রকাশ পায়। এরপর বহু কাব্যগ্রন্থ তিনি রচনা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থাবলি হলো: 'রৌদ্র করোটিতে' (১৯৬৩), 'বিধ্বস্ত নীলিমা' (১৯৬৭), 'নিজ বাসভূমে' (১৯৭০), 'বন্দী শিবির থেকে' (১৯৭২), 'ইকারুসের আকাশ' (১৯৮২), 'মাতাল ঋত্বিক' (১৯৮২), 'উ ষ্ট্র উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ' (১৯৮৩), 'এক ফোঁটা কেমন অনল' (১৯৮৬), 'দেশদ্রোহী হতে ইচ্ছে করে' (১৯৮৬), 'বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়' (১৯৮৮), 'স্বপ্নে ও দুঃস্বপ্নে বেঁচে আছি' (১৯৯৯), 'অন্ধকার থেকে আলোয়' (২০০৬) ইত্যাদি। এগুলো ছাড়া তিনি অনেক গদ্যগ্রন্থ রচনা করেন। ১৯৬৯ সালের ২০ জানুয়ারি তিনি রচনা করেন 'আসাদের শার্ট' কবিতাটি। তাঁর লেখা 'আসাদের শার্ট' কবিতাটির পিছনে রয়েছে পুলিশের গুলিতের নিহত আসাদের শার্ট উঁচুতে তুলে ধরে প্রতিবাদী এক বিশাল মিছিলের মুখোমুখি হওয়া কবির তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া। পরে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান পাকিস্তানে একটি সাধারণ ভাষা প্রচলনের প্রস্তাব দিলে এর তীব্র বিরোধিতা করে ৪০জন বাঙালি সাহিত্যিক শিল্পী ও সাংবাদিক যে বিবৃতি প্রকাশ করেন (৩১শে আগস্ট, ১৯৬৮), কবির 'বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা' নামে

বিখ্যাত কবিতাটি রচনার অনুপ্রেরণা ছিল সেই প্রতিবাদ। বহির্বিশ্ব কবির কবিতায় ছায়া ফেলতে শুরু করে তার দ্বিতীয় কাব্য 'রৌদ্র করোটিতে' থেকে। 'বিধ্বস্ত নীলিমা' কবিতাগুচ্ছে আরও এক ধাপ এগিয়ে যান কবি তাঁর বহির্বিশ্ব-চেতনার বিকাশের পথে। ১৯৭০ সালে প্রকাশিত তাঁর 'নিজ বাসভূমে' কাব্য তিনি উৎসর্গ করেন আবহমান বাংলার শহিদদের উদ্দেশ্য। 'বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা', 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯', 'পুলিশ রিপোর্ট', 'হরতাল', 'এ লাশ আমরা রাখব কোথায়'–এ কবিতাগুলির ছত্রেছত্রে লেগে আছে এক বিক্ষুব্ধ সময়ের ছাপ। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তিনি রচনা করেন তাঁর অত্যন্ত জনপ্রিয় কবিতা 'স্বাধীনতা তুমি', ও 'তোমাকে পাওয়ার জন্য, হে স্বাধীনতা'। যুদ্ধকালীন লেখা কবিতাগুচ্ছ মুক্তিযুদ্ধ শেষে 'বন্দী শিবির থেকে' নামে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। শামসুর রাহমান কবিতার বিষয় ও ভাষায় নিরন্তর পরীক্ষাপ্রবণ ছিলেন। তাঁর কবিতায় মৌলিকতার স্বাক্ষর স্পষ্ট। বাংলা কবিতার আধুনিকতার ধারায় নতুন মাত্রা যোগ করেছেন, সমকালকে ধারণ করেছেন এক সদাজাগ্রত সংবেদনশীলতায় এবং তাঁর আমৃত্যু অপরাহত কাব্যচর্চায় সহাবস্থান ঘটিয়েছেন অন্তর্জীবনের পাশাপাশি দৃশ্যমান বহির্জীবনের। বাংলাদেশের বাংলা কবিতার ক্ষুদ্র গণ্ডি অতিক্রম করে ও প্রাদেশিকতা ঘুচিয়ে তাকে তিনি যুক্ত করেছেন বাংলা কবিতার মূল স্রোতের সঙ্গে। ২০০৬ সালের ১৮ আগস্ট ঢাকায় এই কবির মৃত্যু হয়।

মূল বক্তব্য

স্বাধীনতাকে অর্জন করার জন্য এদেশের মানুষের নানা ত্যাগের কথা বলা হয়েছে। এই কবিতায় স্বাধীনতার জন্য বাঙালির যে অবদান তাকে কবি শামসুর রাহমান অসাধারণভাবে উপস্থাপন করেন। বাঙালির স্বাধীনতার জন্য বা স্বাধিকার অর্জনের জন্য অসংখ্য মানুষের রক্তের সাগর হয়েছে। স্বাধীনতার জন্য সাকিনা বিবির মতো নারীদের জীবনে দুর্ভাগ্য নেমে আসে, হরিদাসীরা বিধবা হয়ে যায়। শহরে জলপাই রঙের ট্রাঙ্ক এসেছিল। তারা ছাত্রাবাস ও বস্তিতে তাদের আক্রমণ চালায়। তাছাড়া রিকয়েললেস রাইফেল আর মেশিনগানের মাধ্যমে তারা অত্যাচার শুরু করে। শুধু শহর নয়, গ্রামের পর গ্রাম তারা ধ্বংস করে দেয়। গ্রামের সব ঘরবাড়ি বাস্তুভিটা ধ্বংস হয়। এমনকি পিতা-মাতার লাশের উপর অবুঝ শিশু হামাগুড়ি দিতে থাকে। স্বাধীনতার স্বপ্ন বৃদ্ধ বয়সের মানুষের মনেও থাকে। তিনি জীবনের বিকেলে বসে স্বাধীনতার জন্য কল্পনা করেন। পাকিস্তানিরা গ্রামের প্রশান্তি ভেঙেও অত্যাচার করে বলে মোল্লাবাড়িতে ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেয়, সেই বাড়ির বিধবা ঘরের নড়বড়ে খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। কঙ্কাল দেহ নিয়ে এক অনাথ কিশোরী থালা হাতে রাস্তার পাশে বসে থাকে, তার মনেও স্বপ্ন থাকে স্বাধীনতার। শাহবাজপুরের যুবক কৃষক সগীর আলী জেলেপাড়ার সবচেয়ে সাহসী কেষ্ট দাস, মেঘনা নদীর দক্ষ মাঝি মতলব মিয়া যিনি গাজী গাজী বলে নৌকা চালান। ঢাকার রিকশাওয়ালা রুস্তম শেখ, আর তেজী তরুণ–যে রাইফেল কাঁধে নিয়ে বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ান, এদের সবার একটাই স্বপ্ন স্বাধীনতা। সবার আকাঙ্ক্ষা বাংলার স্বাধীনতা অর্জন। তারা নতুন পতাকা উড়িয়ে দামামা বাজিয়ে পৃথিবীর এক দেশ থেকে অন্য দেশে বাংলার জন্য স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার ঘোষণা করেন। এই কবিতায় উঠে এসেছে সর্বাত্মক মুক্তিযুদ্ধের ঘটনা, যার জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত সর্বস্তরের মানুষ। আর সবাই যখন সর্বান্তকরণে প্রত্যাশা করে, তখন তখন দেশ স্বাধীন হবেই–এটাই কবির প্রত্যয়।

আমার পরিচয়

সৈয়দ শামসুল হক

আমি জন্মেছি বাংলায়, আমি বাংলায় কথা বলি,
আমি বাংলার আলপথ দিয়ে হাজার বছর চলি।
চলি পলিমাটি কোমলে আমার চলার চিহ্ন ফেলে।
তেরোশত নদী শুধায় আমাকে কোথা থেকে তুমি এলে?

আমি তো এসেছি চর্যাপদের অক্ষরগুলো থেকে।
আমি তো এসেছি সওদাগরের ডিঙার বহর থেকে।
আমি তো এসেছি কৈবর্তের বিদ্রোহী গ্রাম থেকে।
আমি তো এসেছি পালযুগ নামে চিত্রকলার থেকে।

এসেছি বাঙালি পাহাড়পুরের বৌদ্ধবিহার থেকে।
এসেছি বাঙালি জোড়বাংলার মন্দির-বেদি থেকে।
এসেছি বাঙালি বরেন্দ্রভূমে সোনা মসজিদ থেকে।
এসেছি বাঙালি আউল-বাউল মাটির দেউল থেকে।

আমি তো এসেছি সার্বভৌম বারো ভূঁইয়ার থেকে।
আমি তো এসেছি কমলার দিঘি মহুয়ার পালা থেকে।
আমি তো এসেছি তিতুমীর আর হাজী শরীয়ত থেকে।
আমি তো এসেছি গীজাঞ্জলি ও অগ্নিবীণার থেকে।

এসেছি বাঙালি ক্ষুদিরাম আর সূর্য সেনের থেকে।
এসেছি বাঙালি জয়নুল আর অবন ঠাকুর থেকে।
এসেছি বাঙালি রাষ্ট্রভাষার লাল রাজপথ থেকে।
এসেছি বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর থেকে।

আমি সে এসেছি জয়বাংলার বজ্রকণ্ঠ থেকে।
আমি সে এসেছি একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ থেকে।
এসেছি আমার পেছনে হাজার চরণচিহ্ন ফেলে।
শুধাও আমাকে, এতদূর তুমি কোন প্রেরণায় এলে?

তবে তুমি বুঝি বাঙালি জাতির ইতিহাস শোনো নাই–
'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।'
একসাথে আছি, একসাথে বাঁচি, আজো একসাথে থাকবোই
সব বিভেদের রেখা মুছে দিয়ে সাম্যের ছবি আকঁবোই।

পরিচয়ে আমি বাঙালি, আমার আছে ইতিহাস গর্বের।

কখনোই ভয় করিনিকো আমি উদ্যত কোনো খড়্গের।
শত্রুর সাথে লড়াই করেছি, স্বপ্নের সাথে বাস,
অন্নেও শান দিয়েছি যেমন শস্য করেছি চাষ,
একই হাসি মুখে বাজায়েছি বাঁশি, গলায় পরেছি ফাঁস,
আপোস করিনি কখনোই আমি, এই হলো ইতিহাস।

এই ইতিহাস ভুলে যাবো–আজ, আমি কি তেমন সন্তান ?
যখন আমার জনকের নাম শেখ মুজিবুর রহমান।
তাঁরই ইতিহাস প্রেরণায় আমি বাংলায় পথ চলি–
চোখে নীলাকাশ, বুকে বিশ্বাস, পায়ে উর্বর পলি ॥

কবি-পরিচিতি

সৈয়দ শামসুল হক ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে ২৭শে ডিসেম্বর কুড়িগ্রাম জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা সৈয়দ সিদ্দিক হুসাইন ও মা হালিমা খাতুন। ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ম্যাট্রিক (বর্তমানের এসএসসি) পাস করেন। পরে ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে তিনি ভর্তি হন, কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া আর সমাপ্ত করেননি। তাঁর প্রথম লেখা 'উদয়াস্ত' নামের একটি গল্প ১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে ফজলে লোহানী সম্পাদিত 'অগত্যা' পত্রিকায় বের হয়। শামসুল হকের কবিতায় রয়েছে গভীর জীবনবোধ, স্বাদেশিকতা আর অনুপ্রেরণা। তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'একদা এক রাজ্যে' ১৯৬১ সালে প্রকাশিত হয়। তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলো হচ্ছে: 'বিরতিহীন উৎসব' (১৯৬৯), 'বৈশাখে রচিত পংক্তিমালা' (১৯৭০), 'পরাণের গহীন ভিতর' (১৯৮০), 'বেজান শহরের জন্য কোরাস' (১৯৮৯), 'কাননে কাননে তোমারই সন্ধানে' (১৯৯০) ইত্যাদি। সৈয়দ শামসুল হক কাব্যনাট্য রচয়িতা হিসেবে খ্যাতিমান। তাঁর রচিত 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' (১৯৭৬) ও 'নুরলদীনের সারাজীবন' (১৯৮২) বাংলাসাহিত্যে অনন্য সৃষ্টি। তিনি ছোটগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, শিশুসাহিত্যও রচনা করেন। তাঁর রচনায় সমসাময়িক বাংলাদেশ এবং মধ্যবিত্ত সমাজের আবেগ-অনুভূতি ও ভালো-মন্দ দিকগুলো প্রধান হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশের বাংলাসাহিত্যের নতুন ভাষা ও নির্মিতি সৃজনে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। ২০১৬ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর সৈয়দ শামসুল হক ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

মূল বক্তব্য

কবি সৈয়দ শামসুল হক 'আমার পরিচয়' কবিতায় বাঙালির পরিচয়ের ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। কবি ইতিহাসের মাধ্যমে নিজের স্বতন্ত্র পরিচয় নির্দেশ করেছেন। তিনি বাংলায় জন্মগ্রহণ করেন এবং বাংলা ভাষায় কথা বলেন। এ দেশের অলি গলি পথ দিয়ে হাজার বছর চলার কথা বলেছেন তিনি। এ দেশের মাটির বুকে তাঁর হাঁটার চিহ্ন রয়েছে। তেরোশত নদীর প্রশ্ন কবির কাছে যে, তিনি কোথা থেকে এসেছেন? তার প্রশ্নের জবাবে কবি বলেন, আমি এসেছি সাহিত্যের ইতিহাসের মাধ্যমে, বাংলা সাহিত্যের প্রথম প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদ, মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য যেমন চাঁদ সওদাগরের নৌকা বহর, কৈবর্তের বিদ্রোহ ও পালযুগের চিত্রকলার মাধ্যমে। কবি আরও বলেন, বাঙালির রয়েছে সমৃদ্ধ ইতিহাস; যেমন, পাহাড়পুরের

বৌদ্ধবিহার, জোড়বাংলার মন্দির বেদি, বরেন্দ্রভূমির সোনা মসজিদ ও আউল-বাউল মাটির দেউল। এর পাশাপাশি কবি তাঁর সমৃদ্ধ রাজনীতির ইতিহাসের কথা বলেছেন। কবির রয়েছে সার্বভৌম বারোভূঁইয়ার ইতিহাস, 'কমলার দীঘি', 'মহুয়ার পালা', তিতুমীরের বিদ্রোহ, হাজি শরিয়ত উল্লাহর ফরায়েজি আন্দোলন, রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি'র মতো সিদ্ধ আর কাজী নজরুল ইসলামের 'অগ্নি-বীণা'র মতো বিদ্রোহ-কাব্য। কবির চোখে ভেসে ওঠে ক্ষুদিরাম ও সূর্যসেনের বিদ্রোহ , জয়নুল ও অবন ঠাকুরের অবদান। রাষ্ট্রভাষা বাংলার জন্য ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন ও শ্রেষ্ঠ বাঙালি শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীন বাংলাদেশের নেতৃত্ব দান। তাঁর নেতৃত্বে জয়বাংলা শ্লোগানের মাধ্যমে বাঙালি ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করে। আর কবি তার পেছনে দেখেছেন হাজার হাজার মানুষের চরণ চিহ্ন। কবি বাঙালি জাতির সমৃদ্ধ ইতিহাসের উপস্থাপন করেন। তিনি স্মরণ করেন চণ্ডীদাসের সেই বিখ্যাত চরণ 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'। কবি এখানে সাম্যের কথা বলেছেন। তিনি মনে করেন, এখানে আমরা সব বাঙালি একসাথে বসবাস করি ও বেঁচে থাকি। সুতরাং কবির সবচেয়ে গর্বের বিষয় হলো কবি নিজে একজন বাঙালি। আর বাঙালিরা কখনো কোনো শত্রুর ভয় করে না। এরা শত্রুর সাথে লড়াই করে আর বুক ভরা স্বপ্ন নিয়ে বসবাস করে। বাঙালিরা যেমন মাঠে অনেক চাষ করে ফসল ফলায়, ঠিক তেমনিই তারা শত্রুর জন্যও অস্ত্রে শান দিতে থাকেন। তারা হাসিমুখে বাশিঁ বাজায় আবার প্রয়োজনে হাসিমুখে গলায় ফাঁসও পরতে পারে। বাঙালির ইতিহাসে এরা কখনো অপোস করেনি। কবি তার ইতিহাস ভুলে যাওয়ার সন্তান নন। কারণ কবি মনে করেন তার জাতির জনকের নাম শেখ মুজিবুর রহমান। তার প্রেরণায় কবি সহ সকল বাঙালি বাংলার বুকে চলে, তাদের চোখে থাকে স্বপ্ন, বুকে থাকে আত্মবিশ্বাস ও পায়ে কঠোর শক্তি সামর্থ্য নিয়ে সামনে অগ্রসর হবার দৃঢ়তা।

পোস্টমাস্টার

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রথম কাজ আরম্ভ করিয়াই উলাপুর গ্রামে পোস্টমাস্টারকে আসিতে হয়। গ্রামটি অতি সামান্য। নিকটে একটি নীলকুঠি আছে, তাই কুঠির সাহেব অনেক জোগাড় করিয়া এই নূতন পোস্টআপিস স্থাপন করাইয়াছে।

আমাদের পোস্টমাস্টার কলিকাতার ছেলে। জলের মাছকে ডাঙায় তুলিলে যেরকম হয়, এই গণ্ডগ্রামের মধ্যে আসিয়া পোস্টমাস্টারেরও সেই দশা উপস্থিত হইয়াছে। একখানি অন্ধকার আটচালার মধ্যে তাঁহার আপিস; অদূরে একটি পানাপুকুর এবং তাহার চারি পাড়ে জঙ্গল। কুঠির গোমস্তা প্রভৃতি যে-সকল কর্মচারী আছে তাহাদের ফুরসত প্রায় নাই এবং তাহারা ভদ্রলোকের সহিত মিশিবার উপযুক্ত নহে।

বিশেষত কলিকাতার ছেলে ভালো করিয়া মিশিতে জানে না। অপরিচিত স্থানে গেলে, হয় উদ্ধত নয় অপ্রতিভ হইয়া থাকে। এই কারণে স্থানীয় লোকের সহিত তাঁহার মেলামেশা হইয়া উঠে না। অথচ হাতে কাজ অধিক নাই। কখনো কখনো দুটো-একটা কবিতা লিখিতে চেষ্টা করেন। তাহাতে এমন ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন যে, সমস্ত দিন তরুপল্লবের কম্পন এবং আকাশের মেঘ দেখিয়া জীবন বড়ো সুখে কাটিয়া যায়–কিন্তু অন্তর্যামী জানেন, যদি আরব্য উপন্যাসের কোনো দৈত্য আসিয়া এক রাত্রের মধ্যে এই শাখাপল্লব-সমেত সমস্ত গাছগুলা কাটিয়া পাকা রাস্তা বানাইয়া দেয়, এবং সারি সারি অট্টালিকা আকাশের মেঘকে দৃষ্টিপথ হইতে রুদ্ধ করিয়া রাখে, তাহা হইলে এই আধমরা ভদ্রসন্তানটি পুনশ্চ নবজীবন লাভ করিতে পারে।

পোস্টমাস্টারের বেতন অতি সামান্য। নিজে রাঁধিয়া খাইতে হয় এবং গ্রামের একটি পিতৃমাতৃহীন অনাথা বালিকা তাঁহার কাজকর্ম করিয়া দেয়, চারিটি-চারিটি খাইতে পায়। মেয়েটির নাম রতন। বয়স বারো-তেরো। বিবাহের বিশেষ সম্ভাবনা দেখা যায় না।

সন্ধ্যায় সময় যখন গ্রামের গোয়ালঘর হইতে ধূম কুণ্ডলায়িত হইয়া উঠিত, ঝোপে ঝোপে ঝিলি ডাকিত, দূরে গ্রামের নেশাখোর বাউলের দল খোল-করতাল বাজাইয়া উচ্চৈঃস্বরে গান জুড়িয়া দিত–যখন অন্ধকার দাওয়ায় একলা বসিয়া গাছের কম্পন দেখিলে কবিহৃদয়েও ঈষৎ হৃৎকম্প উপস্থিত হইত, তখন ঘরের কোণে একটি ক্ষীণশিখা প্রদীপ জ্বালিয়া পোস্টমাস্টার ডাকিতেন–"রতন।" রতন দ্বারে বসিয়া এই ডাকের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিত কিন্তু এক ডাকেই ঘরে আসিত না; বলিত, "কি গা বাবু,কেন ডাকছ।"

পোস্টমাস্টার। তুই কী করছিস।

রতন। এখনই চুলো ধরাতে যেতে হবে–হেঁশেলের–

পোস্ট্‌মাস্টার। তোর হেঁশেলের কাজ পরে হবে এখন– একবার তামাকটা সেজে দে তো।

অনতিবিলম্বে দুটি গাল ফুলাইয়া কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে রতনের প্রবেশ। হাত হইতে কলিকাটা লইয়া পোস্টমাস্টার ফস্ করিয়া জিজ্ঞাসা করেন, "আচ্ছা রতন, তোর মাকে মনে পড়ে?" সে অনেক কথা; কতক মনে পাড়, কতক মনে পড়ে না। মায়ের চেয়ে বাপ তাহাকে বেশি ভালোবাসিত, বাপকে অল্প অল্প মনে আছে। পরিশ্রম করিয়া বাপ সন্ধ্যাবেলায় ঘরে ফিরিয়া আসিত, তাহারই মধ্যে দৈবাৎ দুটি-একটি সন্ধ্যা তাহার মনে পরিষ্কার ছবির মতো অঙ্কিত আছে। এই কথা হইতে হইতে ক্রমে রতন পোস্টমাস্টারের পায়ের কাছে মাটির উপর বসিয়া পড়িত। মনে পড়িত, তাহার একটি ছোটোভাই ছিল–বহু পূর্বেকার বর্ষার দিনে একদিন একটা ডোবার ধারে দুইজনে মিলিয়া গাছের ভাঙা ডালকে ছিপ করিয়া মিছামিছি মাছধরা খেলা করিয়াছিল–অনেক গুরুতর ঘটনার চেয়ে সেই কথাটাই তাহার মনে বেশি উদয় হইত। এইরূপ কথাপ্রসঙ্গে মাঝে মাঝে বেশি রাত হইয়া যাইত, তখন আলস্যক্রমে পোস্টমাস্টারের আর রাঁধিতে ইচ্ছা করিত না। সকালের বাসি ব্যঞ্জন থাকিত এবং রতন তাড়াতাড়ি উনুন ধরাইয়া খানকয়েক রুটি সেঁকিয়া আনিত–তাহাতেই উভয়ের রাত্রের আহার চলিয়া যাইত।

এক-একদিন সন্ধ্যাবেলায় সেই বৃহৎ আটচালার কোণে আপিসের কাঠের চৌকির উপর বসিয়া পোস্টমাস্টারও নিজের ঘরের কথা পাড়িতেন–ছোটোভাই মা এবং দিদির কথা, প্রবাসে একলা ঘরে বসিয়া যাহাদের জন্য হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিত তাহাদের কথা। যে-সকল কথা সর্বদাই মনে উদয় হয় অথচ নীলকুঠির গোমস্তাদের কাছে যাহা কোনোমতেই উত্থাপন করা যায় না, সেই কথা একটি অশিক্ষিতা ক্ষুদ্র বালিকাকে বলিয়া যাইতেন, কিছুমাত্র অসংগত মনে হইত না। অবশেষে এমন হইল, বালিকা কথোপকথনকালে তাঁহার ঘরের লোকদিগকে মা দিদি দাদা বলিয়া চির-পরিচিতের ন্যায় উল্লেখ করিত। এমন-কি, তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়পটে বালিকা তাঁহাদের কাল্পনিক মূর্তিও চিত্রিত করিয়া লইয়াছিল।

একদিন বর্ষাকালে মেঘমুক্ত দ্বিপ্রহরে ঈষৎ-তপ্ত সুকোমল বাতাস দিতেছিল; রৌদ্রে ভিজা ঘাস এবং গাছপালা হইতে একপ্রকার গন্ধ উত্থিত হইতেছিল; মনে হইতেছিল, যেন ক্লান্ত ধরণীর উষ্ণ নিশ্বাস গায়ের উপরে আসিয়া লাগিতেছে; এবং কোথাকার এক নাছোড়বান্দা পাখি তাহার একটা একটানা সুরের নালিশ সমস্ত দুপুরবেলা প্রকৃতির দরবারে অত্যন্ত করুণস্বরে বার বার আবৃত্তি করিতেছিল। পোস্টমাস্টারের হাতে কাজ ছিল না-সেদিনকার বৃষ্টিধৌত মসৃণ চিক্কণ তরুপল্লবের হিল্লোল এবং পরাভূত বর্ষার ভগ্নাবশিষ্ট রৌদ্রশুভ্র স্তূপাকার মেঘস্তর বাস্তবিকই দেখিবার বিষয় ছিল; পোস্টমাস্টার তাহা দেখিতেছিলেন এবং ভাবিতেছিলেন, এই সময় কাছে একটি-কেহ নিতান্ত আপনার লোক থাকিত–হৃদয়ের সহিত একান্ত সংলগ্ন একটি স্নেহপুত্তলি মানবমূর্তি। ক্রমে মনে হইতে লাগিল, সেই পাখি ঐ কথাই বার বার বলিতেছে এবং এই জনহীন তরুচ্ছায়ানিমগ্ন মধ্যাহ্নের পল্লবমর্মরের অর্থও কতকটা ঐরূপ। কেহ বিশ্বাস করে না, এবং জানিতেও পায় না, কিন্তু ছোটো পল্লীর সামন্য বেতনের সাব-পোস্টমাস্টারের মনে গভীর নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে দীর্ঘ ছুটির দিনে এইরূপ একটা ভাবের উদয় হইয়া থাকে।

পোস্ট্‌মাস্টার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ডাকিলেন, "রতন।" রতন তখন পেয়ারাতলায় পা ছড়াইয়া দিয়ে কাঁচা পেয়ারা খাইতেছিল; প্রভুর কণ্ঠস্বর শুনিয়া অবিলম্বে ছুটিয়া

আসিল–হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "দাদাবাবু, ডাকছ?" পোস্টমাস্টার বলিলেন, "তোকে আমি একটু একটু করে পড়তে শেখাব।" বলিয়া সমস্ত দুপুরবেলা তাহাকে লইয়া 'স্বরে অ' 'স্বরে অ' করিলেন। এবং এইরূপে অল্পদিনেই যুক্ত-অক্ষর উত্তীর্ণ হইলেন।

শ্রাবণ মাসে বর্ষণের আর অন্ত নাই। খাল বিল নালা জলে ভরিয়া উঠিল। অহর্নিশি ভেকের ডাক এবং বৃষ্টির শব্দ। গ্রামের রাস্তায় চলাচল প্রায় একপ্রকার বন্ধ–নৌকায় করিয়া হাটে যাইতে হয়।

একদিন প্রাতঃকাল হইতে খুব বাদলা করিয়াছে। পোস্টমাস্টারের ছাত্রীটি অনেকক্ষণ দ্বারের কাছে অপেক্ষা করিয়া বসিয়া ছিল, কিন্তু অন্যদিনের মতো যথাসাধ্য নিয়মিত ডাক শুনিতে না পাইয়া আপনি খুঙ্গিপুঁথি লইয়া ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। দেখিল, পোস্টমাস্টার তাঁহার খাটিয়ার উপর শুইয়া আছেন–বিশ্রাম করিতেছেন মনে করিয়া অতি নিঃশব্দে পুনশ্চ ঘর হইতে বাহিরে যাইবার উপক্রম করিল। সহসা শুনিল–'রতন'। তাড়াতাড়ি ফিরিয়া গিয়া বলিল, "দাদাবাবু, ঘুমোচ্ছিলে?" পোস্টমাস্টার কাতরস্বরে বলিলেন, "শরীরটা ভালো বোধ হচ্ছে না–দেখ্ তো আমার কপালে হাত দিয়ে।"

এই নিতান্ত নিঃসঙ্গ প্রবাসে ঘনবর্ষায় রোগকাতর শরীরে একটুখানি সেবা পাইতে ইচ্ছা করে। তপ্ত ললাটের উপর শাঁখাপরা কোমল হস্তের স্পর্শ মনে পড়ে। এই ঘোর প্রবাসে রোগযন্ত্রণায় স্নেহময়ী নারী-রূপে জননী ও দিদি পাশে বসিয়া আছেন এই কথা মনে করিতে ইচ্ছা করে, এবং এ স্থলে প্রবাসীর মনের অভিলাষ ব্যর্থ হইল না। বালিকা রতন আর বালিকা রহিল না। সেই মুহূর্তেই সে জননীর পদ অধিকার করিয়া বসিল, বৈদ্য ডাকিয়া আনিল, যথাসময়ে বটিকা খাওয়াইল, সারারাত্রি শিয়রে জাগিয়া রহিল, আপনি পথ্য রাঁধিয়া দিল, এবং শতবার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁগো দাদাবাবু, একটুখানি ভালো বোধ হচ্ছে কি।"

বহুদিন পরে পোস্টমাস্টার ক্ষীণ শরীরে রোগশয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিলেন; মনে স্থির করিলেন, আর নয়, এখান হইতে কোনোমতে বদলি হইতে হইবে। স্থানীয় অস্বাস্থ্যের উল্লেখ করিয়া তৎক্ষণাৎ কলিকাতায় কর্তৃপক্ষদের নিকট বদলি হইবার জন্য দরখাস্ত করিলেন।

রোগসেবা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া রতন দ্বারের বাহিরে আবার তাহার স্বস্থান অধিকার করিল। কিন্তু পূর্ববৎ আর তাহাকে ডাক পড়ে না। মাঝে মাঝে উঁকি মারিয়া দেখে, পোস্ট্‌মাস্টার অত্যন্ত অন্যমনস্কভাবে চৌকিতে বসিয়া অথবা খাটিয়ায় শুইয়া আছেন। রতন যখন আহ্বান প্রত্যাশা করিয়া বসিয়া আছে, তিনি তখন অধীরচিত্তে তাঁহার দরখাস্তের উত্তর প্রতীক্ষা করিতেছেন। বালিকা দ্বারের বাহিরে বসিয়া সহস্রবার করিয়া তাহার পুরানো পড়া পড়িল। পাছে যেদিন সহসা ডাক পড়িবে সেদিন তাহার যুক্ত-অক্ষর সমস্ত গোলমাল হইয়া যায়, এই তাহার একটা আশঙ্কা ছিল। অবশেষে সপ্তাহখানেক পরে একদিন সন্ধ্যাবেলায় ডাক পড়িল। উদ্‌বেলিতহৃদয়ে রতন গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল, "দাদাবাবু, আমাকে ডাকছিলে?"

পোস্টমাস্টার বলিলেন, "রতন, কালই আমি যাচ্ছি।"
রতন। কোথায় যাচ্ছ, দাদাবাবু।
পোস্টমাস্টার। বাড়ি যাচ্ছি।
রতন। আবার কবে আসবে।

পোস্টমাস্টার। আর আসব না।

রতন আর কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিল না। পোস্টমাস্টার আপনিই তাহাকে বলিলেন, তিনি বদলির জন্য দরখাস্ত করিয়াছিলেন, দরখাস্ত নামঞ্জুর হইয়াছে; তাই তিনি কাজে জবাব দিয়া বাড়ি যাইতেছেন। অনেকক্ষণ আর কেহ কোনো কথা কহিল না। মিট্‌মিট্‌ করিয়া প্রদীপ জ্বলিতে লাগিল এবং এক স্থানে ঘরের জীর্ণ চাল ভেদ করিয়া একটি মাটির সরার উপর টপ্‌টপ্‌ করিয়া বৃষ্টির জল পড়িতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে রতন আস্তে আস্তে উঠিয়া রান্নাঘরে রুটি গড়িতে গেল। অন্যদিনের মতো তেমন চট্‌পট্‌ হইল না। বোধ করি মধ্যে মধ্যে মাথায় অনেক ভাবনা উদয় হইয়াছিল। পোস্টমাস্টারের আহার সমাপ্ত হইলে পর বালিকা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "দাদাবাবু, আমাকে তোমাদের বাড়ি নিয়ে যাবে?"

পোস্টমাস্টার হাসিয়া কহিলেন, "সে কী করে হবে।" ব্যাপারটা যে কী কী কারণে অসম্ভব তাহা বালিকাকে বুঝানো আবশ্যক বোধ করিলেন না।

সমস্ত রাত্রি স্বপ্নে এবং জাগরণে বালিকার কানে পোস্টমাস্টারের হাস্যধ্বনির কণ্ঠস্বর বাজিতে লাগিল– 'সে কী করে হবে।'

ভোরে উঠিয়া পোস্টমাস্টার দেখিলেন, তাঁহার স্নানের জল ঠিক আছে; কলিকাতার অভ্যাস-অনুসারে তিনি তোলা জলে স্নান করিতেন। কখন তিনি যাত্রা করিবেন সে কথা বলিকা কী কারণে জিজ্ঞাসা করিতে পারে নাই: পাছে প্রাতঃকালে আবশ্যক হয় এইজন্য রতন রাত্রে নদী হইতে তাঁহার স্নানের জল তুলিয়া আনিয়াছিল। স্নান সমাপন হইলে রতনের ডাক পড়িল। রতন নিঃশব্দে গৃহে প্রবেশ করিল এবং আদেশপ্রতীক্ষায় একবার নীরবে প্রভুর মুখের দিকে চাহিল। প্রভু কহিলেন, "রতন, আমার জায়গায় যে লোকটি আসবেন তাঁকে বলে দিয়ে যাব, তিনি তোকে আমারই মতন যত্ন করবেন; আমি যাচ্ছি বলে তোকে কিছু ভাবতে হবে না।" এই কথাগুলি যে অত্যন্ত স্নেহগর্ভ এবং দয়ার্দ্র হৃদয় হইতে উত্থিত সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই, কিন্তু নারীহৃদয় কে বুঝিবে। রতন অনেকদিন প্রভুর অনেক তিরস্কার নীরবে সহ্য করিয়াছে কিন্তু এই নরম কথা সহিতে পারিল না। একেবারে উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল, "না, না, তোমার কাউকে কিছু বলতে হবে না, আমি থাকতে চাই নে।"

পোস্ট্‌মাস্টার রতনের এরূপ ব্যবহার কখনো দেখেন নাই, তাই অবাক হইয়া রহিলেন।

নূতন পোস্ট্‌মাস্টার আসিল। তাহাকে সমস্ত চার্জ বুঝাইয়া দিয়া পুরাতন পোস্ট্‌মাস্টার গমনোন্মুখ হইলেন। যাইবার সময় রতনকে ডাকিয়া বলিলেন, "রতন, তোকে আমি কখনো কিছু দিতে পারি নি। আজ যাবার সময় তোকে কিছু দিয়ে গেলুম, এতে তোর দিন কয়েক চলবে।"

কিছু পথখরচা বাদে তাঁহার বেতনের যত টাকা পাইয়াছিলেন পকেট হইতে বাহির করিলেন। তখন রতন ধুলায় পড়িয়া তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "দাদাবাবু, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমাকে কিছু দিতে হবে না; তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমার জন্যে কাউকে কিছু ভাবতে হবে না"–বলিয়া এক-দৌড়ে সেখান হইতে পলাইয়া গেল।

হতপূর্ব পোস্টমাস্টার নিশ্বাস ফেলিয়া হাতে কার্পেটের ব্যাগ ঝুলাইয়া, কাঁধে ছাতা লইয়া মুটের মাথায় নীল ও শ্বেত রেখায় চিত্রিত টিনের পেঁটরা তুলিয়া ধীরে ধীরে নৌকাভিমুখে চলিলেন। যখন নৌকায় উঠিলেন এবং নৌকা ছাড়িয়া দিল, বর্ষাবিস্ফারিত নদী ধরণীর উচ্ছলিত অশ্রুরাশির মতো চারি দিকে ছলছল করিতে লাগিল, তখন হৃদয়ের মধ্যে অত্যন্ত একটা বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন–একটি সামান্য গ্রাম্য বালিকার করুণ মুখচ্ছবি যেন এক বিশ্বব্যাপী বৃহৎ অব্যক্ত মর্মব্যথা প্রকাশ করিতে লাগিল। একবার নিতান্ত ইচ্ছা হইল, 'ফিরিয়া যাই, জগতের ক্রোড়বিচ্যুত সেই অনাথিনীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসি'–কিন্তু তখন পালে বাতাস পাইয়াছে, বর্ষার স্রোত খরতর বেগে বহিতেছে, গ্রাম অতিক্রম করিয়া নদীকূলের শ্মশান দেখা দিয়েছে–এবং নদীপ্রবাহে ভাসমান পথিকের উদাস হৃদয়ে এই তত্ত্বের উদয় হইল, জীবনে এমন কত বিচ্ছেদ, কত মৃত্যু আছে, ফিরিয়া ফল কী। পৃথিবীতে কে কাহার।

কিন্তু রতনের মনে কোনো তত্ত্বের উদয় হইল না। সে সেই পোস্টআপিস গৃহের চারি দিকে কেবল অশ্রুজলে ভাসিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। বোধ করি তাহার মনে ক্ষীণ আশা জাগিতেছিল, দাদাবাবু যদি ফিরিয়া আসে–সেই বন্ধনে পড়িয়া কিছুতেই দূরে যাইতে পারিতেছিল না। হায় বুদ্ধিহীন মানবহৃদয়! ভ্রান্তি কিছুতেই ঘোচে না, যুক্তিশাস্ত্রের বিধান বহু বিলম্বে মাথায় প্রবেশ করে, প্রবল প্রমাণকেও অবিশ্বাস করিয়া মিথ্যা আশাকে দুই বাহুপাশে বাঁধিয়া বুকের ভিতরে প্রাণপণে জড়ইয়া ধরা যায়, অবশেষে একদিন সমস্ত নাড়ী কাটিয়া হৃদয়ের রক্ত শুষিয়া সে পলায়ন করে, তখন চেতনা হয় এবং দ্বিতীয় ভ্রান্তিপাশে পড়িবার জন্য চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে।

লেখক-পরিচিতি

১২৬৮ বঙ্গাব্দের ২৫শে বৈশাখ (১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই মে) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলকাতার সম্ভ্রান্ত ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আর মাতার নাম সারদা দেবী। রবীন্দ্রনাথ মা-বাবার চতুর্দশ সন্তান ও অষ্টম পুত্র। স্কুলজীবনে তিনি মনোযোগী ছিলেন না কিন্তু শিক্ষাজীবন তিনি যাপন করেন উন্মুক্ত ভাবে। তাই বাংলা মাধ্যম, ইংরেজি মাধ্যম, বিদেশের স্কুল সর্বত্রই তিনি সব এই তিনি কমবেশি পড়েছেন। কিন্তু কোথাও কোর্স সমাপ্ত করেননি। ১৮৭৮ খ্রিষ্টাব্দের আগেই 'জ্ঞানাঙ্কুর'ও 'প্রতিবিম্ব' পত্রিকায় 'বনফুল' নামের কাব্য এবং 'ভারতী' পত্রিকায় 'কাব্য-কাহিনী' নামের কাব্য রচনা করেন। সেই থেকে সাহিত্যরচনার প্রতি রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ দেখা যায়। তাই পরবর্তীকালে তিনি বাংলাসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, ছোটগল্পকার, প্রাবন্ধিক, সঙ্গীতরচয়িতা এবং সেরা দার্শনিক, সুরস্রষ্টা, চিত্রশিল্পী ইত্যাদি হিসেবে অভিহিত হন। বাংলা ছোটগল্প রচনায় তিনি জনকের ভূমিকায় অবতীর্ণ। তিনিই বাংলা ছোটগল্প রচনার পথ সৃষ্টি করেন এবং ছোট অনুভূতিকে গল্পে ধারণ করে মানবমনে অনুবেদনার বিশাল পরিমণ্ডলে নিয়ে আসেন। বাংলাদেশের শিলাইদহ, পতিসর, সাজাদপুর রবীন্দ্রমনে ছোটগল্প রচনার জন্য খুবই ছায়াপাত করে। এখানে এসেই তিনি সাধারণ বাঙালি জীবন গভীরভাবে অবলোকন করেন। ১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিলে সাপ্তাহিক 'হিতবাদী' পত্রিকায় 'পোস্ট্‌মাস্টার' ছোটগল্প প্রথম প্রকাশ পায়। গল্পটি সাজাদপুরে লেখা। তাঁর গল্পগুলো 'গল্পগুচ্ছ' নামে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের গল্পে মানুষের সুখ-দুঃখ-বিরহ-মিলনপূর্ণ নানা জীবন প্রত্যক্ষ করা যায়। ১৮৮৩ সালের ৯ই ডিসেম্বর

যশোরের (বর্তমান খুলনা) কন্যা ভবতারিণী দেবীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিয়ে হয়। ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ২২শে শ্রাবণ (১৯৪১ খিষ্টাব্দের ৭ই আগস্ট) তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

মূল বক্তব্য

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরে উল্লেখযোগ্য ছোটগল্প 'পোস্ট্‌মাস্টার'। গল্পে চরিত্র তিনটি– পোস্ট্‌মাস্টার, রতন ও প্রকৃতি। গল্পটিতে প্রকৃতি কেবল স্থানিক ও ভৌগোলিক পরিচয় বহন করেনি, গল্পের প্রধান দু'টি চরিত্রের আবেগকে নিয়ন্ত্রিত করেছে এবং গল্পের বিস্তার ও পরিণতিতে অমোঘ প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে। বর্ষাকালের মেঘমুক্ত দ্বিপ্রহরে রতন ও পোস্ট্‌মাস্টার পরস্পরের হৃদয়ের কাছাকাছি এসেছে, সম্পর্কের মধ্যভাগেও রয়েছে শ্রাবণের অন্তহীন বর্ষণ এবং গল্পটির শেষে পোস্ট্‌মাস্টারের বিদায় দৃশ্যও নদী বর্ষাবিস্ফারিত। কেবল পটভূমিকা রচনাতে নয়, বর্ষা–প্রকৃতির এই ছবি অন্তত কয়েকটি জায়গায় রতনের আবেগকে চমৎকারভাবে ইঙ্গিত করেছে। পোস্ট্‌মাস্টার সস্নেহে রতনের মত অশিক্ষিতা ক্ষুদ্র বালিকাকে পড়ানোর ভার নিয়েছেন, অনাদৃতা রতনের হৃদয় প্রশ্রয়ে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে, সে সানন্দে যুক্তাক্ষর উত্তীর্ণ হয়ে যায়। পোস্ট্‌মাস্টার আর রতন–এ দুটি চরিত্রের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার বিরাট ফারাক। এই ফারাকটি গল্পের বাক্যবিন্যাসে এবং উপস্থাপনায় পরিষ্কার। এই গল্পে পোস্ট্‌মাস্টারের প্রসঙ্গ এনে ফেলা হয়েছে বেশ সম্ভ্রমের সঙ্গে–পোস্ট্‌মাস্টার কলিকাতার ছেলে, আর রতন এসেছে যেন জলে ভেসে আসা কুটোর মতো। এই গল্পে একজন কিশোরীর পরিণতকামী মনোবিকাশের চিত্র আছে আর আছে নবীন যুবকের সব কিছুকে উপেক্ষা করার উদাসীনতা। রবীন্দ্রনাথ দিখিয়েছেন, এমন উদাসীন নবীন যুবকের কাছে প্রণয়ের পরিণতি প্রার্থনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। লেখক শেষ দিকে খানিকটা তাত্ত্বিক আধারে পৃথিবীতে কে কার–এই প্রশ্ন উত্থাপন করলেও গল্পের শেষে পাঠক এই বিচ্ছেদের বহুমুখী উত্তর খোঁজেন। বালিকাহৃদয়ের পুষ্পবন মথিতকারী নবীনযুবকের এমন উদাসীন আচরণ যে শুধুই অবজ্ঞা, তাতে আর সন্দেহ থাকে না।

বায়ুযানে পঞ্চাশ মাইল
(সফল স্বপ্ন)

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

যে সময় আমি "সুলতানার স্বপ্ন" লিখিয়াছিলাম, তখন এরোপ্লেন বা জেপেলিনের অস্তিত্ব ছিল না; এমনকি সে-সময় ভারতবর্ষে মোটরকারও আইসে নাই। বৈদ্যুতিক আলোক এবং পাখাও কল্পনার অতীত ছিল। অন্ততঃ আমি তখন সে সব কিছুই দেখি নাই।

প্রায় ছয় বৎসর পরে (১৯১১ খ্রীঃ) কলিকাতায় আসিয়া প্রথম হাওয়াই জাহাজ অতি দূর হইতে শূন্যে উড়িতে দেখিলাম। আমি নিজে কখনও উড়ো জাহাজে উঠিতে পাইব, এরূপ আশা কখনই করি নাই। শুধু নীরবে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতাম।

গত ৩১শে নভেম্বর (১৯৩০ খ্রীঃ) রবিবার সন্ধ্যার পর যখন শ্রীমান মোরাদ আসিয়া বলিলেন, "খালা আম্মা, চলুন, আগামী পরশু আমার প্লেনে আপনাকে উড়াইয়া আনি; কলিকাতার চারিদিকে উড়িতে প্রায় ৩৫ মিনিট লাগিবে!" তখন আমার প্রাণ অভূতপূর্ণ আনন্দে নাচিয়া উঠিল।

এ-শুভ সংবাদ বেশি লোককে জানাইলাম না দুই কারণে:–প্রথম কারণ এই যে, মাত্র দুই মাস পূর্ব্বে, "আর ১০১" নামক সুবৃহৎ এরোপ্লেন ধ্বংস হওয়ায় ৪৫ জন হতভাগ্য আরোহী সশরীরে নরকানলে দগ্ধ হইয়াছে। তাহার বিভীষণ স্মৃতি লোকের মনে তখনও জাজ্বল্যমান থাকায় সকলের মনে এরোপ্লেন সম্বন্ধে ভয়ানক আতঙ্ক আছে বলিয়া আমাকে লোকে উড়িতে বাধা দিবে। দ্বিতীয় কারণ, অনেকে ক্যামেরা লইয়া উপস্থিত থাকিবে আমার ফাটো লইতে।

যথাকালে ২রা ডিসেম্বর মঙ্গলবার বেলা প্রায় ৪টার সময় আমরা শুভযাত্রা করিলাম। এক মোটরে মিসেস্ রাসাদ (শীমান মোরাদের মাতা), তাঁহার তৃতীয় পুত্র ফোয়াদ, মিসেস্ দে এবং আমি; অপর মোটরে আমার ভগিনী ও তাঁহার পুত্র কন্যা প্রমুখ ছিলেন। যাত্রার সময়ে দেখি, আমার এক স্নেহময়ী ভগিনী মিসেস্ দাউদর রহমান আসিয়া উপস্থিত। তিনিও আমাদের সঙ্গে দমদম চলিলেন।

এরোড্রামে গিয়া দেখি, একেবারে মুক্ত ময়দান! কেবল আমাদের মোটর তিনটি এবং আমরাই! আমি আল্লাহ্‌কে ধন্যবাদ দিয়া বঙ্গের গৌরব প্রথম মুসলিম পাইলট শ্রীমান 'মোরাদের' প্লেনে গিয়া বসিলাম। আকাশে উড়িয়া দেখি–ধরাখানা সত্যই সরা তুল্য। আমি ক্রমে ৩০০০ (তিন হাজার) ফিট উর্দ্ধে উঠিয়াছি। তখনকার দৃশ্য বড় চমৎকার। আমার দক্ষিণ দিকে অস্তগামী সূর্য্য, বাম দিকে ১১ই রজবের (দ্বাদশীর) পূর্ণ-প্রায় চন্দ্র,–উভয়ে যেন আমার দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিতেছিল। নীচে চাহিয়া দেখি–কলিকাতার পাকা বাড়ীগুলি, কোঠা-বালাখানা, এমারত সব ইষ্টক-স্তূপের মত দেখাইতেছে,–হাবড়ার পুল কতটুকু খেলনা বিশেষ, আর হুগলী নদী,–সে ত জলাশয়ের সামান্য একটি রেখার মত দেখাইতেছিল। আমরা পঞ্চাশ মাইল চক্কর দিয়া নীচে

আসিলাম। আমি নামিলে পর মিসেস্ রাসাদ মাত্র ৫ মিনিটের জন্য উড়িলেন। শোকর আল্-হামদোলিল্লাহ্।

২৫ বৎসর পূর্বে লিখিত "সুলতানার স্বপ্নে" বর্ণিত বায়ুযানে আমি সত্যই বেড়াইলাম। বঙ্গের প্রথম মুসলিম পাইলটের সহিত যে প্রথম অবরোধ-বন্দিনী নারী উড়িল সে আমিই। আমার পূর্ব্বে যে কয়জন বঙ্গীয় মুস্‌লিম মহিলা এরোপ্লেনে উঠিয়াছেন, তাঁহারা উড়িয়াছেন সুদক্ষ ইউরোপীয়ান পাইলটের সহিত। আর তাঁহাদের মাথায় হেলমেট, কানে টেলিফোন এবং চক্ষে গগল্‌স্ ছিল। আমার এ সব কিছুই ছিল না। আমি সম্পূর্ণ নিরস্ত্র ও নিরুপায় অবস্থায় একটি বালকের সহিত গিয়াছিলাম। মধ্যপথে প্রয়োজন বোধ করিলে মোরাদের সহিত কথা বলিবার আমার কোনই উপায় ছিল না। শীতে কষ্ট হইবে না শুনিয়া গায়ের শালখানাও "মিসেস্"দের হাতে ফিরাইয়া দিলাম। প্লেনে বসিলে মোরাদ বলিলেন, "খালা আম্মা! ভাল মতো কান ঢাকিবেন।" যাঃ! কান আর কি দিয়া ঢাকিব?–শালটাও ত ফেলিয়া আসিলাম। সে সময় মাথার আঁচলখানাই ছিল একমাত্র সম্বল। ইঞ্জিনের ভয়ঙ্কর গর্জ্জনে যখন কানে তালা লাগিতেছিল, তখন বুঝিলাম, মোরাদ কেন কান ঢাকিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু আমার আভ্যন্তরীণ আনন্দের আতিশয্যের তুলনায় সে কষ্ট অসহ্য হইলেও, নগণ্য বোধ হইল।

বিমান-বীর মোরাদের সৎসাহস অত্যন্ত প্রশংসনীয়। আল্লাহ্ তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া তাঁহাকে নিরাপদে ফিরাইয়া আনুন, ইহাই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

কিন্তু আমি বলি, মিসেস্ রাসাদের ধৈর্য্য এবং সাহসও কম নয়। বেচারী অসহায়া বিধবা যে কত বড় পাষাণে বুক বাঁধিয়া প্রথম সন্তানটিকে সম্পূর্ণ একাকী কেপটাউন অভিমুখে রওনা হইতে দিয়াছিলেন এবং এখনও মোরাদকে একাকী বিলাতে যাইয়া প্লেনে কাজ শিখিতে দিয়াছেন তাহা ভাবিবার বিষয়। আল্লাহ্ তাহার সহায় হউন! আমিন!

লেখক-পরিচিতি

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন ৯ই ডিসেম্বর, ১৮৮০ সালে রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার অন্তর্গত পায়রাবন্দ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা জহীরুদ্দিন মোহাম্মদ আবু আলী হায়দার সাবের আর মাতা রাহাতুন্নেসা সাবেরা চৌধুরানী। তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন খ্যাতিমান বাঙালি নারী-সাহিত্যিক ও মুসলিম সমাজসংস্কারক। তাঁকে 'বাঙালি মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূত' হিসেবে গণ্য করা হয়। তাঁর প্রকৃত নাম 'রোকেয়া খাতুন' এবং বৈবাহিকসূত্রে নাম 'রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন'। রোকেয়া ঘরে বসেই প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ করেন এবং তাঁর আধুনিকমনস্ক বড় ভাই ইব্রাহীম সাবের ঘরেই গোপনে বোনকে বাংলা ও ইংরেজি শেখান।

১৯৮৯ সালে ১৮ বছর বয়সে রোকেয়ার বিয়ে হয় বিহারের ভাগলপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের সাথে। বিয়ের পর তিনি 'রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন' নামে পরিচিতি হন। স্বামীর আগ্রহে রোকেয়া সাহিত্যচর্চা শুরু করেন এবং ১৯০২ সালে 'পিপাসা' নামে একটি বাংলা গল্প লিখে সাহিত্যজগতে পদার্পণ করেন। কিন্তু ১৯০৯ সালে সাখাওয়াত হোসেন মারা যান। তখন রোকেয়া ভাগলপুওরে 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল' নামে

একটি মেয়েদের স্কুল এবং ১৯১৬ সালে মুসলিম বাঙালি নারীদের সংগঠন 'আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম' প্রতিষ্ঠা করেন। রোকেয়া সাহিত্যরচনার মাধ্যমেও সমাজসংস্কারের চেষ্টা করেছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলি হলো: 'পদ্মরাগ', 'অবরোধবাসিনী', 'মতিচুর'। তাছাড়া 'নবনূর', 'সওগাত', 'মোহাম্মদী' ইত্যাদি পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়। 'Sultana's Dream' 'নামে একটি ইংরেজি রচনাও আছে তাঁর। ১৯৩২ সালের ৯ ডিসেম্বর রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন মৃত্যুবরণ করেন।

মূল বক্তব্য

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের 'বায়ুযানে পঞ্চাশ মাইল' রচনাটি প্রথম প্রকাশ পেয়েছিল 'মোয়াজ্জিন' পত্রিকার ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসের সংখ্যায়। রোকেয়া এই লেখার একটি উপশিরোনাম দিয়েছিলেন: 'সফল স্বপ্ন'। তিনি ইংরেজি রচনা 'Sultana's Dream' বা তার ওপর ভিত্তি করে লেখা 'সুলতানার স্বপ্ন'-এ মেয়েদের নিয়ে স্বপ্ন দেখেছিলেন যে, মেয়েরা একদিন বৈজ্ঞানিক হবে, পাইলট হবে–অর্থাৎ সমাজ মেয়েদের যে কাজ করতে দেয় না, কিন্তু পুরুষেরা করে, সেই ভালো কাজগুলো করবে। সেই সমাজে মুসলিম মেয়েদের উড়োজাহাজ বা বায়ুযানে চড়াও তেমনি প্রায় নিষিদ্ধ ব্যাপার ছিল। কিন্তু রোকেয়া সেই কর্মটি সম্পাদন করেছেন অর্থাৎ তিনি বায়ুযানে চড়েছেন। এটাকেই তিনি স্বপ্ন দেখার সফলতা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি মুসলিম পাইলটের সঙ্গে মুসলিম নারী হিসেবে আকাশে বিমানভ্রমণ করে পরিতৃপ্ত হয়েছেন। মানুষ তার ইচ্ছের মতো বড়–রোকেয়ার এই রচনায় এটাই মূল-বক্তব্য।

পুঁইমাচা

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সহায়হরি চাটুজ্যে উঠানে পা দিয়াই স্ত্রীকে বলিলেন–একটা বড় বাটি কি ঘটি যা হয় কিছু দাও তো, তারক খুড়ো গাছ কেটেছে, একটু ভাল রস আনি।

স্ত্রী অন্নপূর্ণা খড়ের বান্নাঘরের দাওয়ায় বসিয়া শীতকালের সকালবেলা নারিকেল তেলের বোতলে ঝাঁটার কাটি পুরিয়া দুই আঙ্গুলের সাহায্যে ঝাঁটার কাটিলগ্ন জমানো তৈলটুকু সংগ্রহ করিয়া চুলে মাখাইতে ছিলেন। স্বামীকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি গায়ের কাপড় একটু টানিয়া দিলেন মাত্র, কিন্তু বাটি টি ঘটি বাহির করিয়া দিবার জন্য বিন্দুমাত্র আগ্রহ তো দেখাইলেনই না, এমন কি বিশেষ কোন কথাও বলিলেন না।

সহায়হরি অগ্রবর্তী হইয়া বলিলেন–কি হয়েছে, বসে রইলে যে? দাও না একটি ঘটি? আঃ ক্ষেন্তি-টেন্তি সব কোথায় গেল এরা? তুমি তেল মেখে বুঝি ছোঁবে না?

অন্নপূর্ণা তেলের বোতলটি সরাইয়া স্বামীর দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, পরে অত্যন্ত শান্ত সুরে জিজ্ঞাসা করিলেন–তুমি মনে মনে কি ঠাউরেছ বলতে পার?

স্ত্রীর অতিরিক্ত রকমের শান্ত সুরে সহায়হরির মনে ভীতির সঞ্চার হইল–ইহা যে ঝড়ের অব্যবহিত পূর্বের আকাশের স্থিরভাব মাত্র, তাহা বুঝিয়া তিনি মরিয়া হইয়া ঝড়ের প্রতীক্ষায় রহিলেন। একটু আম্‌তা আম্‌তা করিয়া কহিলেন–কেন.. কি আবার ... কি–

অন্নপূর্ণা পূর্বাপেক্ষাও শান্তসুরে কহিলেন–দেখ রঙ্গ কোর না বলছি–ন্যাকামি করতে হয় অন্য সময় কোর। তুমি কিছু জান না, নাকি খোঁজ রাখ না? অতবড় মেয়ে যার ঘরে, সে মাছ ধরে আর রস খেয়ে দিন কাটায় কি করে তা বলতে পার? গাঁয়ে কি গুজব রটেছে জান?

সহায়হরি আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন–কেন, কি গুজব?

–কি গুজব জিজ্ঞাসা করো গিয়া চৌধুরীদের বাড়ি। কেবল বাগ্‌দী-দুলে-পাড়ায় ঘুরে ঘুরে জন্ম কাটালে ভদ্দরলোকের গাঁয়ে বাস করা যায় না।–সমাজে থাকলে হলে সেই রকম মেনে চলতে হয়।

সহায়হরি বিস্মিত হইয়া কি বলিতে যাইতেছিলেন, অন্নপূর্ণা পূর্ববৎ সুরেই পুনর্বার বলিয়া উঠিলেন–একঘরে করবে গো তোমাকে একঘরে করবে, কাল চৌধুরীদের চণ্ডীমণ্ডপে এসব কথা হয়েছে। আমাদের হাতে ছোঁয়া জল আর কেউ খাবে না। আশীর্বাদ হয়ে মেয়ের বিয়ে হল না,–ও নাকি উচ্ছুগ্‌গু করা মেয়ে–গাঁয়ের কোন কাজে তোমাকে আর কেউ যেতে বলবে না–যাও, ভালোই হয়েছে তোমার। এখন গিয়ে দুলে-বাড়ি বাগ্‌দি-বাড়ি উঠে বসে দিন কাটাও।

সহায়হরি তাচ্ছিল্যের ভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন–এই! আমি বলি, না জানি কি ব্যাপার। একঘরে! সবাই একঘরে করেছেন, এবার বাকি আছেন কালীময় ঠাকুর!-ওঃ!...

অন্নপূর্ণা তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন–কেন, তোমাকে একঘরে করতে বেশি কিছু লাগে নাকি? তুমি কি সমাজের মাথা না একজন মাতব্বর লোক? চাল নেই চুলো নেই, এক কড়ার মুরোদ নেই, চৌধুরীরা তোমায় একঘরে করবে তা আর এমন কঠিন কথা কি?–আর সত্যিই তো এদিকে ধাড়ী মেয়ে হয়ে উঠল।... হঠাৎ স্বর নামাইয়া বলিলেন–হল যে পনেরো বছরের, বাইরে কমিয়ে ব'লে বেড়ালে কি হবে, লোকের চোখ নেই?... পুনরায় গলা উঠাইয়া বলিলেন–না বিয়ে দেবার গা, না কিছু। আমি কি যাব পাত্তর ঠিক করতে?

সশরীরে যতক্ষণ স্ত্রীর সম্মুখে বর্তমান থাকিবেন, স্ত্রীর গলার সুর ততক্ষণ কমিবার কোন সম্ভবনা নাই বুঝিয়া সহায়হরি দাওয়া হইতে তাড়াতাড়ি একটি কাঁসার বাটি উঠাইয়া লইয়া খিড়কি-দুয়ার লক্ষ্য করিয়া যাত্রা করিলেন–কিন্তু খিড়কি-দুয়ারের একটু এদিকে কি দেখিয়া হঠাৎ থামিয়া গেলেন এবং আনন্দপূর্ণ স্বরে বলিয়া উঠিলেন–এসব কি রে? ক্ষেন্তি মা, এসব কোথা থেকে আনলি? ওঃ! এ যে...

চোদ্দ-পনেরো বছরের একটি মেয়ে আর দুটি ছোট ছোট মেয়ে পিছনে লইয়া বাড়ি ঢুকিল। তাহার হাতে এক বোঝা পুঁইশাক, ডাঁটাগুলি মোটা ও হল্‌দে হল্‌দে, চেহারা দেখিয়া মনে হয় কাহারা পাকা পুঁই গাছ উবড়াইয়া ফেলিয়া উঠানের জঙ্গল তুলিয়া দিতেছিল; মেয়েটি তাহাদের উঠানের জঞ্জাল প্রাণপণে তুলিয়া আনিয়াছে–ছোট মেয়ে দু'টির মধ্যে একজনের হাত খালি, অপরটির হাতে গোটা দুই-তিন পুঁইপাতা জড়ানো কোন দ্রব্য।

বড় মেয়েটি খুব লম্বা, গোলগাল চেহারা, মাথার চুলগুলো রুক্ষ ও অগোছালো–বাতাসে উড়িতেছে, মুখখানা খুব বড়, চোখ দু'টা ডাগর ডাগর ও শান্ত। সরু সরু কাচের চুড়িগুলো, দু'পয়সা ডজনের একটি সেফটিপিন দিয়া একত্র করিয়া আটকানো। পিনটার বয়স খুঁজিতে যাইলে প্রাগৈতিহাসিক যুগে গিয়া পড়িতে হয়। এই বড় মেয়েটির নামই বোধ হয় ক্ষেন্তি, কারণ সে তাড়াতাড়ি পিছন ফিরিয়া তাহার পশ্চাদ্বর্তিনীর হাত হইতে পুঁইপাতা জড়ানো দ্রব্যটি লইয়া মেলিয়া ধরিয়া বলিল–চিংড়ি মাছ, বাবা। গয়া খুড়ির কাছে থেকে রাস্তায় নিলাম, দিতে চায় না, বলে–তোমার বাবার কাছে আর দিনকার দরুণ দুটো পয়সা বাকি আছে। আমি বললাম–দাও পিসী, আমার বাবা কি তোমায় দুটো পয়সা নিয়ে পালিয়ে যাবে–আর এই পুঁইশাকগুলো.. ঘাটের ধারের রায় কাকা বললে, নিয়ে যা... কেমন মোটা মোটা...

অন্নপূর্ণা দাওয়া হইতে অত্যন্ত ঝাঁজের সহিত চিৎকার করিয়া উঠিলেন–নিয়ে যা, আহা কি অমর্তই তোমাকে তারা দিয়েছে–পাকা পুঁইডাঁটা কাঠ হয়ে গিয়েছে, দুদিন পরে ফেলে দিত... নিয়ে যা... আর উনি তখন আগাছা উঠিয়ে নিয়ে এসেছেন–ভালোই হয়েছে, তাদের আর নিজেদের কষ্ট করে কাটতে হল না.. যত পাথুরে বোকা সব মরতে আসে আমার ঘাড়ে...ধাড়ী মেয়ে, বলে দিয়েছি না তোমায় বাড়ির বাইরে কোথাও পা দিও না? লজ্জা করে না এ-পাড়া সে-পাড়া করে বেড়াতে! বিয়ে হলে যে চার ছেলের মা হতে! খাওয়ার নামে আর জ্ঞান থাকে না, না?... কোথায় শাক, কোথায় বেগুন–আর একজন বেড়াচ্ছেন কোথায় রস, কোথায় ছাই,

কোথায় পাঁশ–ফেল্ বলছি ওসেব ... ফেল।...

মেয়েটি শান্ত অথচ ভয়-মিশ্রিত দৃষ্টিতে মার দিকে চাহিয়া হাতের বাঁধনে আলগা করিয়া দিল, পুঁইশাকের বোঝা মাটিতে পড়িয়া গেল। অন্নপূর্ণা বকিয়া চলিলেন–যা তো রাধী, ও আপদগুলো টেনে খিড়কির পুকুরের ধারে ফেলে দিয়ে আয় তো–যা, ফের যদি বাড়ির বার হতে দেখেছি, তবে ঠ্যাং যদি খোঁড়া না করি তো..

বোঝা মাটিতে পড়িয়া গিয়াছিল। ছোট মেয়েটি কলের পুতুলের মতন সেগুলি তুলিয়া লইয়া খিড়কি অভিমুখে চলিল, কিন্তু ছোট মেয়ে অত বড় বোঝা আঁকড়াইতে পারিল না, অনেকগুলি ডাঁটা ওদিকে এদিকে ঝুলিতে ঝুলিতে চলিল।... সহায়হরির ছেলেমেয়েরা তাহাদের মাকে অত্যন্ত ভয় করিত!

সহায়হরি আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিতে গেলেন–তা এনেছে ছেলেমানুষ খাবে বলে ...তুমি আবার... বরং..

পুঁইশাকের বোঝা লইয়া যাইতে যাইতে ছোট মেয়েটি ফিরিয়া দাঁড়াইয়া মার মুখের দিকে চাহিল। অন্নপূর্ণা তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন–না না, নিয়ে যা, খেতে হবে না–মেয়েমানুষের আবার অত নোলা কিসের? এক পাড়া থেকে আর এক পাড়ার নিয়ে আসবে দুটো পাকা পুঁইশাক ভিক্ষে করে! যা, যা তুই যা, দূর করে বনে দিয়ে আয়...

সহায়হরি বড় মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন তাহার চোখ দুটা জলে ভরিয়া আসিয়াছে। তাঁর মনে বড় কষ্ট হইল। কিন্তু মেয়ের যতই সাধের জিনিস হোক, পুঁইশাকের পক্ষাবলম্বন করিয়া দুপুর বেলা স্ত্রীকে চটাইতে তিনি আদৌ সাহসী হইলেন না।–নিঃশব্দে খিড়কি-দোর দিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

বসিয়া রাঁধিতে রাঁধিতে বড় মেয়ের মুখের কাতর দৃষ্টি স্মরণে পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে অন্নপূর্ণার মনে পড়িল–গত অরন্ধনের পূর্বদিন বাড়িতে পুঁইশাক রান্নার সময় ক্ষেন্তি আবদার করিয়া বলিয়াছিল–মা, অর্ধেকগুলো কিন্তু একা আমার, অর্ধেক সব মিলে তোমাদের!

বাড়িতে কেহ ছিল না, তিনি নিজে গিয়া উঠানের ও খিড়কি-দোরের আশেপাশে যে ডাঁটা পড়িয়াছিল, সেগুলি কুড়াইয়া লইয়া আসিলেন–বাকিগুলো কুড়ানো যায় না, ডোবার ধারের ছাই-গাদায় ফেলিয়া দিয়াছে। কুচো চিংড়ি দিয়া এইরূপে চুপিচুপিই পুঁইশাকের তরকারি রাঁধিলেন।

দুপুরবেলা ক্ষেন্তি পাতে পুঁইশাকের চচ্চড়ি দেখিয়া আনন্দপূর্ণ ডাগর চোখে মায়ের দিকে ভয়ে ভয়ে চাহিল। দু'এক বার এদিকে ওদিকে ঘুরিয়া আসিতেই অন্নপূর্ণা দেখিলেন উক্ত পুঁইশাকের একটুকরাও তাহার পাতে পড়িয়া নাই। পুঁইশাকের উপর তাঁহার এই মেয়েটির কিরূপ লোভ তাহা তিনি জানিতেন, জিজ্ঞাসা করিলেন–কিরে ক্ষেন্তি, আর একটু চচ্চড়ি দিই? ক্ষেন্তি তৎক্ষণাৎ ঘাড় নাড়িয়া এ আনন্দজনক প্রস্তাব সমর্থন করিল। কি ভাবিয়া অন্নপূর্ণার চোখে জল আসিল, চাপিতে গিয়া তিনি চোখ উঁচু করিয়া চালের বাতায় গোঁজা ডালা হইতে শুকনা লঙ্কা পাড়িতে লাগিলেন।

কালীময়ের চণ্ডীমণ্ডপে সেদিন বৈকাল বেলা সহায়হরির ডাক পড়িল। সংক্ষিপ্ত ভূমিকা ফাঁদিবার পর কালীময় উত্তেজিত সুরে বলিলেন–সে সব দিন কি আর আছে ভায়া? এই ধরো কেষ্ট মুখুজ্যে... স্বভাব নইলে পাত্রে দেব না, স্বভাব নইলে পাত্রে দেব না করে কি কাণ্ডটাই করলে–অবশেষে কিনা হরির ছেলেটাকে ধরে পড়ে মেয়ের বিয়ে দেয় তবে রক্ষে! তার কি স্বভাব? রাম বলো, ছ'সাত পুরুষে ভঙ্গ, পচা শ্রোত্রীয়! পরে সুর নরম করিয়া বলিলেন, তা সমাজের সেসব শাসনের দিন কি আর আছে? দিন দিন চলে যাচ্ছে। বেশি দূর যাই কেন, এই যে তোমার মেয়েটি তেরো বছরের...

সহায়হরি বাধা দিয়া বলিতে গেলেন–এই শ্রাবণে তেরোয়...

–আহা-হা, তেরোয় আর ষোলোয় তফাৎ কিসের শুনি? তেরোয় আর ষোলোয় তফাৎটা কিসের? আর সে তেরোই হোক, চাই ষোলোই হোক, চাই পঞ্চাশই হোক, তাতে আমাদের দরকার নেই, সে তোমার হিসেব তোমার কাছে। কিন্তু পাত্তর আশীর্বাদ হয়ে গেল, তুমি বেঁকে বসলে কি জন্যে শুনি? ও তো একরকম উচ্ছুগ্‌গু করা মেয়ে। আশীর্বাদ হওয়াও যা বিয়ে হওয়াও তা, সাতপাকের যা বাকি, এই তো?... সমাজে বসে এসব কাজগুলো তুমি যে করবে আর আমরা বসে বসে দেখব, এ তুমি মনে ভেবো না। সমাজের বামুনদের যদি জাত মারবার ইচ্ছে না থাকে মেয়ের বিয়ের বন্দোবস্ত ক'রে ফেল। ... পাত্তর পাত্তর! রাজপুত্তুর না হলে কি পাত্তর মেলে না?... গরিব মানুষ, দিতে থুতে পারবে না বলেই শ্রীমন্ত মজুমদারের ছেলেকে ঠিক করে দিলাম। লেখাপড়া নাই বা জানল? জজ-মেজেস্টার না হলে কি মানুষ হয় না?–দিব্যি বাড়ি বাগান পুকুর–শুনলাম এবার নাকি কুড়ির জমিতে চাট্টি আমন ধানও করেছে, ব্যস,–রাজার হাল! দুই ভাইয়ের অভাব কি?...

ইতিহাসটা হইতেছে যে, মণিগাঁয়ের উক্ত মজুমদার মহাশয়ের পুত্রটি কালীময়ই ঠিক করিয়া দেন। কেন কালীময় মাথা-ব্যথা করিয়া সহায়হরির মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ মজুমদার মহাশয়ের ছেলের সঙ্গে ঠিক করিতে গেলেন, তাহার কারণ নির্দেশ করিতে যাইয়া কেহ কেহ বলেন যে, কালীময় নাকি মজুমদার মহাশয়ের কাছে অনেক টাকা ধারেন, অনেক দিনের সুদ পর্যন্ত বাকি–শীঘ্র নালিশ হইবে, ইত্যাদি। এ গুজব যে শুধু অবান্তর তাহাই নহে, ইহার কোন ভিত্তি আছে বলিয়াও মনে হয় না। ইহা দুষ্ট পক্ষের রটনা মাত্র। যাহাই হউক, পাত্রপক্ষ আশীর্বাদ করিয়া যাওয়ার দিনকতক পরে সহায়হরি টের পান, পাত্রটি কয়েক মাস পূর্বে নিজের গ্রামে কি একটা করিবার ফলে গ্রামের এক কুম্ভকার-বধূর আত্মীয়-স্বজনের হাতে বেদম প্রহার খাইয়া কিছুদিন নাকি শয্যাগত ছিল। এ রকম পাত্রে মেয়ে দিবার প্রস্তাব মনঃপূত না হওয়ায় সহায়হরি সে সম্বন্ধ ভাঙিয়া দেন।

দিন দুই পরের কথা। সকালে উঠিয়া সহায়হরি উঠানে বাতাবিলেবুর গাছের ফাঁক দিয়া যেটুকু নিতান্ত কচি রাঙা রৌদ্র আসিয়াছিল,তাহারই আতপে বসিয়া আপন মনে তামাক টানিতেছেন। বড় মেয়ে ক্ষেন্তি আসিয়া চুপি চুপি বলিল–বাবা, যাবে না? মা ঘাটে গেল....

সহায়হরি একবার বাড়ির পাশের ঘাটের পথের দিকে কি জানি কেন চাহিয়া দেখিলেন, পরে নিম্নস্বরে বলিলেন, যা শীগ্‌গির শাবলখানা নিয়ে আয় দিকি! কথা শেষ করিয়া তিনি উৎকণ্ঠার

সহিত জোরে জোরে তামাক টানিতে লাগিলেন এবং পুনরায় একবার কি জানি কেন খিড়কির দিকে সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। ইতিমধ্যে প্রকাণ্ড ভারী একটি লোহার শাবল দুই হাত দিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া ক্ষেন্তি আসিয়া পড়িল–তৎপরে পিতা-পুত্রীতে সন্তর্পণে সম্মুখের দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেল। ইহাদের ভাব দেখিয়া মনে হইতেছিল–ইহারা কাহারো ঘরে সিঁদ দিবার উদ্দেশ্যে চলিয়াছে।

অন্নপূর্ণা সম্মান করিয়া সবে কাপড় ছাড়িয়া উনুন ধরাইবার জোগাড় করিতেছেন, মুখুজ্যেবাড়ির ছোট খুকি দুর্গা আসিয়া বলিল, খুড়িমা, মা বলে দিলে, খুড়িমাকে গিয়ে বল্–মা ছোঁবে না, তুমি আমাদের নবান্নটা মেখে আর ইতুর ঘটগুলো বার করে দিয়ে আসবে?

মুখুজ্যে-বাড়ি ও পাড়ায়–যাইবার পথের বাঁ ধারে এক জায়গায় শেওড়া, বনভাঁট, রাংচিতা, বনচাল্‌তা গাছের ঘন বন। শীতের সকালে এক প্রকার লতাপাতার ঘন গন্ধ বন হইতে বাহির হইতেছিল। একটা লেজ-ঝোলা হল্‌দে পাখি আমড়া গাছের এ-ডাল হইতে ও-ডালে যাইতেছে।

দুর্গা আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল, খুড়িমা খুড়িমা, ঐ যে কেমন পাখিটা!–পাখি দেখিতে গিয়া অন্নপূর্ণা কিন্তু আর একটা জিনিস লক্ষ্য করিলেন। ঘন বনটার মধ্যে কোথায় এতক্ষণ খুপ্ খুপ্ করিয়া একটা আওয়াজ হইতেছিল... কে যেন কি খুঁড়িতেছে ... দুর্গার কথার পরেই হঠাৎ সেটা বন্ধ হইয়া গেল। অন্নপূর্ণা সেখানে খানিকক্ষণ থমকিয়া দাঁড়াইলেন, পরে চলিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা খানিকদূরে যাইতে না যাইতে বনের মধ্যে পুনরায় খুপ্ খুপ্ শব্দ আরম্ভ হইল।

কাজ করিয়া ফিরিতে অন্নপূর্ণার কিছু বিলম্ব হইল। বাড়ি ফিরিয়া দেখিলেন, ক্ষেন্তি উঠানের রৌদ্রে বসিয়া তেলের বাটি সম্মুখে লইয়া খোঁপা খুলিতেছে। তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মেয়ের দিকে চাহিয়া দেখিয়া রান্নাঘরে গিয়া উনুন ধরাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। মেয়েকে বলিলেন–এখনও নাইতে যাসনি যে, কোথায় ছিলি এতক্ষণ?

ক্ষেন্তি তাড়াতাড়ি উত্তর দিল–এই যে যাই মা, এক্ষুনি যাব আর আসব।

ক্ষেন্তি স্নান করিতে যাইবার একটুখানি পরেই সহায়হরি সোৎসাহে পনেরো ষোল সের ভারী একটা মেটে আলু ঘাড়ে করিয়া কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সম্মুখে স্ত্রীকে দেখিয়া কৈফিয়তের দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়াই বলিয়া উঠিলেন–ওই ও পাড়ার ময়শা চৌকিদার রোজই বলে–কর্তাঠাকুর, তোমার বাপ থাকতে তবু মাসে মাসে এদিকে তোমাদের পায়ের ধুলো পড়ত, তা আজকাল তো তোমরা আর আসো না, এই বেড়ার গায়ে মেটে আলু করে রেখেছি, তা দাদাঠাকুর বরং...

অন্নপূর্ণা স্থির দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিলেন–বরোজপোতার বনের মধ্যে বসে খানিক আগে কি করছিলে শুনি?

সহায়হরি অবাক হইয়া বলিলেন–আমি! না আমি কখন? কক্ষনো না, এই তো আমি... সহায়হরির ভাব দেখিয়া মনে হইতেছিল তিনি এইমাত্র আকাশ হইতে পড়িয়াছেন।

অন্নপূর্ণা পূর্বের মতই স্থির দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিলেন–চুরি তো করবেই, তিন কাল গিয়েছে এক কাল আছে, মিথ্যা কথাগুলো আর এখন বলো না।...আমি সব জানি। মনে ভেবেছিলে আপদ ঘাটে গিয়েছে, আর কি... দুর্গার মা ডেকে পাঠিয়েছিল, ও পাড়ায় যাচ্ছি, শুনলাম বরোজপোতার বনের মধ্যে কি সব খুপ্ খুপ্ শব্দ... তখনি আমি বুঝতে পেরেছি, সাড়া পেয়ে শব্দ বন্ধ হয়ে গেল, যেই আবার খানিকদূর গেলাম আবার দেখি শব্দ... তোমার তো ইহকালও নেই পরকালও নেই, চুরি করতে, ডাকাতি করতে, যা ইচ্ছে করো, কিন্তু মেয়েটাকে আবার এর মধ্যে নিয়ে গিয়ে ওর মাথা খাওয়া কিসের জন্যে?

সহায়হরি হাত নড়িয়া, বরোজপোতায় তাঁহার উপস্থিতি থাকার বিরুদ্ধে কতকগুলি প্রমাণ উত্থাপন করিবার চেষ্টা করিতে গেলেন; কিন্তু স্ত্রীর চোখের দৃষ্টির সামনে তাঁহার বেশি কথাও জোগাইল না বা কথিত উক্তিগুলির মধ্যে কোন পৌর্বাপর্য সম্বন্ধও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।...

আধ ঘণ্টা পরে ক্ষেন্তি স্নান সারিয়া বাড়ি ঢুকিল। সম্মুখস্থ মেটে আলুর দিকে একবার আড়চোখে চাহিয়াই নিরীহমুখে উঠানের আলনায় অত্যন্ত মনোযোগের সহিত কাপড় মেলিয়া দিতেছিল।

অন্নপূর্ণা ডাকিলেন–ক্ষেন্তি, এদিকে একবার আয় তো, শুনে যা...

মায়ের ডাক শুনিয়া ক্ষেন্তির মুখ শুকাইয়া গেল–সে ইতস্তত করিতে করিতে মা'র নিকট আসিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন–এই মেটে আলুটা দু'জনে মিলে তুলে এনেছিস, না?

ক্ষেন্তি মা'র মুখের দিকে একটুখানি চাহিয়া থাকিয়া একবার ভূপতিত মেটে আলুটার দিকে চাহিল, পরে পুনরায় মা'র মুখের দিকে চাহিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ক্ষিপ্রদৃষ্টিতে একবার বাড়ির সম্মুখস্থ বাঁশঝাড়ের দিকেও চাহিয়া লইল; তাহার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল, কিন্তু মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না।

অন্নপূর্ণা কড়া সুরে বলিলেন–কথা বলছিস নে যে বড়? এই মেটে আলু তুই এনেছিস কিনা?

ক্ষেন্তি বিপন্ন চোখে মা'র মুখের দিকেই চাহিয়া দিল, উত্তর ছিল, হাঁ।

অন্নপূর্ণা তেলেবেগুনে জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন, পাজী, তোমার পিঠে আমি আস্ত কাঠের চেলা ভাঙব তবে ছাড়ব, বরোজপোতার বনে গিয়েছো মেটে আলু চুরি করতে? সোমত্ত মেয়ে, বিয়ের যুগ্যি হয়ে গেছে কোন্ কালে, সেই একগলা বিজন বন, তার মধ্যে দিনদুপুরে বাঘ লুকিয়ে থাকে, তার মধ্যে থেকে পরের আলু নিয়ে এলো তুলে! যদি গোসাঁইরা চৌকিদার ডেকে তোমায় ধরিয়ে দেয়? তোমার কোন্ শ্বশুর এসে তোমায় বাঁচাত? আমার জোটে খাব, না জোটে না খাব, তা বলে পরের জিনিসে হাত? এ মেয়ে নিয়ে আমি কি করব, মা?

দু'তিন দিন পরে একদিন বৈকালে ধূলামাটি মাখা হাতে ক্ষেন্তি মাকে আসিয়া বলিল–মা মা, দেখবে এসো...

অন্নপূর্ণা গিয়া দেখিলেন, ভাঙা পাঁচিলের ধারে যে ছোট খোলা জমিতে কতকগুলো পাথরকুচি

ও কন্টিকারীর জঙ্গল হইয়াছিল, ক্ষেন্তি ছোট বোনটিকে লইয়া সেখানে মহা উৎসাহে তরকারির আওলাত করিবার আয়োজন করিতেছে এবং ভবিষ্যসম্ভাবী নানাবিধ কাল্পনিক ফলমূলের অগ্রদূত-স্বরূপ বর্তমানে কেবল একটিমাত্র শীর্ণকায় পুঁইশাকের চারা কাপড়ের ফালির গ্রন্থি-বন্ধনে বদ্ধ হইয়া ফাঁসি হইয়া যাওয়া আসামীর মতন ঊর্ধ্বমুখে এক খণ্ড শুষ্ক কঞ্চির গায়ে ঝুলিয়া রহিয়াছে। ফলমূলাদির অবশিষ্টগুলি আপাতত তাঁর বড় মেয়ে মস্তিষ্কের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছে, দিনের আলোয় এখনও বাহির হয় নাই।

অন্নপূর্ণা হাসিয়া বলিলেন, দূর পাগলী, একন পুঁইডাঁটার চারা পোঁতে কখনো? বর্ষাকালে পুঁততে হয়। এখন যে জল না পেয়ে মরে যাবে!

ক্ষেন্তি বলিল–কেন, আমি আমি রোজ জল ঢালব?

অন্নপূর্ণা বলিলেন–দেখ, হয়ত বেচে যেতেও পারে! আজকাল রাতে খুব শিশির হয়।

খুব শীত পড়িয়াছে। সকালে উঠিয়া সহায়হরি দেখিলেন, তাঁহার দুই ছোট মেয়ে দোলাই গায়ে বাঁধিয়া রোদ উঠিবার প্রত্যাশায় উঠানের কাঁঠালতলায় দাঁড়াইয়া আছে। একটা ভাঙা ঝুড়ি করিয়া ক্ষেন্তি শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে মুখুজ্যে-বাড়ি হইতে গোবর কুড়াইয়া আনিল। সহায়হরি বলিলেন–হাঁ মা ক্ষেন্তি, তা সকালে উঠে জামাটা গায় দিতে তোর কি হয়? দেখ দিকি, এই শীত!

–আচ্ছা দিচ্ছি বাবা, কই শীত, তেমন তো...

–হাঁ দে মা, এক্ষুনি দে–অসুখ-বিসুখ পাঁচ রকম হতে পারে, বুঝলি নে?–সহায়হরি বাহির হইয়া গেলেন, ভাবিতে ভাবিতে গেলেন, তিনি কি অনেক দিন মেয়ের মুখে ভালো করিয়া চাহেন নাই? ক্ষেন্তির মুখ এখন সুশ্রী হইয়া উঠিয়াছে?

জামার ইতিহাস নিম্নলিখিত রূপ। বহু বৎসর অতীত হইল, হরিপুরের রাসের মেলা হইতে সহায়হরি কালো সার্জের এই আড়াই টাকা মূল্যের জামাটি ক্রয় করিয়া আনেন। ছিঁড়িয়া যাইবার পর তাহাতে কতবার রিপু ইত্যাদি করা হইয়াছিল, সম্প্রতি গত বৎসর হইতে ক্ষেন্তির স্বাস্থ্যোন্নতি হওয়ার দরুণ জামাটি তাহার গায়ে হয় না। সংসারের এসব খোঁজ সহায়হরি কখনও রাখিতেন না। জামার বর্তমান অবস্থা অন্নপূর্ণারও জানা ছিল না–ক্ষেন্তির নিজস্ব ভাঙা টিনের তোরঙ্গের মধ্যেই উহা থাকিত।

পৌষ সংক্রান্তি। সন্ধ্যবেলা অন্নপূর্ণা একটা কাঁসিতে চালের গুড়া ময়দা ও গুড় দিয়া চটকাইতে ছিলেন–একটি ছোট বাটিতে একবাটি তেল। ক্ষেন্তি কুরুনির নীচে একটা কলার পাতা পাড়িয়া এক মালা নারিকেল কুরিতেছে। অন্নপূর্ণা প্রথমে ক্ষেন্তির সাহায্য লইতে স্বীকৃত হন নাই, কারণ সে যেখানে সেখানে বসে, বনে বাদাড়ে ঘুরিয়া ফেরে, তাহার কাপড়-চোপড় শাস্ত্রসম্মত ও শুঁচি নহে। অবশেষে ক্ষেন্তি নিতান্ত ধরিয়া পড়ায় হাত-পা ধোয়াইয়া ও শুদ্ধ কাপড় পরাইয়া তাহাকে বর্তমান পদে নিযুক্ত করিয়াছেন।

ময়দার গোলা মাখা শেষ হইলে অন্নপূর্ণা উনুনে খোলা চাপাইতে যাইতেছেন, ছোট মেয়ে রাধা

হঠাৎ ডান হাতখানা পাতিয়া বলিল, মা, ঐ একটু...

অন্নপূর্ণা বড় গামলাটা হইতে একটুখানি গোলা তুলিয়া লইয়া হাতের আঙুল পাঁচটি দ্বারা একটি বিশেষ মুদ্রা রচনা করিয়া সেটুকু রাধার প্রসারিত হাতের উপর দিলেন। মেজো মেয়ে পুঁটি অমনি ডান হাতখানা কাপড়ে তাড়াতাড়ি মুছিয়া লইয়া মা'র সামনে পাতিয়া বলিল–মা, আমায় একটু...

ক্ষেন্তি শুচিবস্ত্রে নারিকেল কুরিতে কুরিতে লুব্ধনেত্রে মধ্যে মধ্যে এদিকে চাহিতেছিল, এ সময় খাইতে চাওয়ায় মা পাছে বকে, সেই ভয়ে চুপ করিয়া রহিল।

অন্নপূর্ণা বলিলেন–দেখি, নিয়ে আয় ক্ষেন্তি ঐ নারকেল মালাটা, ওতে তোর জন্যে একটু রাখি। ... ক্ষেন্তি ক্ষিপ্র হস্তে নারিকেলের উপরের মালাখানা, যাহাতে ফুটা নাই, সেখানে সরাইয়া দিল, অন্নপূর্ণা তাহাতে একটু বেশি করিয়া গোলা ঢালিয়া দিলেন।

মেজো মেয়ে পুঁটি বলিল–জেঠাইমারা অনেকখানি দুধ নিয়েছে, রাঙাদিদি ক্ষীর তৈরি করছিল, ওদের অনেক রকম হবে।

ক্ষেন্তি মুখ তুলিয়া বলিল–এ বেলা আবার হবে নাকি? ওরা তো ওবেলা ব্রাহ্মণ নেমন্তন্ন করেছিল সুরেশ কাকাকে আর ও পাড়ার তিনুর বাবাকে। ওবেলা তো পায়েস, ঝোল পুলি, মুগতক্তি, এই সব হয়েছে।

পুঁটি জিজ্ঞাসা করিল, হ্যাঁ মা, ক্ষীর নইলে নাকি পাটিসাপ্‌টা হয় না? খেঁদি বলছিল, ক্ষীরের পুর না হলে কি আর পাটিসাপ্‌টা হয়? আমি বললাম, কেন, আমার মা তো শুধু নারকেলের ছাঁই দিয়ে করে, সে তো কেমন লাগে!

অন্নপূর্ণা বেগুনের বোঁটায় একটুখানি তেল লইয়া খোলায় মাখাইতে মাখাইতে প্রশ্নের সদুত্তর খুঁজিতে লাগিলেন।

ক্ষেন্তি বলিল–খেঁদির ওই সব কথা। খেঁদির মা তো ভারি পিঠে করে কিনা? ক্ষীরের পুর দিয়ে ঘিয়ে ভাজলেই কি আর পিঠে হল? সেদিন জামাই এলে ওদের বাড়ি দেখতে গেলুম কিনা, তাই খুড়িমা দুখানা পাটিসাপ্‌টা খেতে দিলে, ওমা কেমন একটা ধরা-ধরা গন্ধ, আর মা'র পিঠেতে কখনো কোন গন্ধ পাওয়া যায় ? পাটিসাপ্‌টায় ক্ষীর দিলে ছাই খেতে হয়!

বেপরোয়াভাবে উপরোক্ত উক্তি শেষ করিয়া ক্ষেন্তি মা'র চোখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল–মা, নারকোল-কোরা একটু নেবো?

অন্নপূর্ণা বলিলেন–নে, কিন্তু এখানে বসে খাসনে। মুখ থেকে পড়বে না কি হবে, যা ঐদিকে যা।

ক্ষেন্তি নারকেলের মালায় এক থাবা কোরা তুলিয়া লইয়া একটু দূরে গিয়া খাইতে লাগিল। মুখ যদি মনের দর্পণস্বরূপ হয়, তবে ক্ষেন্তির মুখ দেখিয়া সন্দেহের কোন কারণ থাকিতে পারিত না যে, সে অত্যন্ত মানসিক তৃপ্তি অনুভব করিতেছে।

ঘণ্টাখানেক পরে অন্নপূর্ণা বলিলেন–ওরে, তোরা সব এক এক টুকরো পাতা পেতে বোস তো দেখি! গরম গরম দিই। ক্ষেন্তি, জল দেওয়া ভাত আছে ওবেলার, বার করে নিয়ে আয়।

ক্ষেন্তির নিকট অন্নপূর্ণার এ প্রস্তাব যে মনঃপূত হইল না, তাহা তার মুখ দেখিয়া বোঝা গেল। পুঁটি বলিল–মা, বড়দি পিঠেই খাক। ভালোবাসে। ভাত বরং থাকুক, আমার কাল সকালে খাব।

খানকয়েক খাইবার পরেই ছোট মেয়ে রাধা আর খাইতে চাহিল না। সে নাকি অধিক মিষ্ট খাইতে পারে না। সকলের খাওয়া শেষ হইয়া গেলেও ক্ষেন্তি তখনও খাইতেছে। সে মুখ বুজিয়া শান্তভাবে খায়, বড় একটা কথা কহে না। অন্নপূর্ণা দেখিলেন, সে কম করিয়াও আঠারো-উনিশখানা খাইয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলেন–ক্ষেন্তি, আর নিবি?... ক্ষেন্তি খাইতে খাইতে শান্ত ভাবে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল। অন্নপূণা তাহাকে আরও খানকয়েক দিলেন। ক্ষেন্তির মুখ চোখ ঈষৎ উজ্জ্বল দেখাইল, হাসি-ভরা চোখে মা'র দিকে চাহিয়া বলিল–বেশ খেতে হয়েছে, মা। ঐ যে তুমি কেমন ফেনিয়ে নেও, ওতেই কিন্তু... সে পুনরায় খাইতে লাগিল!

অন্নপূর্ণা হাতা, খুন্তি, চুলী তুলিতে তুলিতে সস্নেহে তাঁর এই শান্ত নিরীহ একটু অধিক মাত্রায় ভোজনপটু মেয়েটির দিকে চাহিয়া রহিলেন। মনে মনে ভাবিলেন–ক্ষেন্তি আমার যার ঘরে যাবে, তাদের অনেক সুখ দেবে। এমন ভালোমানুষ, কাজকর্মে বকো, মারো, গাল দাও, টুঁ শব্দটি মুখে নেই, উঁচু কথা কখনো কেউ শোনেনি...

বৈশাখ মাসের প্রথমে সহায়হরির এক দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়ের ঘটকালিতে ক্ষেন্তির বিবাহ হইয়া গেল। দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করিলেও পাত্রটির বয়স চল্লিশের খুব বেশি কোন মতেই হইবে না। তবুও প্রথমে এখানে অন্নপূর্ণা আদৌ ইচ্ছুক ছিলেন না, কিন্তু পাত্রটি সঙ্গতিপন্ন, শহর অঞ্চলে বাড়ি, সিলেট চুন ও ইঁটের ব্যবসায়ে দু'পয়সা নাকি করিয়াছে–এরকম পাত্র হঠাৎ মেলাও বড় দুর্ঘট কিনা!

জামাইয়ের বয়স একটু বেশি, প্রথমে অন্নপূর্ণা জামাইয়ের সম্মুখে বাহির হইতে একটু সংকোচ বোধ করিতেছিলেন, পরে পাছে ক্ষেন্তির মনে কষ্ট হয়, এই জন্য বরণের সময় তিনি ক্ষেন্তির সুপুষ্ট হস্তখানি ধরিয়া জামাইয়ের হাতে তুলিয়া দিলেন–চোখের জলে তাঁহার গলা বন্ধ হইয়া আসিল, কিছু বলিতে পারিলেন না।

বাড়ির বাহির হইয়া আমলকীতলায় বেহারারা সুবিধা করিয়া লইবার জন্য বরের পালকি একবার নামাইল। অন্নপূর্ণা চাহিয়া দেখিলেন, বেড়ার ধারের নীল রং-এর মেদিফুলের গুচ্ছগুলি যেখানে নত হইয়া আছে, ক্ষেন্তির কম দামের বালুচরের রাঙা চেলির আঁচলখানা পালকির বাহির হইয়া সেখানে লুটাইতেছে। ...তাঁর এই অত্যন্ত অগোছালো, নিতান্ত নিরীহ, একটু অধিক মাত্রায় ভোজনপটু মেয়েটিকে পরের ঘরে অপরিচিত মহলে পাঠাইতে তাঁর বুক উদ্বেল হইয়া উঠিতেছিল। ক্ষেন্তিকে কি অপরে ঠিক বুঝিবে?

যাইবার সময় ক্ষেন্তি চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে সান্ত্বনার সুরে বলিয়াছিল–মা, আষাঢ় মাসেই আমাকে এনো... বাবাকে পাঠিয়ে দিও...দুটো মাস তো...

ও পাড়ার ঠানদিদি বলিলেন–তোর বাবা তোর বাড়ি যাবে কেন রে, আগে নাতি হোক–তবে তো...

ক্ষেন্তির মুখ লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল। জলভরা ডাগর চোখের উপর একটুখানি লাজুক হাসির আভা মাখাইয়া সে একগুঁয়েমির সুরে বলিল–না, যাবে না বৈকি? দেখো তো, কেমন না যান্!

ফাল্গুন-চৈত্র মাসের বৈকাল বেলা উঠানের মাচায় রৌদ্রে দেওয়া আমসত্ত্ব তুলিতে তুলিতে অন্নপূর্ণার মন হু-হু করিত... তার অনাচারী লোভী মেয়েটি আজ বাড়িতে নাই যে, কোথা হইতে বেড়াইয়া আসিয়া লজ্জাহীনার মতন হাতখানি পাতিয়া মিনতির সুরে অমনি বলিবে– মা, বলব একটা কথা, ঐ কোণটা ছিড়ে একটুখানি...

এক বছরের উপর হইয়া গিয়াছে। পুনরায় আষাঢ় মাস। বর্ষা বেশ নামিয়াছে। ঘরের দাওয়ায় বসিয়া সহায়হরি প্রতিবেশী বিষ্ণু সরকারের সহিত কথা বলিতেছেন। সহায়হরি তামাক সাজিতে সাজিতে বলিলেন–ও তুমি ধরে রাখো, ও-রকম হবেই দাদা। আমাদের অবস্থার লোকের ওর চেয়ে ভালো কি আর জুটবে?

বিষ্ণু সরকার তালপাতার চাটাইয়ের উপর উবু হইয়া বসিয়া ছিলেন, দূর হইতে দেখিলে মনে হইবার কথা, তিনি রুটি করিবার জন্য ময়দা চটকাইতেছেন। গলা পরিষ্কার করিয়া বলিলেন,–নাঃ, সব তো আর... তা ছাড়া আমি যা দেব নগদই দেব। তোমার মেয়েটির হয়েছিল কি?

সহায়হরি হুঁকাটায় পাঁট-ছটি টান দিয়া কাশিতে কাশিতে বলিলেন–বসন্ত হয়েছিল শুনলাম। ব্যাপার কি দাঁড়াল, বুঝলে? মেয়ে তো কিছুতে পাঠাতে চায় না। আড়াইশো আন্দাজ টাকা বাকি ছিল, বললে, ও টাকা আগে দাও তবে মেয়ে নিয়ে যাও।

–একেবারে চামার...

–তারপর বললাম, টাকাটা ভায়া ক্রমে ক্রমে দিচ্ছি। পুজোর তত্ত্ব কম করেও ত্রিশটে টাকার কমে হবে না ভেবে দেখলাম কি না! মেয়ের নানা নিন্দে ওঠালে... ছোটলোকের মেয়ের মতন চাল, হাভাতে ঘরের মতো খাই খাই...আরও কত কি! পৌষ মাসে দেখতে গেলাম–মেয়েটাকে ফেলে থাকতে পারতাম না, বুঝলে?

সহায়হরি হঠাৎ কথা বন্ধ করিয়া জোরে জোরে মিনিট-কতক ধরিয়া হুঁকায় টান দিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ দুজনের কোন কথা শোনা গেল না।

অল্পক্ষণ পরে বিষ্ণু সরকার বলিলেন–তারপর?

–আমার স্ত্রী অত্যন্ত কান্নাকাটি করাতে পৌষ মাসে দেখতে গেলাম। মেয়েটার যে অবস্থা করেছে! শাশুড়িটা শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে লাগল, না জেনে শুনে ছোটলোকের সঙ্গে কুটুম্বিতে করলেই এ রকম হয়, যেমনি মেয়ে তেমনি বাপ, পৌষ মাসের দিন মেয়ে দেখতে এলেন শুধু হাতে!...পরে বিষ্ণু সরকারের দিকে চাহিয়া বলিলেন–বলি আমরা ছোটলোক কি বড়লোক,

তোমার তো সরকার খুড়ো জানতে বাকি নেই, বলি পরমেশ্বর চাটুজ্যের নামে নীলকুঠীর আমলে এ অঞ্চলে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খেয়েছে–আজই না হয় আমি.. প্রাচীন আভিজত্যের গৌরবে সহায়হরি শুষ্কসুরে হা-হা করিয়া খানিকটা শুষ্ক হাস্য করিলেন।

বিষ্ণু সরকার সমর্থন-সূচক একটা অস্পষ্ট শব্দ করিয়া বারকতক ঘাড় নাড়িলেন।

–তারপর ফাল্গুন মাসেই তার বসন্ত হল। এমন চামার–বসন্ত গায়ে বেরুতেই টালায় আমার এক দূর-সম্পর্কের বোন আছে, একবার কালীঘাটে পুজো দিতে এসে তার খোঁজ পেয়েছিল–তারই ওখানে ফেলে রেখে গেল। আমায় না একটা সংবাদ, না কিছু । তারা আমার সংবাদ দেয়। তা আমি গিয়ে...

–দেখতে পাওনি?

–নাঃ! এমনি চামার–গহনাগুলো অসুখ অবস্থাতেই গা থেকে খুলে নিয়ে তবে টালায় পাঠিয়ে দিয়েছে... যাক, তা চলো, যাওয়া যাক, বেলা গেল। চার কি ঠিক করলে? ....পি'পড়ের টোপে মুড়ির চার তো সুবিধা হবে না।...

তারপর কয়েক মাস কটিয়া গিয়াছে। আজ আবার পৌষ-পার্বণের দিন। এবার পৌষ মাসের শেষাশেষি এত শীত পড়িয়াছে যে অত্যন্ত বৃদ্ধ লোকেরাও বলাবলি করিতেছেন যে, এরূপ শীত তাঁহারা কখনো জ্ঞানে দেখেন নাই।

সন্ধ্যার সময় রান্নাঘরের মধ্যে বসিয়া অন্নপূর্ণা সরুচাকলি পিঠার জন্য চালের গুঁড়ার গোলা তৈয়ারি করিতেছেন। পুঁটি ও রাধী উনানের পাশে বসিয়া আগুন পোহাইতেছে।

রাধী বলিতেছে–আর একটু জল দিতে হবে মা, অত ঘন করে ফেললে কেন?

পুঁটি বলিল–আচ্ছা মা, ওতে একটু নুন দিলে হয় না?

–ওমা দেখ মা, রাধীর দোলাই কোথায় ঝুলেছে, এখুনি ধরে উঠবে...

অন্নপূর্ণা বলিয়া উঠিলেন–সরে এসে বোসো না, আগুনের ঘাড়ে গিয়ে না বসলে কি আগুন পোহানো হয় না? এই দিকে আয়।

গোলা তৈয়ারি হইয়া গেলে খোলা আগুনে চড়াইয়া অন্নপূর্ণা গোলা ঢালিয়া মুচি দিয়া চাপিয়া ধরিলেন...দেখিতে দেখিতে মিঠে-আচেঁ পিঠা টোপরের মতন ফুলিয়া উঠিল।

পুঁটি বলিল–মা দাও, প্রথম পিঠাখানা কানাচে ষাঁড়া-ষষ্ঠীকে ফেলে দিয়ে আসি।

অন্নপূর্ণা বলিলেন–একা যাসনে, রাধীকে নিয়ে যা।

খুব জ্যোৎস্না উঠিয়াছিল, বাড়ির পিছনে ষাঁড়াগাছের ঝোপের মাথায় তেলাকুচো লতার থোলো থোলো সাদা ফুলের মধ্যে জ্যোৎস্না আটকিয়া রহিয়াছে ।...

পুঁটি ও রাধী খিড়কি-দোর খুলিতেই একটা শিয়াল শুকনো পাতায় খস্ খস্ শব্দ করিতে করিতে বন ঝোপের মধ্যে ছুটিয়া পলাইল। পুঁটি পিঠাখানা জোর করিয়া ছুঁড়িয়া ঝোপের মাথায় ফেলিয়া দিল। তাহার পর চারিধারের নির্জন বাঁশবনের নিস্তব্ধতায় ভয় পাইয়া ছেলেমানুষ পিছু হটিয়া আসিয়া খিড়কি-দরজার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়া তাড়াতাড়ি দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

পুঁটি ও রাধী ফিরিয়া আসিলে অন্নপূর্ণা জিজ্ঞাসা করিলেন–দিলি?

পুঁটি বলিল–হ্যাঁ মা, তুমি আর বছর যেখান থেকে নেবুর চারা তুলে এনেছিলে সেখানে ফেলে দিলাম...

তারপর সে রাত্রে অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। পিঠে গড়া প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে... রাতও তখন খুব বেশি। .... জ্যোৎস্নার আলোয় বাড়ির পিছনের বনে অনেকক্ষণ ধরিয়া একটা কাঠঠোকরা পাখি ঠক্-র্-র্-র্ শব্দ করিতেছিল, তাহার স্বরটাও যেন ক্রমে তন্দ্রালু হইয়া পড়িতেছে...দুই বোনের খাইবার জন্য কলার পাতা চিরিতে চিরিতে পুঁটি অন্যমনস্কভাবে হঠাৎ বলিয়া উঠিল–দিদি বড় ভালবাসত...

তিনজনেই খানিকক্ষণ নির্বাক হইয়া বসিয়া রহিল, তাহার পর তাহাদের তিনজনেরই দৃষ্টি কেমন করিয়া আপনা-আপনি উঠানের এক কোণে আবদ্ধ হইয়া পড়িল.... যেখানে বাড়ির সেই লোভী মেয়েটির লোভের স্মৃতি পাতায়-পাতায় শিরায়-শিরায় জড়াইয়া তাহার কত সাধের নিজের হাতে পোঁতা পুঁইগাছটি মাচা জুড়িয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে... বর্ষার জল ও কার্তিক মাসের শিশির লইয়া কচি-কচি সবুজ ডগাগুলি মাচাতে সব ধরে নাই, মাচা হইতে বাহির হইয়া দুলিতেছে... সুপুষ্ট, নধর, প্রবর্ধমান জীবনের লাবণ্যে ভরপুর!...

লেখক-পরিচিতি

কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দের ১২ই সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস ঐ জেলারই ব্যারাকপুর গ্রামে। পিতা মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন সংস্কৃত পণ্ডিত। স্বগ্রামের পাঠশালায় বিভূতিভূষণের পড়াশোনা শুরু হয়। পরে বি. এ. (১৯১৮) পরীক্ষায় ডিসটিংকশনসহ পাস করে এম.এ. ভর্তি হয়েও পাঠ অসমাপ্ত রাখেন। কর্মজীবন আরম্ভ করেন একটি মাইনর স্কুলে শিক্ষকতা দিয়ে, পরে নানা পেশায় যুক্ত হলেও শিক্ষকতা দিয়েই কর্মজীবন শেষ করেন। ১৩২৮ বঙ্গাব্দের (১৯২১) মাঘ সংখ্যা 'প্রবাসী' পত্রিকায় তাঁর প্রথম গল্প 'উপেক্ষিতা' প্রকাশের মধ্য দিয়ে বিভূতিভূষণের সাহিত্যিক জীবন শুরু হয়। ভাগলপুরে চাকরি করার সময় ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'পথের পাঁচালী' রচনা শুরু করেন এবং শেষ করেন ১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দে। এটি ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায়। ছোটগল্প ও উপন্যাস মিলিয়ে তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো: 'অপরাজিত' (১৯৩১), 'মেঘমল্লার' (১৯৩১), 'মৌরীফুল' (১৯৩২), 'যাত্রাবদল' (১৯৩৪), 'চাঁদের পাহাড়' (১৯৩৭), 'কিন্নরদল' (১৯৩৮), 'আরণ্যক' (১৯৩৯), 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' (১৯৪০), ' মরণের ডঙ্কা বাজে' (১৯৪০), 'দেবযান' (১৯৪৪),

'হীরামানিক জ্বলে' (১৯৪৬), 'উৎকর্ণ' (১৯৪৬), 'হে অরণ্য কথা কও' (১৯৪৮), 'ইছামতী' (১৯৫০), 'অশনি সংকেত' (১৯৫৯) ইত্যাদি। 'পথের পাঁচালী' বিভূতিভূষণের শ্রেষ্ঠ রচনা। প্রথম রচিত এই উপন্যাসের মাধ্যমেই তিনি বিপুল খ্যাতি অর্জন করেন। 'অপরাজিত' 'পথের পাঁচালী'রই পরবর্তী অংশ। উভয় গ্রন্থে লেখকের ব্যক্তিগত জীবনের ছায়াপাত ঘটেছে। প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায় 'পথের পাঁচালী'কে চলচ্চিত্রে রূপদানের মাধ্যমে তাঁর পরিচালক জীবন শুরু করেন। নিভৃতচারী এই কথাশিল্পীর রচনায় পল্লির জীবন ও নিসর্গ রূপায়ণে বাংলার আবহমানকালের চালচিত্র ও মানবজীবনের অন্তর্লীন সত্তা প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর রচনায় প্রকৃতি কেবল প্রকৃতিরূপেই আবির্ভূত হয়নি, বরং প্রকৃতি ও মানবজীবন একীভূত হয়ে অভিনব রসমূর্তি ধারণ করেছে। মানুষ যে প্রকৃতিরই সন্তান এ সত্য তাঁর বিভিন্ন রচনায় প্রতিফলিত হয়েছে। প্রকৃতির লতাপাতা, ঘাস, পোকামাকড় সবকিছুই গুরুত্বের সঙ্গে স্ব-ভাবে তাঁর রচনায় স্থান পেয়েছে। প্রকৃতির অনুপুঙ্খ বর্ণনার মধ্য দিয়ে বিভূতিভূষণ গভীর জীবনদৃষ্টিকেও তুলে ধরেছেন। তবে তাঁর রচনায় নিম্ন-মধ্যবিত্ত বাঙালির জীবনচিত্র ও সমকালের আর্থসামাজিক বাস্তবতাও সমভাবে উন্মোচিত হয়েছে। তাই বাংলা কথাসাহিত্যে শরৎচন্দ্রের পরে বিভূতিভূষণই সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় সাহিত্যিকের মর্যাদা পেয়েছেন। সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি বিভূতিভূষণ পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্বও পালন করেন। ১৯৫০ সালের ১লা নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গের ব্যারাকপুরের ঘাটশিলায় তাঁর মৃত্যু হয়।

মূল বক্তব্য

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'পুই মাচা' গল্পে বাল্যবিবাহ ও যৌতুকের অপঘাতে বলি এক গ্রামীণ চঞ্চল বালিকা ও তার পরিবারের ছবি অঙ্কনের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ছোঁয়া বর্ণনায় বাংলার শাশ্বত গ্রামকে ফুটিয়ে তুলেছেন। বাল্যবিবাহের যূপকাষ্ঠ এবং সেই সঙ্গে যৌতুকের নির্দয় কষাঘাত সে সময়ের মানুষদের যে কতোটা ক্লিষ্ট করেছিল, এই গল্পে তা-ই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। নির্দয়-সংসার, অল্পমধুর যাপিতজীবন, সংস্কারবদ্ধ সমাজের রীতিনীতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন সহায়হরি নামের সম্প্রতি দারিদ্র্য পাওয়া এক ব্রাহ্মণ; তার স্ত্রী অন্নপূর্ণা–নামের সঙ্গে যার কর্মের মিল, সত্যি যিনি শাশ্বত বাঙালি মমতাময়ী নারীর প্রতিচ্ছবি, শত দুঃখেও সন্তানের প্রতি যিনি পরম স্নেহশীল; ক্ষেন্তি তাদের বড় কন্যা, যে তের বছরে পড়েছে এবং ভালোমন্দ খাবার গ্রহণে যার রসনা সংবরিত হয় না, সমাজের মানুষ আর পাড়া-প্রতিবেশীরা এই তের বছরের কন্যার বিয়ের ব্যাপারে অতি আগ্রহী; অন্য দুই কন্যা পুঁটি ও রাধা যাদের সংসারে অহংকার–এই পরিপ্রেক্ষিতেই গল্প 'পুঁই মাচা'। অনিচ্ছা সত্ত্বেও সমাজপতিদের চাপে তের বছরেই ক্ষেন্তিকে বিয়ে দিতে হয় অধিক বয়সী দোজবরের সঙ্গে। পণের টাকা পরিশোধ করতে না পারায় কন্যাকে স্বগৃহে এক বছরেও নায়র নিতে পারেনি সহায়হরি। অবশেষে ক্ষেন্তি বসন্ত রোগে আক্রান্ত হলে মুমূর্ষু অবস্থায় তাকে অন্য আত্মীয়ের বাড়িতে রেখে আসে শ্বশুরবাড়ির লোকেরা। সেখানেই অকালমৃত্যু হয় ক্ষেন্তির। কিন্তু যে দুর্বল পুঁইগাছটি কোনো একদিন ক্ষেন্তি পিতার বাড়িতে লাগিয়েছিল, পরে একদা সেই গাছ মাচা ছেয়ে যায়, পুষ্ট লতায় বিকশিত হয়। এই পুঁইগাছটি যেন ক্ষেন্তির প্রতীক। লেখক বোঝাতে চাচ্ছেন, উপযুক্ত পরিবেশের সামান্যটুকু পেলেও ক্ষেন্তির মৃত্যু হতো না, এই পুঁইগাছের মতোই বিকশিত হয়ে উঠতো।

মৌন নয়

শওকত ওসমান

বাসে সমস্ত প্যাসেঞ্জার চুপচাপ বসে আছে।

কিছুক্ষণ আগে যেন অনেক কথা হয়ে গেছে। অনেক অনেক কথা। তারই তর্জনী উঁচোনো উদ্ধত শাসনে সব চুপ। পার্শ্বস্থ দ্রুতচারী গাছপালা থেকে আগত নীড়-সন্ধানী পাখীদের মিষ্টি চীৎকার, শুধু ব্যতিক্রম। অনেক, অনেক কথা ছড়ানো রয়েছে জীর্ণ বাসের কাঠের ফ্রেমে। এখন তাই সবাই স্তব্ধ। বিরহী কান্নায় বুক হাল্কা করে দিয়ে চেয়ে আছে বিষণ্ন দিগন্তের দিকে। আর কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। বাতাসের মর্ম্মর শুধু কাজ করে যাক্? অন্ধকারে গলে পড়া পাতার ধমনীতে। পৃথিবী আর্তনাদ শুনুক। মানুষের মুখ বন্ধ থাক।

অস্পষ্ট আলো জ্বলছে বাসের ভিতরে।

কণ্ডাক্টার ফ্রেমের শিক ধরে দাঁড়িয়ে আছে। প্যাসেঞ্জার ডাকা আজ তার কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য নয়; হাট-হাজারী বায়েজিদ বোস্তান নতুন-পড়া তার মুখ থেকে খইয়ের মত ফুটে বেরোয় অন্যান্য দিন। আজ কণ্ডাক্টারের ছুটী অথবা কোন প্যাসেঞ্জার প্রয়োজন নেই।

বাসের ঝাঁকুনির সঙ্গে সামাল দিয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে পা-দানীর উপর। তারও দৃষ্টি অন্ধকারের দিকে বাসের জানালা ছাড়িয়ে। ওপাশে আকাশের গায়ে সীতাকুণ্ড পাহার-শাখার স্তব্ধ টিলারা কুঁজো হয়ে দৌড়ের বাজি ধরেছে বাসের সঙ্গে। পাশে কালো নিস্তরঙ্গ মেঘের পটভূমি, যার বুক ফুড়ে কোন নিঃসঙ্গ খেজুর কি অন্য কোন বুনো গাছ গোধূলি-হাওয়ায় দোল খাচ্ছে প্রবাহের সঙ্গ নিতে। কণ্ডাক্টারের চোখে ঝাপ্সা আকার-আয়তন শুধু আঁকা হয়, তার কোন বস্তু-নাম থাকে না।

প্যাসেঞ্জার দশ-বারো জন। ড্রাইভারের পাশে একজন। তার মাথায় হ্যাট। কোন অফিসার হওয়া সম্ভব। ঐ মুখ দেখা যায় না অন্ধকারে। ড্রাইভারের সোজাসুজি গরাদের এপারে ঠিক মাঝখানে একজন বৃদ্ধ উপবিষ্ট। বাসের আলোয় তার মুখ স্পষ্ট। সাদা দাড়ী-ঘন চওড়া রেখায়িত মুখ, খাড়া নাক। ঈষৎ কোটর-গত চোখের দু-পাশেও রেখার ভিড়। মাঝে দীর্ঘ নিঃশ্বাস গ্রহণের সময় বৃদ্ধ এক-একবার চোখ খুলছে, তখন কোটরের গভীরতা উবে যায়–দীপ্তির আভাস স্বতঃই প্রকাশ পায়, নামাজ-কালীন তহরীমা বাঁধার মত বুকে দুই হাত বেঁধে সে আছে। অবনত মুখ। দুই গণ্ডদেশের মাঝামাঝি নাক, আলো ছায়ার জাল বুনে রেখেছে। তাই এই মুখ মনে হয় আদিম পাহাড় চূড়ায় খোদাই কোন দরবেশের মূর্ত্তি। পায়ে পিরহান ঝুলে পড়েছে পা-তক। কাঁধে লাল গামছা, পায়ে সাধারণ চটী। বসে আছে সে মৌন। নিঃশ্বাস নিতে তার ফোকলা গালে আরো খাদ সৃষ্টি হয়। আলো-ছায়ার অগোছালো বিকিরণ কোন কঙ্কাল-মুখ সৃষ্টি করে–যার গর্ত্তে গ্রামের দুষ্ট ছেলেরা যেন সাদা শন গুঁজে দিয়েছে জীবন্ত মানুষ তৈরীর লোভে।

সমস্ত প্যাসেঞ্জারের দৃষ্টি প্রায়ই এই বৃদ্ধের উপর নিবদ্ধ। অন্য সময় তারাও বাইরের দিকে চেয়ে থাকে।

বৃদ্ধের দুই পাশে দুইজন চাষী। সম্মুখে বাসের মেঝেয় এক-জোড়া বাশের বজ্‌রা পড়ে আছে। কোন জিনিষ শহরে বিক্রি করতে গিয়েছিল, এখন ফিরে যাচ্ছে হাটের শেষে। এই দুই জনের পরনে লুঙ্গী। ঈষৎ শীতের আমেজ লেপ্‌ আছে বাতাসে, তাই গায়ে গামছা... টানো। তারাও চুপ্‌চাপ। দুই জনে বৃদ্ধের দিকে ঘন-ঘন তাকায়, তারপর মাথা নীচু করে কি যেন ভাবে। আবার জানালার বাহিরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে।

বাম পাশের চাষী এক জন অনেকক্ষণ উস্‌খুস করছিল। তার গলায় অস্বোয়াস্তি। পাকা বিড়ি-খোর সে। কিন্তু বিড়ি ধরাতে সাহস পায় না। কোন পবিত্র আস্তানায় যেন সে বসে আছে, সম্মুখে পীর-পয়গম্বর–এখানে বিড়ি ধরানো বেয়াদবী। এমন ধৃষ্টতা তার মনুষ্যত্বের বাইরে। দেশালাই-বিড়ি বাম হাতে ধরে সে এমন জড় বনে গেছে, যেন পক্ষঘাতগ্রস্ত। বৃদ্ধের দিকে এক-একবার চায় আর মুখ নীচু করে সে।

ড্রাইভারের সোজাসুজি পাশবেঞ্চির উপর একজন তরুণ। হাতে বই দেখে নিঃসন্দেহে বলা যায় ছাত্র। গৌর-বর্ণ মুখে কৈশোরের ছাপ একদম নিঃশেষে মুছে যায় নি। তার কৃশ লম্বাটে মুখাবয়ব পাষাণের মত স্থির। চুপচাপ সে-ও। হাঁটুর উপর হাঁটু তুলে অনড় হয়ে বসে আছে। মাঝে মাঝে পায়ের অস্বোয়াস্তি কাটাতে যখন সে হাঁটু বদলায়, তার পায়জামার নীচে বাদামী জুতোর ঘষ্‌ঘষ্‌ আওয়াজ হয়। কিন্তু এত মৃদু যে, ষ্টিয়ারিং আর ইঞ্জিনের তোড়ে তা থ' পায় না। একটা বাংলা বই খুলে সে একঘেয়েমি ধ্বংসের চেষ্টা পেয়েছিল। কিন্তু চোখ আজ বইয়ের পাতায় শান্তি পায় না। সমতল মাঠ, নতুন অফিস কি কারখানা ঘরের আলো ছাড়িয়ে টিলার ঘন-কালো অন্ধকারই বোধহয় চোখের শ্রেষ্ঠ বিশ্রাম স্থল। কিসের ঝপটা যেন ঐ তরুণের মুখেও র‍্যাঁদা চালিয়ে এবড়ো থেবড়ো অকর্ষিত-জমি-জাত রুক্ষতা লেপে দিয়েছে। দাঁতে দাঁত চেপে, হাতের মুঠি শক্ত করে সে আজ মন-প্রবাহের উজানে গুন টানছে।

ছাত্রটির সোজাসুজি সম্মুখের বেঞ্চির উপর উপবিষ্ট একজন কেরানী ভদ্রলোক। উত্তরমুখী বাসের যাত্রাপথ। সে পশ্চিমদিকে মুখ ফিরিয়ে বসে আছে ঘাড় একটু কাৎ করে। কোন অস্বোয়াস্তি যেন নেই তার এমন আসনে। নিবিড় অন্ধকারেই বরং স্বোয়াস্তি জড়ো হয়েছে। উধাও-গতি বাসের সঙ্গে মনের সমতা রক্ষা অন্ধকার আঁকড়েই সম্ভব। একটু হাত পাও নড়ে না তার। ভদ্রলোকের পাশে আরো কয়েকজন আছে। ছোট বালবের আলো ফিকে, সকলের মুখ দেখা যায় না। কিন্তু নিস্তব্ধতার ছোঁয়াচ তাদেরও রেহাই দেয়নি। ছাত্রের পাশে এমন আরো কয়েকজন। সবাই বোবা। কেউ কাশ্‌ছে না পর্য্যন্ত। মফঃস্বলের উঁচু-নীচু পথে বাসের সফর সুখ-দায়ক নয়, গল্প-গুজবে এই অসুবিধা কিছু কমে। কিন্তু আজ কারো কোন উৎসাহ নেই। একজন জানালার গরাদে মাথা চেপে ধরেছে জোরে। হয়ত মাথা ধরা, অথবা ক্ষোভে জ্বালায় হাত পা ছোঁড়ার অশোভনতা থেকে মুক্তির উপায় স্বরূপ এই পন্থা।

একটা লেভেল ক্রসিং পার হতে বাসের গতি ধিমিয়ে এলো। রেল-লাইনের দু-পাশে খাদ, জোনাকি উড়ছে হাজার হাজার। খেজুর ঝোপ শন-চুল বুড়ির মত বাতাসে উকুন খুঁজছে।

ক্রসিং-এর পর একটু খাড়াই পথ। মটোরের ইঞ্জিন গীয়ার বদলের সাথে কঁকিয়ে উঠল। আবার পুরাতন স্পীড ঝোটিয়ে যাচ্ছে গাছ-পালার সারি, ম্লান, ডিপা-জ্বলা অনিয়মস্তব্ধ চা-খানা, গেরস্থর ঘরবাড়ী, অন্ধকার-লুপ্ত ফসল-শেষ নাড়া-বন। বর্ষা-ক্ষত পথের মধ্যস্থিত ছোট ফাটল পার হতে বাস বেশ ঝাঁকুনি খেয়ে উঠল। আরোহীরা জানালার রেলিং কি বেঞ্চি ধরে তাল সামলে নিল, কোন হৈ-চৈ করল না কেউ–অথচ আনন্দের এমন সুযোগ মফঃস্বলে কে কবে অবহেলা করে? পথের ক্লান্তি হৈ-চৈ দিয়ে ঠাণ্ডা হয়, কো না জানে! আবার সমান পাচ পথ। বাসের গতি সমান। একটু এগিয়ে যেতে এক পাশে ঝুলে পড়া মিন্‌জিরি গাছ বাসের গায়ে ডানা ঝটপট করে গেল। আজ কারো হুঁশ নেই। ড্রাইভারকে হুঁশিয়ারী ছাড়ছে না কেউ আগে থেকে। চোখে ডালপালা লাগতে পারে, এমন আশঙ্কাও নেই। হয়ত আজ কারো চোখ নিজের দিকে নেই। আর কোথাও–কোন রক্তাক্ত রাজপথে, কি কোন শোক-বিধুর গৃহ-প্রাঙ্গণে নির্বাকে থেমে আছে। সমস্ত বাংলা দেশের গাছ-পালা নদী-নালা খাল-বিল ছায়াপথ বন-জঙ্গল পার হয়ে, দূরত্বের ব্যবধান উপেক্ষা করে, বর্বরতার সম্মুখে স্তব্ধ মিছিলের লক্ষ চোখের দৃষ্টির সঙ্গে মিশে গেছে–আজ একক চোখে তাই মনে হয় দৃষ্টি নেই। তাই ত পুরাতন অভ্যাস ভুলে গেছে যাত্রীরা। ড্রাইভারের বাম হাতে একটা হলুদ-পাতা ডালের হোচট লাগল, সে আত্ম-রক্ষায় হাত বাড়াল না, থামল না–যেমন থামল না ঐ তরু শাখা। স্পীড আরো বেড়ে গেল। পাতায় আলিঙ্গন-বদ্ধ অন্ধকারের খিড়কী তুলে নক্ষত্ররা তাকায়। আবার বোবা মাঠের বিস্তার, উপরে খোলা আকাশ, তখন তারারা অনির্বাণ জিজ্ঞাসা-চিহ্নের মত দেখায়। মৌন পূর্ব-বঙ্গ যেন ঐখানে জ্বলে জ্বলে জিজ্ঞাসা করছে: আমার শস্য-শ্যামলা হরিৎ প্রান্তর, তোমাদের এই অন্নাতুর কান্না কেন? তোমাদের ভাষা কোথায়? তোমরা স্তব্ধ কেন?

কেউ জবাব দেয় না! বাসের অভ্যন্তরে সবাই মুক। খট্‌খট ইঞ্জিনের রব শুধু ফুঁসে উঠছে, তারও জবাব দেওয়ার কোন ভাষা জানা নেই।

লোকালয় পার হয়ে এলো যন্ত্র-শকট, এবার দু পাশে বে-বহা মাঠ। একদিকে পাহাড়ের শিরদাঁড়া থমথমে অন্ধকারে ঝাপসা। সমতল জমির উপর গাছপালার ছোট আঁধারের বিচিত্র স্তরবিন্যাস সৃষ্টি করেছে। পাড় ভাঙা শুক্‌নো দীঘি, ঝাউয়ের পাহারা-ঘেরা পল্লী-পথের আত্মগোপনের ফাঁদ হেড-লাইটের সম্মুখে ভেঙে যায়। আবার একাকার সব। টায়ারের নীচে মচ্‌মচ্‌ শব্দ শুধু জানান্‌ দেয়, এখানে বসন্তের হাওয়ায় অনেক পাতা ঝরছে, পাতায় পুরু এই পথ। কাঠের ব্রীজে চাকা ওঠার সময় ঢোলের মত ডুগডুগ শব্দ হয়। এমন গতির মুখে ঝাউমর্ম্মর বন-কলভাষ কোন দাগ কাটতে পারে না কানে। বাস চল্‌ছে চল্‌ছে। পৃথিবীতে এই এক মুহূর্তিক সত্য মাত্র জীবিত।

ছাত্রটীর পাশে উপবিষ্ট কয়েকজনের মধ্যে একটী লোক বিড়ি বের করল। হাতে দেশালাই। অতি সন্তর্পিত–যেন তার কাজ কারো দৃষ্টি আকর্ষণ না করে। বিড়ি ধরাবে ভাবছে সে। একটা দেশালাইয়ের কাঠিও সে বের করল খোল থেকে। সম্মুখের বেঞ্চি থেকে একজন হাত ইশারায় বৃদ্ধের দিকে দৃষ্টি আর্কষণ করে আর মাথা নাড়ে। বিড়ি ধরিয়ো না–তোমার লজ্জা করে না? এমনই ভাব-খানা। নেশাখোরের আর নেশা করা হলো না। শার্টের পকেটে দেশালাই ঢুকল, বিড়ি ঢুকল, দেশালাইয়ের কাঠি একাকী–ঢুকল। সন্তর্পণে ঐ ব্যক্তি আবার যাত্রীদের দিকে চেয়ে দেখে,

কেউ তাকিয়ে নেই ত? শান্ত মুখে ভদ্রলোক অন্ধকারে নিজের দৃষ্টি ডুবিয়ে দিল। দুষ্কৃতি-নিবারণকারী এতক্ষণ সহযাত্রীর দিকে তাকিয়ে ছিল। এখন তারও চোখ জানালার বাইরে।

গোটা দুই বাঁক ফিরতে বাসের স্পীড সামান্য কমল। রাত্রির প্রহর শুধু কমে না। কমে না বাসের ভিতর শুব্ধতার শাসন।

মাঠের সফর শেষ হয়ে গেল। আবার লোকালয় শুরু হয়েছে। দুপাশে ঝিমমারা ঘর বাড়ী, দহলিজ, কলা-বাঁশের বন। হেড-লাইটের আলো তীক্ষ্ণ-ধার এই সড়কে। একদম শীত যায় নি। ফিকে কুয়াশা গাছপালায়। আন্যান্য দিন পার্শ্ববর্তী দোকানে কলরব ওঠে । আজ লোক বসে আছে, কিন্তু গলা-ফাটা চঞ্চলতা নেই।

এই লোকালয়ের পর ছোট মাঠ শেষে, বাসের একজন যাত্রী উসখুস করে কণ্ডাক্টারের দিকে তাকায়। কিন্তু কোন কথা বলে না। হাবে-ভাবে মনে হয়, তার গন্তব্যস্থান নিকটে। কণ্ডাক্টারের চোখে পড়ল একবার। সে একটু উঠে এলে ড্রাইভারের সোজাসুজি। তারপর গরাদের ভেতর হাত গলিয়ে চালকের হাতে একটু টিপ দিল। আর কোন কথা হয় না। বোবার রাজ্যে ঠোঁট থাকা বৃথা ।

পল্লী-পথের মুখ বড় সড়কে এসে মিশেছে। দু-পাশের দুটো মোটা কদম গাছ। আঁকা-বাঁকা ধূলি-ধূসর পথের সর্পিলতা ওই দিকে অন্ধকারে উধাও। ঐ ভদ্রলোক ধীরে ধীরে নেমে গেল। বার বার তার চোখ ঐ মৌন বৃদ্ধের উপর নিবদ্ধ হয়। শেষবারের মত সে দেখে নিল বাসের দরজা থেকে। কণ্ডাক্টার ভাড়া নিয়ে গলায় ঝোলানো ব্যাগে রেখে দিল। আলোর কাছে হাতের তালু চওড়া করে খুচরা পয়সা গোণা আজ নিষ্প্রোয়জন। প্যাসেঞ্জার ঠকিয়ে যেতে পারে? কিন্তু আরো বিরাট ক্ষতির দাগা খেয়েছে সে, তাই এই লোকসান তুচ্ছ। কণ্ডাক্টারের স্বতঃই মনে হয়, আজ তাকে প্রতারিত করে যাওয়ার মত এত শঠ এই এলাকায় নেই।

আবার ধাবমান পথ, চাকা, গ্রাম গ্রামান্তর!

বৃদ্ধ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে একবার চোখ তুলে চাইল। কিন্তু চোখ তখনই বুঁজে যায়। বুঁদ হয়ে আছে সে চিন্তার কড়া ঝাঁঝে। কিন্তু তারপরই সমস্ত বাস-যাত্রীদের মধ্যে স্তব্ধতা বেড়ে গেল। ছাত্রটী কি যেন বলতে গিয়ে থামল। বৃদ্ধের বদ্ধ মুঠি আরো শক্ত হয়ে উঠল। পার্শ্ববর্তী চাষী মাথা নাড়ল নিজের খেয়ালে–কোন আত্ম–কথোপকথনের বুদ্বুদের আঘাতে হয়ত। কেরানী ভদ্রলোকের মুখাবয়ব ঋজু কাঠিন্যে নিথর হয়ে এলো। অন্যান্য যাত্রীদের দৃষ্টি তখন বাসের অভ্যন্তরে। কাণ্ডাক্টার বাসের দরজার দাঁড়িয়েছিল, সে-ও নিঃশব্দে উঠে এলো।

শুধু মোটর বাস নিজের চলা-পথে নির্বিকার। তার অন্ত-আলোড়ন খট্‌খট রবে, দু-পাশের ফেলে–আসা প্রকৃতির সমারোহে শব্দায়িত।

আবার মৌনতার প্লাবন।

পাড়া-গাঁ এখন-ও নিশুত হয়ে যায় নি। পিদিম জ্বলছে উঠানে, ইটের পাঁজা তুলছে পাঁজারীরা খোলা মাঠে। কিন্তু এই সজীবতা বাস-যাত্রীদের ছুঁতে পারে না। এখানে মড়ার রাজ্য। কঙ্কালের

মত সবাই বসে আছে। এত মানুষের নিঃশ্বাস-ও যেন মাথা তুলতে পারছে না নীরবতার বুকে।

চাষীর হাত থেকে দেশালাই খসে পড়ল খড়খড় শব্দে। কিন্তু তা তুলতে গিয়ে নীরবতার পবিত্রতা হানি, তার মনুষত্বে বাঁধে। চাষীটার কণ্ঠনালীর উপরে একটু দোলা লাগল। হয়ত চোয়াল আরো শক্ত করতে বা মুখের 'আব' ঘুচাতে।

আরো দু-মাইল পরে বাসের গন্তব্যস্থান। নির্বিকার যাত্রীদল বসে আছে। কারো কোন উদ্বেগ নেই, তাড়াহুড়া নেই বাড়ী ফেরার। বৃদ্ধের দুই হাত বুকে বাঁধা। সে-ও গন্তব্য-পথের হদিস জানে না। কিন্তু তার নিঃশ্বাস যেন দ্রুততর হচ্ছে। কয়েকজন যাত্রীর দৃষ্টি আবার বাইরে থেকে ঐ মুখের উপর পড়ে।

বৃদ্ধের নিঃশ্বাস আরো দ্রুত, আরো ঘন। যেন ডুবে যাচ্ছে সে। কুঁচকে ঢলে পড়ল, পা একটু সটান, প্রসারিত হোলো তার।

হঠাৎ হাঁপ ছাড়তে গিয়ে বৃদ্ধের কণ্ঠনালী আর স্থির থাকে না। শক্ত কফ জমেছে যেন গলার দু'পাশে। ফোকলা গাল বার-বার ওঠা-নামা করে। ঠোঁট কেঁপে উঠল। অসহ্য কি যেন বুক থেকে ঠেলে-ঠেলে উপরে উঠছে।

চোখের দৃষ্টি অপলক, বৃদ্ধ এইবার ডুকরে আর্তনাদ করে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে চুরমার হয়ে গেল নীরবতার জগদ্দল।

–"কি দোষ করেছিল আমার ছেলে? ওরা কেন তাকে গুলি করে মারল? কি দোষ–কি দোষ করেছিল সে? উঃ–"

কি দোষ করেছিল সে? এই জিজ্ঞাসা চিহ্ন ভাসছে তার চোখের উপর। এখন-ই মুখ থুবড়ে পড়বে বৃদ্ধ বাসের মেঝেয়।

সমস্ত যাত্রী তখন নিজের জায়গা ছেড়ে বৃদ্ধের উপর ঝুকে পড়েছে। চাষী দুজন তার কোমর জড়িয়ে ধরল যেন পড়ে না যায়। ড্রাইভারের এক হাতে ষ্টীয়ারিং, অন্য হাত সে সবার আগেই বৃদ্ধের দিকে এগিয়ে দিয়েছে।

জোড়া-জোড়া জ্বলন্ত চোখের দৃষ্টি-স্ফুলিঙ্গ ঠিকরে পড়ে। দমকে দমকে সিংহ-গর্জন এখনই ফেটে পড়বে। সকলের গলার রগ কেঁপে কেঁপে উঠছে দমকে-দমকে।

নির্বিকার গাড়ী শুধু এগোতে লাগল।

লেখক-পরিচিতি

শওকত ওসমান মূলত কথাসাহিত্যিক। তাঁর প্রকৃত নাম শেখ আজিজুর রহমান; 'শওকত ওসমান' নামে তিনি লিখতেন। ১৯১৭ সালের ২রা জানুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার সবলসিংহপুর গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম শেখ মোহাম্মদ এহিয়া, মাতা গুলজার বেগম। তিনি মাদ্রাসা থেকে প্রবেশিকা (১৯৩৩) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এম. এ. (১৯৪১) পাস করেন। ১৯৫৯ সাল থেকে ঢাকা কলেজে অধ্যাপনা করে ১৯৭২ সালে তিনি স্বেচ্ছায় অবসরে যান। ছোটগল্প ও উপন্যাস রচনা করে তিনি অমর হয়ে আছেন। তার রচিত ছোটগল্পগ্রন্থ হলো: 'জুনু আপা ও অন্যান্য গল্প' (১৯৫২),

'মনিব ও তাহার কুকুর' (১৯৮৬), 'ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী' (১৯৯০), ইত্যাদি। উপন্যাস হলো 'জননী' (১৯৫৬) , 'ক্রীতদাসের হাসি' (১৯৬২), 'সমাগম' (১৯৬৭), 'চৌরসন্ধি' (১৯৬৮), 'রাজা উপাখ্যান' (১৯৭১), 'জাহান্নাম হইতে বিদায়' (১৯৭১), 'দুই সৈনিক' (১৯৭৩), 'নেকড়ে অরণ্য' (১৯৭৩), 'পতঙ্গ পিঞ্জর' (১৯৮৩), 'আর্তনাদ' (১৯৮৫), 'রাজপুরুষ' (১৯৯২) ইত্যাদি। তিনি প্রবন্ধ, নাটক, রম্যরচনা, স্মৃতিকথা ও শিশুতোষ গ্রন্থও রচনা করেন। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রগতিশীল চিন্তা সমন্বিত তাঁর সব রচনা। বাংলাদেশের রাজনৈতিক দুর্যোগের সময় তিনি পথপ্রদর্শক অভিভাবকের ভূমিকা পালন করেছেন। ১৯৯৮ সালের ১৪ই মে ঢাকায় তাঁর মৃত্যু হয়।

মূল বক্তব্য

চলমান বাসে বিভিন্ন পেশা ও বয়সের দীর্ঘযাত্রায় গল্পের পরিপ্রেক্ষিত নির্বাচিত হয়েছে। এ এক প্রতীকী যোজনা। যে বাসের ভেতরে অস্পষ্ট আলো জ্বলে আর বাইরে হাজার হাজার জোনাকি তৈরি করে এক অপার মায়াবী দৃশ্য তা ইঙ্গিতপূর্ণ ও সত্যি অভূতপূর্ব। ১৯৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের স্মরণে প্রকাশিত হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত 'একুশে ফেব্রুয়ারী' (১৯৫৩) সংকলনে অন্তর্ভুক্ত শওকত ওসমানের লেখা ছোটগল্প 'মৌন নয়' মূলত ভাষার সেই অস্ফুট অমিত শক্তিই প্রকাশ করে। মূক থেকেও যে বক্তব্য প্রকাশ করা যায় এবং তা বিভিন্নজনের হৃদয় মথিত করে–বাসের বৃদ্ধ আরোহী তার প্রমাণ। এই বৃদ্ধ আরোহী যাত্রী হয়ে ওঠেন সমস্ত বাঙালির প্রতীক। তাই, 'যাত্রীদের সব চোখ যেন রক্তাক্ত রাজপথে মিশে যায়, শোকবিধুর গৃহপ্রাঙ্গণে থেমে যায়।' এই রক্তাক্ত রাজপথের কল্পনা আর শোক ভাষাশহিদদের জন্য। 'সমস্ত বাংলা দেশের গাছ-পালা নদী-নালা খাল-বিল ছায়াপথ বন-জঙ্গল পার হয়ে, দূরত্বের ব্যবধান উপেক্ষা করে, বর্বরতার সম্মুখে স্তব্ধ মিছিলের লক্ষ চোখের দৃষ্টির সঙ্গে মিশে গেছে–আজ একক চোখে তাই মনে হয় দৃষ্টি নেই।'–এই একটি বাক্যই যেন সমস্ত গল্পের মূল-আবেশ ধারণ করে। গল্পের শেষে শোকে মূকপ্রায় বৃদ্ধ যাত্রী যখন বলে; কি দোষ করেছিল আমার ছেলে? ওরা কেন তাকে গুলি করে মারল? কি দোষ–কি দোষ করেছিল সে? উঃ–এরপর সর্বজনের যে সহানুভূতি ও নীরব প্রতিবাদজ্ঞাপন, এই যৌথচেতনাই 'মৌন নয়' গল্পের মূলে। ১৯৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ওপর লেখা এ এক অনবদ্য ছোটগল্প।

নয়নচারা

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্

ঘনায়মান কালো রাতে জনশূন্য প্রশস্ত রাস্তাটাকে ময়ূরাক্ষী নদী বলে কল্পনা করতে বেশ লাগে। কিন্তু মনের চরে যখন ঘুমের বন্যা আসে, তখন মনে হয় ওটা সত্যিই ময়ূরাক্ষী: রাতের নিস্তব্ধতায় তার কালো স্রোত কল-কল করে, দূরে আঁধারে ঢাকা তীররেখা নজরে পড়ে একটু-একটু, মধ্যজলে ভাসন্ত জেলেডিঙিগুলোর বিন্দু-বিন্দু লালচে আলো ঘন আঁধারেও সর্বংসহা আশার মতো মৃদু-মৃদু জ্বলে ।

তবে, ঘুমের স্রোত সরে গেলে মনের চর শুষ্কতায় হাসে: ময়ূরাক্ষী! কোথায় ময়ূরাক্ষী! এখানে-তো কেমন গরম ঝাপসা হওয়া। যে-হাওয়া নদীর বুক বেয়ে ভেসে আসে সে-হাওয়া কি কখনো অত গরম হতে পারে?

ফুটপাথে ওরা সব এলিয়ে পড়ে রয়েছে। ছড়ানো খড় যেন। কিন্তু দুপুরের দিকে লঙ্গরখানায় দুটি খেতে পেয়েছিল বলে তবু তাদের ঘুম এসেছে–মৃত্যুর মতো নিঃসাড় নিশ্চল ঘুম। তবে আমুর চোখে ঘুম নেই, শুধু কখনো-কখনো কুয়াশা নাবে তন্দ্রার, এবং যদিবা ঘুম এসে থাকে, সে-ঘুম মনে নয়–দেহে: মন তার জেগে রয়েছে চেনা নদীর ধারে, কখনো কল্পনায় কখনো নিশ্চিত বিশ্বাসে, এবং শুনছে তার অবিশ্রান্ত মৃদু কলস্বন, আর দূরে জেলেডিঙিগুলোর পানে চেয়ে ভাবছে। ভাবছে যে এরই মধ্যে হয়তো-বা ডিঙির খোদল ভরে উঠেছে বড়-বড় চকচকে মাছে–যে-চকচকে মাছ আগামীকাল চকচকে পয়সা হয়ে ফিরে ভারি করে তুলবে জেলেদের ট্যাক। আর হয়তো-বা কী–হয়তো-বা?

কিন্তু ভুতনিটা বড় কাশে। খক্কক খক্কক খ খ খ। একবার শুরু হলে আর থামতে চায় না, কেবল কাশে আর কাশে, শুনে মনে হয় দম বন্ধ না হলে ও কাশি আর থামছে না; তবু থামে আশ্চর্যভাবে, তারপর সে হাঁপায়। কাশে, কখনো-বা ঘুমের মধ্যে কেঁদে ওঠে, অথচ ঘুম লেগে থাকে জোঁকের মতো। ভুতনির ভাই ভুতো কাশে না বটে তবে তার গলায় কেমন ঘড়-ঘড় আওয়াজ হয় একটানা, যেন ঘুমের গাড়িতে চেপে স্বপ্ন-ঢাকায় শব্দ তুলে সে কোথায় চলেছে যে চলেছে-ই। তাছাড়া সব শান্ত, নীরবতা পাখা গুটিয়ে নিশ্চল হয়ে রয়েছে, আর জমাট বাঁধা ঘনায়মান কালো রাত্রি পর্বতের মতো দীর্ঘ, বৃহৎ ও দুর্লঙ্ঘ্য।

ভুতনিটা এবার জোর আওয়াজে কেশে উঠল বলে আমুর মনের কুয়াশা কাটলো। সে ভরা চোখে তাকালো ওপরের পানে–তারার পানে, এবং অকস্মাৎ অবাক হয়ে ভাবলো, ওই তারাগুলিই কি সে বাড়ি থেকে চেয়ে-চেয়ে দেখতো? কিন্তু সে-তারাগুলোর নিচে ছিল ঢালা মাঠ, ভাঙা মাটি, ঘাস, শস্য, আর ময়ূরাক্ষী। আর এ-তারাগুলোর নিচে খাদ্য নেই, দয়ামায়া নেই, রয়েছে শুধু হিংসাবিদ্বেষ নিষ্ঠুরতা, অসহ্য বৈরিতা।

কিন্তু তবু ওরা তারা। তাদের ভালো লাগে। আর তাদের পানে চাইলে কী যেন হঠাৎ সমস্ত কিছু

ছাপিয়ে বিপুল বাহু মেলে আসে, আসে–। কিন্তু যা এসেছিল, মুহূর্তে তা সব শূন্য রিক্ত করে দিয়ে গেল। কিছু নেই...। শুধু ঘুম নেই। কিন্তু তাই যেন কোথায় যেতে ইচ্ছে করছে। নদীতে জোয়ার না ভাটা? মনে হচ্ছে ভাটা, এবং এ-ভাটাতে ভেসে যাবার প্রবল ইচ্ছে হচ্ছে তার। সে ভেসে যাবে, যাবে, প্রশস্ত নদী তাকে নিয়ে যাবে ভাসিয়ে, দূরে বহুদূরে–কোথায় গো? যেখানে শান্তি–সেইখানে? কিন্তু সেই শান্তি কী বিস্তৃত বালুচরের শান্তি?

তবে এখানে মানুষের পায়ের আওয়াজ হয়। আর এখানে শহর। মন্থরগতিতে চলা একজোড়া পায়ের আওয়াজ ঘুরে আসছে গলি দিয়ে, এবং নদীর মতো প্রশস্ত এ-রাস্তায় সে যখন এলো তখন আমু বিস্মিত হয়ে দেখলো যে লোকটির মধ্যে শয়তানের চোখ জ্বলছে, আর সে-চোখ হীনতায় ক্ষুদ্রতম ও ক্রোধে রক্তবর্ণ। হয়তো-বা সেটা শয়তানের চোখ নয়, নয়তো শুধুমাত্র একটা বিড়ি। তাহলে অদৃশ্যপ্রায় কালো শয়তানের হাতে বিড়ি, যেটা দুলছে কেবল তার হাতের দোলার সাথে। শয়তানকে দেখে বিস্ময় লাগে, বিস্ময়ে চোখ ঠিকরে যায়, ঘন অন্ধকারে তাতে আগুন ওঠে জ্বলে। তবে শুধু এই বিস্ময়-ই: ভয় করে না একটু-ও : বরঞ্চ সে যেন শয়তানের সাথে মুখোমুখি দেখা করবার জন্যে অপেক্ষমান। তাছাড়া, রাস্তার অপর পাশের বাড়িটার একটি বন্ধ জানালা থেকে যে উজ্জ্বল ও সরু একটা আলোরেখা দীর্ঘ হয়ে রয়েছে, সে-আলোরেখায় যখন গতিরুদ্ধ স্তব্ধতা, তখন শয়তানের হাতে আগুন জ্বলতে দেখলে আরো ক্রোধ হয় মানুষের। আগুনটা দুলছে না তো যেন হাসছে: আমুরা যখন ক্ষুধার যন্ত্রণায় কঁকায়–তখন পথচলতি লোকেরা যেমন আলাদা অপরিচিত দুনিয়ার কোনো অজানা কথা নিয়ে হাসে, এ-ও যেন তেমনি হাসছে। কিন্ত কেন হাসবে? দীর্ঘ-উজ্জ্বল সে-রেখাকে তার ভয় নেই? জানে না সে যে ওটা খোদার দৃষ্টি–অকম্পিত দ্বিধাশূন্য ঋজু দৃষ্টি? তবু আলো-কণা হাসে, হাসে কেবল, পেছনে কালো শয়তান কালো রঙে হাসে। তা হাসুক, আলাদা দুনিয়ায় হাসুক, কারো কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু এ-দুনিয়ায়–যে-দুনিয়ায় ঘর ছেড়ে লোকেরা কালো নদীর ধারে-ধারে পড়ে রয়েছে ভাটির টানে ভেসে যাবে বলে, সে-দুনিয়ায় তাকে সে হাসতে দেবে না–দেবে না।

তবু কালো শয়তান রহস্যময়ভাবে এগিয়ে আসছে, শূন্য ভাসতে-ভাসতে যেন এগিয়ে আসছে ক্রমশ, এসে, কী আশ্চর্য, আলোরেখাটাও পেরিয়ে গেল নির্ভয়ে, এবং গতিরুদ্ধ দীর্ঘৎ সে-রেখা বাধা দিল না তাকে। মৃতগতির পানে চেয়ে নদীর বুকে তারপর নাবলো কুয়াশা: আমুর চোখে পরাজয় ঘুম হয়ে নাবলো। পরাজয় মেনে নেয়াতে-ও যেন শান্তি।

রোদদগ্ধ দিন খরখর করে। আশ্চর্য কিন্তু একটা কথা: শহরের কুকুরের চোখে বৈরিতা নেই। (এখানে মানুষের চোখে, এবং দেশে কুকুরের চোখে বৈরিতা।) তবু ভালো।

ময়রার দোকানে মাছি বোঁ-বোঁ করে। ময়রার চোখে কিন্তু নেই ননী-কোমলতা, সে-চোখময় পাশবিক হিংস্রতা। এত হিংস্রতা যে মনে হয় চারধারে ঘন অন্ধকারের মধ্যে দুটো ভয়ঙ্কর চোখ ধক্‌ধক্ করে জ্বলছে। ওধারে একটা দোকানে যে ক-কাড়ি কলা ঝুলছে, সেদিক পানে চেয়ে তবু চোখ জুড়ায়। ওগুলো কলা নয়তো, যেন হলুদ-রঙা স্বপ্ন ঝুলছে। ঝুলছে দেখে ভয় করে–নিচে কাদায় ছিঁড়ে পড়বে কী হঠাৎ? তবু, শঙ্কা ছাপিয়ে আমুর মন উর্ধ্বপানে মুখ করে কেঁদে ওঠে, কোথায় গো, কোথায় গো নয়নচারা গাঁ?

লালপেড়ে শাড়ি ঝলকাচ্ছে: রক্ত ছুটছে। যেমন করিম মিঞার মুখ দিয়ে সেদিন ফিনকি দিয়ে ছুটেছিলো রক্ত। তবে মেয়েটার গলার নিচেটা শাদা, এত শাদা যে মনটা হঠাৎ স্নেহের ছায়ায় ছুটে গিয়ে উপুড় হয়ে পড়বার জন্যে খাঁ-খাঁ করে ওঠে। মেয়েটি হঠাৎ দুটি পয়সা দিয়ে চলে গেলো রক্ত ঝলকিয়ে। কিন্তু একটা কথা : ও কি ভেবেছে যে তার মাথায় সাজানো চুল তারই? আমু কী জানে না–আসলে ও চুল কার। ও-চুল নয়নচারা গাঁয়ের মেয়ে ঝিরার মাথায় ঘন কালো চুল।

কিন্তু পথে কতো কালো গো। অদ্ভুত চাঞ্চল্যময় অসংখ্য অ-গুণতি মাথা; কোন-সে অজ্ঞাত হাওয়ায় দোলায়িত এ-কালো রঙের সাগর। এমন সে দেখেছে শধু ধানক্ষেতে, হাওয়ায় দোলানো ধানের ক্ষেতের সাথে এর তুলনা করা চলে। তবু তাতে তার এতে কত তফাৎ। মাথা কালো, জমি কালো, মন কালো। আর দেহের সাথে জমির কোন যোগাযোগ নেই, যে-হাওয়ায় তারা চঞ্চল কম্প্রমান, সে-হাওয়াও দিগন্ত থেকে উঠে-আসা সবুজ শস্য কাঁপানো সূক্ষ্ম অন্তরঙ্গ হাওয়া নয়: এ-হাওয়াকে সে চেনে না।

অসহ্য রোদ। গাছ নেই। ছায়া নেই নিচে, কোমল ঘাস নেই। এটা কি রকম কথা: ক্লান্তিতে দেহ ভেঙে আসছে অথচ ছায়া নেই ঘাস নেই। আরো বিরক্তিকর–এ-কথা যে কাউকে বলবে, এমন কোন লোক নেই। এখানে ইটের দেশে-তো কেউ নে-ই, তার দেশের যারা-বা আছে তারাও মন হারিয়েছে, শুধু গোঙানো পেট তাদের হা করে রয়েছে। অন্ধ চোখে চেয়ে।

তবু যাক, ভুতনি আসছে দেখা গেলো। কী রে ভুতনি? ভুতনি উত্তর দিলে না, তার চোখ শুধু ড্যাব-ড্যাব করছে, আর গরম হাওয়ায় জট-পড়া চুল উড়বার চেষ্টা করছে। কিন্তু কী রে ভুতনি? ভুতনি এবার নাক ওপরের দিকে তুলে কম্পমান জিহ্বা দেখিয়ে হঠাৎ কেঁদে ফেললে ভ্যাঁ করে। কেউ দিলো না বুঝি, পেট বুঝি ছিঁড়ে যাচ্ছে? কিন্তু একটা মজা হয়েছে কী জানিস, কোত্থেকে একটা মেয়ে রক্ত ছিটাতে-ছিটাতে এসে আমাকে দুটো পয়সা দিয়ে চলে গেলো, তার মাথায় আমাদের সেই ঝিরার মাথার চুল–তেমনি ঘন, তেমনি কালো...। আর তার গলার নিচেটা–। ভুতনির গলার তলে ময়লা শুকনো কাদার মতো লেগে রয়েছে। থাক সে কথা। কিন্তু তুই কাঁদছিস ভুতনি? ভুতনি, ওরে ভুতনি?

কী একটা বলে ফেলে ভুতনি চোখ মুখ লাল করে কাশতে শুরু করলো। তার ভাই ভুতো মারা গেছে। কোনো নতুন কথা নয়, পুরোনো কথা শুধু আবার বলা হলো। সে মরেছে, ও মরেছে; কে মরেছে বা কে মরছে সেটা কোন প্রশ্ন নয়, আর মরছে মরেছে কথা দু'রঙা দানায় গাঁথা মালা, অথবা রাস্তায় দু'ধারের সারি-সারি বাড়ি–যেবাড়িগুলো অদ্ভুতভাবে অচেনা অপরিচিত, মনে হয় নেই অথচ কেমন আলগোছে অবশ্য রয়েছে।

ভুতনির কান্না কাশির মধ্যে হারিয়ে গেল। কাশি থামলে ভুতনি হঠাৎ বললে, পয়সা? তার পয়সার কথাই যেন শুধোচ্ছে। হ্যাঁ, দুটো পয়সা আমুর কাছে আছে বটে কিন্তু আমু তা দেবে কেন? ভুতনির চোখ কান্নায় প্যাক-প্যাক করছে, আর কিছু-কিছু জ্বলছে। কিন্তু আমু কেন দেবে? ভুতনি আরো কাঁদলো, আগের চেয়ে এবার আরো তীব্রভাবে। তাই দেখে আমুর চোখ জ্বলে উঠলো। চোখ যখন জ্বলে উঠলো তখন দেহ জ্বলতে আর কতক্ষণ: একটা বিদ্রোহ–একটা

ক্ষুরধার অভিমান ধাঁধাঁ করে জ্বলে উঠলো সারা দেহময়। তাতে তবু কেমন যেন প্রতিহিংসার উজ্জ্বলন্ত উপশম।

সন্ধে হয়ে উঠছে। বহু অচেনা পথে ঘুরে-ঘুরে আমু জানলে যে ও-পথগুলো পরের জন্যে, তার জন্যে নয়। রূপকথার দানবের মতো শহরের মানুষরা সায়ন্তন ঘরাভিমুখ-চাঞ্চল্যে থরথর করে কাঁপছে। কোন-সে গুহায় ফিরে যাবার জন্যে তাদের এ-উদগ্র ব্যস্ততা? সে-গুহা কী ক্ষুধার? এবং সে-গুহায় কী স্তূপীকৃত হয়ে রয়েছে মাংসের টিলা, ভাতের পাহাড়, মাছের স্তূপ? কত বৃহৎ সে-গুহা?

অচেনা আকাশের তলে অচেনা সন্ধ্যায় আমুর অন্তরে একটা অচেনা মন ধীরে-ধীরে কথা কয়ে উঠছে। ক্ষীণ তার আওয়াজ, তবু মনে হয় গুহার পানে প্রবাহিত এ-বিপুল জলস্রোতকে ছাপিয়ে উঠছে তা। কী কইছে সে? অস্পষ্ট তার কথা অথচ সে-অস্পষ্টতা অতি উগ্র: মানুষের ভাষা নয়, জন্তুর হিংস্র আর্তনাদ। কী? এই সন্ধ্যা না হয় অচেনা সন্ধ্যা হলো: রূপকথার সন্ধ্যা-ও তো সন্ধ্যা, কিন্তু তবু সন্ধ্যা, আর এ-সন্ধ্যায় তুমি আমাকে নির্মমভাবে কণ্টকাকীর্ণ প্রান্তরে দাঁড় করিয়ে রেখেছো? কে তুমি, তুমি কে? জানো, সারা আকাশ আমি বিষাক্ত রুক্ষ জিহ্বা দিয়ে চাটবো, চেটে-চেটে তেমনি নির্মমভাবে রক্ত ঝরাবো সে-আকাশ দিয়ে–কে তুমি, তুমি কে?

আমুর সমস্ত মন স্তব্ধ, এবং নুয়ে রয়েছে অনুতপ্ত অপরাধীর মতো। সে ক্ষমা চায় : শক্তিশালীর কাছে সে ক্ষমা চায়। যেহেতু শক্তিশালীর অন্যায়ও ন্যায়, সে-ন্যায়ের প্রতি অন্যায় করা গুরুতর পাপ। সে পাপ করেছে, এবং তাই সে ক্ষমা চায়: দুটি ভাত দিয়ে শক্তিশালী তাকে ক্ষমা করুক। চারধারে-তো রাত্রির ঘন অন্ধকার, শক্তিশালীর ক্ষমা করার কথা জানবে না কেউ, শুনবে না কেউ।

ওধারে কুকুরে-কুকুরে কামড়াকামড়ি লেগেছে। মনের এ-পবিত্র সান্ত্বনায় সে-কোলাহলের তীক্ষ্ণ আওয়াজ অসহনীয় মনে হলো বলে হঠাৎ আমু দূর-দূর চেঁচিয়ে উঠলো, তারপর জানলো যে ওরা মানুষ, কুকুর নয়! অথবা ভেতরে কুকুর, বাইরে কুকুর নয়।

কিন্তু আমু মানুষ, ভেতরে-বাইরে মানুষ। সে মাপ চায়। কিছুক্ষণ পর সে হঠাৎ ওঠে পড়লো, তারপর অদ্ভুত দৃষ্টিতে কিসের সন্ধানে যেন তাকালো রাস্তার ক্ষীণ আলো এবং দুপাশের স্বল্পালোকিত জানালাগুলোর পানে। একতলা দোতলা তেতলা–আরো উঁচুতে স্বল্পালোকিত জানালা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে! তুমি কী ওখানে থাক?

তারপর কখন মাথায় ধোঁয়া উড়তে লাগলো। এবং কথাগুলো মাথায় ধোঁয়া হয়ে উড়ছে : উদরের অসহ্য তাপে জমাট কথাগুলো ধোঁয়া হয়ে বাষ্প হয়ে উড়ে যাচ্ছে। আর গলাটা যেন সুড়ঙ্গ। আমু শুনতে পারছে বেশ যে, কেমন একটি অতি ক্ষীণ আওয়াজ সে-গভীর ও ফাঁকা সুড়ঙ্গ বেয়ে পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে উঠে আসছে ওপরের পানে এবং অবশেষে বাইরে যখন মুক্তি পেলো তখন তার আঘাতে অন্ধকারে ঢেউ জাগলো, ঢেউগুলো দু-ধারের খোলা-চোখে–ঘুমন্ত বাড়িগুলোর গায়ে ধাক্কা খেয়ে ফিরে এলো তার কানে । মা-গো, চাট্টি খেতে দাও–

এই পথ, ওই পথ: এখানে পথের শেষ নেই। এখানে ঘরে পৌছানো যায় না। ঘর দেখা

গেলে-ও কিছুতেই পৌছানো যাবে না সেখানে। ময়রার দোকানে আলো জ্বলে, কারা খেতে আসে, কারা খায়, আর পয়সা ঝনঝন করে: কিন্তু এধারে কাঁচ। কাঁচের এপাশে মাছি, আর পথ আর আমু। তবু দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। কিন্তু ভেতর থেকে কে একটি লোক বাজের মতো খাঁইখাঁই করে তেড়ে এলো। আরে, লোকটি অন্ধ নাকি? মনে-মনে আমু হঠাৎ হাসলো একচোট, অন্ধ না হলে অমন করবে কেন? দেখতে পেতো না যে সে মানুষ?

পথে নেবে আমু ভাবলে, একবার সে শুনেছিলো শহরের লোকেরা অন্ধ হলে নাকি শোভার জন্যে নকল চোখ পরে। দোকানের লোকটি অন্ধ-ই, আর তার চোখে সে-নকল চোখ। কিছু একটা আওয়াজ শুনে হয়তো ভেবেছে বাইরে কুকুর, তাই তেড়ে উঠেছিলো অমন করে। কিন্তু সে-কথা যাক, আশ্চর্য হতে হয় কাণ্ড দেখে, নকল চোখে আর আসল চোখে তফাৎ নেই কিছু।

তারপর মাথায় আবার ধোঁয়া উড়তে লাগলো। ময়ূরাক্ষীর তীরে কুয়াশা নেবেছে। স্তব্ধ দুপুর : শান্ত নদী। দূরে একটি নৌকায় খরতাল ঝনঝন করছে, আর এধারে শ্মশানঘাটে মৃতদেহ পুড়ছে। ভয় নেই। মৃত্যু কোথায়? মৃত্যুকে সে-পেরিয়ে এসেছে, আর অলিগলি দিয়ে ঘুরে মৃত্যুহীনতার উন্মুক্ত সদর রাস্তায় সে এসে পড়েছে।

কড়া একটা গন্ধ নাকে লাগছে। কী কোলাহল। লোকেরা আসছে, যাচ্ছে। হোটেল। দাঁড়াবে কি এখানে? দাঁড়ালেও দাঁড়াতে পারে, তবে নকল-চোখ-পরা কোন অন্ধ-তো নেই এখানে, আওয়াজ পেয়ে তেড়ে আসবে না-তো খাঁইখাঁই করে? কিন্তু গন্ধটা চমৎকার । তারপর বোশেখ মাসে শূন্য আকাশ হঠাৎ যেমন মেঘে ছেয়ে যায়, তেমনি দেখতে না দেখতে একটা ভীষণ কালো ক্রোধে তার ভেতরটা করাল হয়ে উঠলো, আর কাঁপতে থাকলো সে থরথর করে: সিঁড়ির ধারে একটা প্রতিবাদী ভঙ্গিতে সে রইলো দাঁড়িয়ে। অবশেষে ভেতর থেকে কে চেঁচিয়ে উঠলো, আরেকজন দ্রুত পায়ে এল এগিয়ে, এসে হীন ভাষায় কর্কশ গলায় তাকে গালাগাল দিয়ে উঠলো। এইজন্যেই আমু প্রস্তুত হয়ে ছিলো। হঠাৎ সে ক্ষিপ্তের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লো তার ওপর, এবং তারপর চকিতেঘটিত বহু ঝড়-ঝাপ্টার পর দেহে অসহ্য বেদনা নিয়ে আবার যখন সে পথ ধরলো, তখন হঠাৎ কেমন হয়ে একবার ভাবলে: যে-লোকটা তাড়া করে এসেছিলো সে-ও যদি ময়রার দোকানের লোকটার মতো অন্ধ হয়ে থাকে? হয়তো সে-ও অন্ধ, তার ও-চোখ নকল। শহরে এত-এত লোক কি অন্ধ? বিচিত্র জায়গা এই শহর।

চাঞ্চল্যকর ঘটনাটির পর উত্তেজিত মাথা ঠাণ্ডা হতে সময় নিলো। এবং সে উত্তেজনার মধ্যে কোন রাস্তা হতে কোন কোন রাস্তায় ঘুরে-ঘুরে হঠাৎ এক সময়ে সে থমকে দাঁড়ালো, দাঁড়িয়ে ভাবলো : যে-পথের শেষ নেই, সে-পথে চলে লাভ নেই, বরঞ্চ ওই যে ওখানে কে কঁকাচ্ছে সেখানে গিয়ে দেখা যাক কী হয়েছে তার। ফুটপাথের ধারে গ্যাসপোস্ট, তার তলে আবছা অন্ধকারে কে একটা লোক শুয়ে রয়েছে, আর পেটে হাত চেপে দুরন্ত বেদনায় গোঙাচ্ছে। তার একটু তফাতে যে কটা লোক উবু হয়ে বসে রয়েছে তাদের মুখে কোন সাড়া নেই, শুধু তারা নিঃশব্দে ধুঁকছে। আমু কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো, তারপর আপন মনে থমকে ভাবলো, ওদের সঙ্গে তার চেনা নেই, ওদের বেদনার সঙ্গে তার পরিচয় নেই, সে কেন যাবে তাদের কাছে। যাবে না। তারপর কেমন একটা চাপা ভয়ে সে যেন ভাঙা পা নিয়ে পালিয়ে চললো। কী যে সে-ভয় সে-কথা সে স্পষ্ট বলতে পারবে না, এবং সে-কথা জানবারও কোন

তাগিদ নেই, শুধু যে কেমন একটা ভয় কালো ছায়াচ্ছন্ন করে তুলেছে তার সারা অন্তর, সে ভয় হতে মুক্তি পাবার জন্যে সে পালিয়ে যাবে সে-রাস্তা দিয়েই, যে-রাস্তার কোন শেষ নেই। যে-ছায়া ঘনিয়েছে মনে, তারও কী শেষ নেই? আর, সে-ছায়া কী মৃত্যুর?

অনেকক্ষণ পর তার খেয়াল হলো যে একটা বদ্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে, আর তার গলার সুড়ঙ্গ দিয়ে একটা আর্তনাদ বেয়ে-বেয়ে উঠছে ওপরের পানে, এবং যখন সে-আর্তনাদ শূন্যতায় মুক্তি পেলো, রাত্রির বিপুল অন্ধকারে মুক্তি পেলো, অত্যন্ত বীভৎস ও ভয়ঙ্কর শোনাল তা। এ কী তার গলা—তার আর্তনাদ? সে কী উন্মাদ হয়ে উঠেছে? অথবা কোন দানো, কী ভর নিয়েছে তার মধ্যে? তবু, তার মনের প্রশ্নকে উপেক্ষা করে সুড়ঙ্গের মতো গলা বেয়ে তীক্ষ্ণ তীব্র বীভৎস আর্তনাদের পর আর্তনাদ বেরিয়ে আসতে লাগলো, আর সে থরথর করে কাঁপতে লাগলো আপাদমস্তক। অবশেষে দরজার প্রাণ কাঁপলো, কে একটা মেয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে এলো, এসে অতি আস্তে-আস্তে অতি শান্তগলায় শুধু বললে : নাও।

কী? কী সে নেবে? ভাত নেবে। ভাতই কী সে চায়? সে ভাতই চায় : এ-দুনিয়ায় চাইবার হয়তো আরো অনেক কিছু আছে, কিন্তু তাদের নাম সে জানে না। এস্তভঙ্গিতে ময়লা কাপড়ের প্রান্ত মেলে ধরে সে ভাতটুকু নিলে, নিয়ে মুখ তুলে কয়েক মুহূর্ত নিষ্পলক চোখে চেয়ে রইলো মেয়েটির পানে। মনে হচ্ছে যেন চেনা-চেনা। না হলে সে চোখ ফেরাতে পারবে না কেন।

—নয়নচারা গাঁয়ে কী মায়ের বাড়ি?

মেয়েটি কোন উত্তর দিলে না। শুধু একটু বিস্ময় নিয়ে কয়েক মুহূর্ত তার পানে চেয়ে থেকে দরজা বন্ধ করে দিলে।

লেখক-পরিচিতি

কথাসাহিত্যিক ও নাট্যকার সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ১৯২২ সালের ১৫ই আগস্ট চট্টগ্রামের ষোলশহরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা সৈয়দ আহমদউল্লাহ ছিলেন সরকারি কর্মকর্তা। এ কারণে পূর্ব বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে পিতার কর্মস্থলে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র শৈশব, কৈশোর ও যৌবন অতিবাহিত হয়। এর ফলে এ অঞ্চলের মানুষের জীবনকে নানাভাবে তাঁর দেখার সুযোগ ঘটে, যা তাঁর উপন্যাস ও নাটকের চরিত্র-নির্মাণ ও জীবন-অন্বেষণে প্রভূত সাহায্য করে। তিনি কুড়িগ্রাম হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক (১৯৩৯) পাস করেন। পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে ভর্তি হলেও শেষ পর্যন্ত লেখাপড়া শেষ করেননি। তাঁর প্রথম গল্প 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি' ঢাকা কলেজ ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়। তিনি ঢাকা বেতার কেন্দ্রের সহকারী বার্তা-সম্পাদক ও পরে করাচি কেন্দ্রের বার্তা-সম্পাদক ছিলেন। ১৯৬০-৬৭ সাল পর্যন্ত তিনি প্যারিসে পাকিস্তান দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারি এবং ১৯৬৭-'৭১ সাল পর্যন্ত ইউনেস্কোর প্রোগ্রাম স্পেশালিস্ট ছিলেন। তিনি ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রচারকার্য চালান। ১৯৪৭ সালের বিভাগোত্তর পূর্ববঙ্গের লেখক-বুদ্ধিজীবীরা রাজনৈতিক আলোড়নে যখন নানাভাবে আলোড়িত, তখন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ বাংলার গ্রাম ও সমাজ-জীবনের এক ধ্রুপদী জীবনধারাকে 'লালসালু' উপন্যাসে রূপদান করেন। তিনি এতে বাংলার লোকায়ত সংস্কার ও ধর্মাচরণের নেপথ্যে তথাকথিত ধর্মধ্বজাধারী ও ভণ্ড

ধর্মব্যবসায়ীদের স্বরূপ গভীর জীবনবোধ ও মমত্বের সঙ্গে প্রকাশ করেন। 'লালসালু' (১৯৪৮) তাঁর রচিত প্রথম উপন্যাস, যেখানে তিনি ধর্মের নামে শোষণের চিত্র তুলে ধরেন। তাঁর অন্য দুটি উপন্যাস 'চাঁদের অমাবস্যা' (১৯৬৪) ও 'কাঁদো নদী কাঁদো' (১৯৬৮) বাংলা সাহিত্যে দুটি ব্যতিক্রমধর্মী সৃষ্টি। তিনি এ দুটি উপন্যাসে 'চেতনাপ্রবাহ রীতি' ও 'অস্তিত্ববাদ'-এর ধারণাকে অসাধারণ রূপক ও শিল্পকুশলতায় মূর্ত করে তুলেছেন। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র দুটি উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থের নাম 'নয়নচারা' (১৯৫১), 'দুই তীর ও অন্যান্য গল্প' (১৯৬৫) এবং তিনটি নাট্যগ্রন্থের নাম 'বহিপীর' (১৯৬০), 'তরঙ্গভঙ্গ' (১৯৬৪) ও 'সুড়ঙ্গ' (১৯৬৪)। ছোটগল্প ও নাটকেও তিনি সমাজের কুসংস্কার, ধর্মীয় ভণ্ডামি, মানসিক ও চারিত্রিক স্খলন ইত্যাদিকে তুলে ধরেছেন। তাঁর বেশ কিছু ইংরেজি রচনা রয়েছে। ১৯৭১ সালের ১০ই অক্টোবর প্যারিসে তাঁর মৃত্যু হয়।

মূল বক্তব্য

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-র প্রথম গল্প 'নয়নচারা' প্রকাশিত হয় 'পূর্বাশা' পত্রিকায়। সে-সময় (১৯৪৩-'৪৫) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও পঞ্চাশের মন্বন্তরের কালো ছায়া সারা বাংলা জুড়ে। যুদ্ধ অনাহার ও মৃত্যুর পটভূমিকায় লেখা 'নয়নচারা' তাঁর প্রথম ছোটগল্প। নয়নচারা একটি গ্রামের নাম। এই গ্রামনাম দিয়ে লেখা 'নয়নচারা' গল্প। লেখক এখানে দুর্ভিক্ষের করুণ চিত্র অঙ্কন করার সঙ্গে সঙ্গে ধসে পড়া মানবতার চিত্রও উন্মোচন করেছেন। মানুষকে তিনি এ গল্পে যেন প্রায় কুকুরই বলেছেন এবং মানুষের হৃদয়হীনতার, নিষ্ঠুরতার, নির্মমতার ভেতরগত ভয়ঙ্কর চেহারা টেনে বের করেছেন। 'নয়নচারা' ছোটগল্পে ওয়ালীউল্লাহ্ শিল্পীর তীক্ষ্ণ চোখ ব্যবহার ও অনুসন্ধানী সামাজিক মানবিক দৃষ্টিক্ষেপ করেছেন। বলার চেষ্টা করেছেন, দুর্ভিক্ষ এমনি এমনি প্রাকৃতিকভাবে আসেনি, এসেছে মুনাফাখোর, অপরাজনীতিবিদদের কারণে। দুর্ভিক্ষের করাল মুহূর্তেও সামাজিক শ্রেণিভেদ লোপ পায় না। দুর্ভিক্ষের তোড়ে আমুর মতো দরিদ্র, নিঃস্ব মানুষেরাই ছিন্নমূল হয়ে শহরের ফুটপাতে আশ্রয় নেয়। লেখক তাদের তুলনা করেছেন ছড়ানো খড়ের সঙ্গে, দেখিয়েছেন দুর্ভিক্ষ মানুষকে ছিন্নমূল করে, উদ্বাস্ত করে, স্বপ্নময়, বসতভিটা থেকে, সবুজ গ্রাম থেকে, আবাল্য পরিচিত নদী থেকে, কোমল স্বপ্ন থেকে বিচ্ছিন্ন করে আর মানুষের মতো শ্রেষ্ঠ জীবকে কুকুরের পর্যায়ে নামিয়ে নিয়ে আসে। তখন মানুষের ভেতরে আর মানবিক বৃত্তি থাকে না। ক্ষুধার্ত আমু যখন বলে, 'এই সন্ধ্যা না হয় অচেনা সন্ধ্যা হলো: রূপকথার সন্ধ্যাও তো সন্ধ্যা, কিন্তু তবু সন্ধ্যা, আর এ সন্ধ্যায় তুমি আমাকে নির্মমভাবে কণ্টকাকীর্ণ প্রান্তরে দাঁড় করিয়ে রেখেছো? কে তুমি? তুমি কে? জানো, সারা আকাশ আমি বিষাক্ত রুক্ষ জিহ্বা দিয়ে চাটবো, চেটে চেটে তেমনি নির্মমভাবে রক্ত ঝরাবো সে আকাশ দিয়ে কে তুমি, তুমি কে? 'তখন বুঝতে হবে, দুর্ভিক্ষই আমুর ভেতরে আজন্ম লালিত অলৌকিক চেতনার বিরুদ্ধে খড়্গ করে তুলেছে। আমু আবার বলে, 'দুটি ভাত দিয়ে শক্তিশালী তাকে ক্ষমা করুক। চার ধারে তো রাত্রির ঘন অন্ধকার, শক্তিশালীর ক্ষমা করার কথা জানবে না কেউ, শুনবে না কেউ।' মহান তাত্ত্বিক যখন বলেন, 'ভাত কাপড়ের দাবি আগে।' তখন পৃথিবীর সেরা বাক্য বলেই মনে হয়। ক্ষুধার্ত মানুষ কাল্পনিক শক্তির মালিককেও তার ফরিয়াদ থেকে রেহাই দেয় না। আসলে 'নয়নচারা' গল্পে এক সংবেদশীল ও অন্তর্মনস্ক শিল্পীসত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। সে শিল্পীসত্তা গড়ে উঠেছিল যুগ-চৈতন্যের সংক্ষুব্ধ সমাজবাস্তবতার মর্মমূল থেকে।

একাত্তরের দিনগুলি

জাহানারা ইমাম

২৮ মার্চ রবিবার ১৯৭১

গত রাতেও ঘুমাতে পারি নি। সন্ধ্যা থেকে শুরু হয়ে গোলাগুলি চলেছে প্রায় ভোর পর্যন্ত ।

কাল বিকেলেই কারেন্ট এসেছে, কিন্তু ফোন এখনো খারাপ। কারেন্ট না এসে যদি ফোনটা ঠিক হত, তাহলে বেশি স্বস্তি পেতাম। শরীফকে বললাম, 'আজ যে করেই হোক, ফোনটা ঠিক করাতেই হবে। তোমার বন্ধু লোকমানকে বল না।'

শরীফ বিরক্ত হয়ে বলল, 'তুমি কি পাগল হলে? মিলিটারী যেখানে সারা ঢাকায় সব ফোন কেটে দিয়েছে, সেখানে তোমার একটা ফোন সারবে কোন ম্যাজিকে?'

৮টায় কারফিউ উঠতেই কাসেম, বারেক দু'জনকেই পাঠালাম–যে করেই হোক, যত টাকা কবুল করেই হোক, মেথর একটা ধরে আনতেই হবে।

জামী ধরে বসেছে কাল সে বাসায় ছিল, অতএব আজ তাকে বাইরে যেতে দিতেই হবে।
বললাম, 'ঠিক আছে, যাবি। তবে একা নয়। রুমীর সঙ্গে।'
রুমী প্রতিবাদ করে উঠল, 'আমার অন্য কাজ আছে।'

আমি রেগে রুমীকে কিছু বলতে গেলাম, তার আগেই কলিং বেল বেজে উঠল। জামী খুলে দিতেই কিটি উদ্‌ভ্রান্তের মত এসে ঢুকল। তার সঙ্গের মিঃ চাইল্ডার দরজার বাইরে বারান্দাতেই দাঁড়িয়ে রইল।

'কিটি!' বলে আমি এগিয়ে যেতেই সে ছুটে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরল। ধরেই রইল প্রায় দু'মিনিট, আর ছাড়ে না। তার বুকে যেন ঢেঁকির পাড় পড়ছে, আমি টের পাচ্ছি। একটু পরে জলেভরা চোখ তুলে কিটি অস্ফুট স্বরে বলল, 'তোমরা কেমন আছ, দেখবার জন্য এসেছি।'

তিন মিনিটে শরীফ, রুমী, জামী–সকলের কুশল নিয়ে কিটি তক্ষুনি আবার মিঃ চাইল্ডারের সঙ্গে গাড়ীতে উঠে চলে গেল।

একটু পরে মিনিভাই এলেন গুলশান থেকে। তাঁর কাছে জানা গেল শেখ মুজিব বেঁচে আছেন, তাঁকে গ্রেপ্তার করে 'আননোন ডেস্টিনেশানে' নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আওয়ামী লীগ নেতারা, ছাত্র নেতারা, প্রায় সকলেই পালিয়ে যেতে পেরেছেন।

শরীফ বলল, 'চলুন ঢাকা ক্লাব ঘুরে আসি একবার।'
রুমী বলে উঠল, 'আব্বু, আমি গাড়ীটা নিয়ে যাই একটু।'
আমি বললাম, 'আজ কিন্তু ১২টায় কারফিউ শুরু, মনে থাকে যেন।'

'কেন? কাল তো বিকেল ৪টে পর্যন্ত খোলা ছিল?'
'বোধ করি, গতকাল লোকজনের অত চলাফেরা দেখে আর্মী আজ সময় কমিয়ে দিয়েছে।'
জামী বলল, 'আব্বু, আমি তোমার সঙ্গে ঢাকা ক্লাবে যাই?'

মিনিভাইয়ের গাড়ীতে শরীফ আর জামী ঢাকা ক্লাবে গেল। আমি রুমীকে বললাম, 'আমাকে পাঁচ মিনিটের জন্য একবার হাসপাতাল ঘুরিয়ে এনে দিয়ে তারপরে তুই তোর কাজে যাস। ইমন আর শেলীর জন্য একটু খাবার দিয়ে আসব।'

হাঁড়িপানা মুখ করে রুমী আমাকে নিয়ে হাসপাতালের দিকে রওনা হল। বললাম, 'শহীদ মিনারের সামনের রাস্তা ধরে যাবি। ফেরার পথে বাঙলা একাডেমির সামনে দিয়ে আসবি। একডেমীর দেয়াল নাকি গোলার ঘায়ে ভেঙ্গে গেছে। আর রেসকোর্সের কালী বাড়ীও নাকি নেই?'

শহীদ মিনারের সামনের রাস্তায় এসে রুমী গাড়ির গতি কমিয়ে চালাতে লাগল। ডাইনে তাকিয়ে দেখলাম, গতকাল শহীদ মিনারের যে ভাঙ্গা উর্ধ্বাংশ দেখেছিলাম, আজ সেটাও নেই। গতরাতের তান্ডবে সব অদৃশ্য হয়ে শুধু গোড়া তিনটে রয়েছে। ওগুলো আর ওপড়াতে পারিনি। একটু জোরেই বলে উঠলাম, 'শহীদ মিনার। তোমার এই অপমানের প্রতিশোধ নেবই নেব।'

রুমীর চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল। সে ঠোঁটে ঠোঁট টিপে শহীদ মিনার পেরিয়ে হাসপাতালের গেটে ঢুকে গেল।

রুমী এলিফ্যান্ট রোডে গলির মুখে আমাকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল। গেটের কাছাকাছি আসতে দেখা হল হোসেন সাহেবের সঙ্গে। উনি চিন্তিত মুখে বললেন, 'শুনলাম পাড়ায় কোন্ বাড়ীতে কতো জোয়ান ছেলে আছে, তার লিস্ট হবে।'

শুনে চমকে গেলাম। মনে পড়ল, মেইন রোডের উত্তর দিকের একটা গলিতে কয়েকটা অবাঙালী ছেলে থাকে, যাদের সঙ্গে কয়েক মাস আগে রুমীর ঝগড়া হয়েছিল। ওদের দৌলতে লিস্টে রুমী-জামীর নাম নিশ্চয় প্রথমে বসবে।

বাড়ী ঢুকে রেডিয়ো খুলে রেখে অসহায়ের মত বসে রইলাম। শরীফ বা রুমী না ফেরা পর্যন্ত করার কিছু নেই।

হঠাৎ জানালা দিয়ে কি যেন ঝপ করে মেঝেয় পড়ল। চমকে দেখি খবরের কাগজ। দৌড়ে জানালার কাছে গিয়ে ডাক দিলাম, 'বদরুদ্দিন, বদরুদ্দিন, তুমি বেঁচে আছ?'

বদরুদ্দিন সে-ই ১৯৫৬ সাল থেকে আজিমপুরের বাসায় থাকার সময় থেকে আমাদের কাগজ দেয়। বদরুদ্দিন রোগা মুখে করুণ হেসে বলল, 'আল্লাহ রহমত আর আপনাদের দোয়া।'

'আর কোন কাগজ বেরোয় নি?'
'না, এইটাই।'
'যেদিন যতগুলো কাগজ বেরোবে, সব দিয়ে যাবে, কেমন?'

'আচ্ছা।' বলে বদরুদ্দিন চলে গেল। কাগজ পড়ার উত্তেজনায় বদরুদ্দিনকে জিজ্ঞেস করতে

ভুলে গেলাম এ কয়দিন তার কেমন কেটেছে।

২৫ তারিখ রাতের মহা-মারণ-যজ্ঞের পর এই প্রথম কাগজ বেরোল–পাকিস্তান অবজারভার। দুই পাতা মাত্র। আট কলাম জুড়ে দুই ইঞ্চি চাওড়া হেডলাইন: ইয়াহিয়া ব্রডকাস্টস। ইয়াহিয়ার বেতার ভাষণ। ইয়াহিয়ার ২৬ তারিখ সন্ধ্যায় বেতার বক্তৃতার পুরো বিবরণ। তার নীচে বাকী পাতা জুড়ে মার্শাল ল অর্ডারসমূহের নম্বর ধরে ধরে বিবরণ। একপাশে ছোট্ট হেডিংয়ে খবর। মুজিব অ্যারেস্টেড–মুজিব গ্রেপ্তার।

সকালে রেডিয়োতে ঘোষণা করা হয়েছিল ৮-১২টা কারফিউ থাকবে না। অথচ এখন পৌনে বারোটায় সেটা বাড়িয়ে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত করা হয়। এতে আমাদের সুবিধেই হয়েছে। রুমী জামীকে মিনিভাইয়ের বাসায় দিয়ে আসা সম্ভব হবে। মিনিভাই বলেছেন গুলশানের বাড়ীগুলো তুলনামূলকভাবে নিরাপদ।

জামী ঢাকা ক্লাব থেকে ফিরেছে খুব বিচলিত হয়ে। ঢাকা ক্লাবেও আর্মী ঢুকেছিল, কয়েকজন বেয়ারার লাশ আজ সকাল পর্যন্তও পড়েছিল। জামীর জীবনের বোধ হয় এই প্রথম এরকম ফুলে পচে ওঠা দু'তিনটে লাশ এভাবে দেখা। ভালই হল, গুলশানে টাটুর সঙ্গে থাকলে ও সামলে উঠতে পারবে।

দুপুরে খেয়েই রুমী জামীকে নিয়ে গুলশান চললাম আমি ও শরীফ। রাস্তাঘাট গতকালের তুলনায় বেশ নির্জন। ১২টা কারফিউ শুরু হবে, সেটা সকালেই জেনে লোকজন সেইভাবে বাড়ী দৌড়েছে। শেষ মুহূর্তে সময় বাড়ালেও জনশূন্য রাস্তাঘাট আর ভরে ওঠেনি।

রুমী জামীকে গুলশানে রেখে ফেরার পথে আজিমপুরে গেলাম একরাম ভাই লিলিবুর বাসায়।

৯ এপ্রিল শুক্রবার ১৯৭১

কারফিউয়ের মেয়াদ ধীরে ধীরে কমছে। ৫ তারিখে ৬টা-৬টা ছিল। ৬ তারিখ থেকে ৭.৩০-৫টা দিয়েছিল। গতকাল থেকে আরো কমিয়ে ৯টা-৫টা করেছে।

বদিউজ্জামানরা সবাই মা'র বাড়ীর একতলা থেকে চলে গেছে নিজ নিজ বাসায়।

রফিকরা ওয়াহিদের বাসা সরে থেকে মা'র বাড়ীর একতলায় এসে উঠেছে। ৩নং রোডে ওয়াহিদের বাসার কাছাকাছি মিলিটারীদের চলাফেরা খুব বেড়ে গেছে, কি একটা চেক-পোস্ট না কি যেন হয়েছে। মা'র বাড়ী ছ'নং রোডের ভেতরে বলে কিছুটা নিরিবিলি।

কপাল ভালো, আগের দিনই অজিত নিয়োগী চলে গেছেন। ওঁর কিছু বন্ধু প্রথমে আমাদের বাসায় এসে খোঁজ করেন। তারপর মা'র বাসা থেকে খুব সাবধানে ওঁকে গাড়ীর ভেতরে চাদর মুড়ি দিয়ে বসিয়ে অন্যত্র নিয়ে গেছেন। শুনলাম, গ্রামের বাড়ীতে যাবেন। যেখানেই যান, ভালো থাকুন।

২৫ মার্চ কালরাত্রির পর কয়েকটা দিন রুমী একেবার থম ধরে ছিল। টেপা ঠোঁট, শক্ত চোয়াল উদ্‌ভ্রান্ত চোখের দৃষ্টিতে ভেতরের প্রচণ্ড আক্ষেপ যেন জমাট বেঁধে থাকত। এখন একটু সহজ

হয়েছে। কথাবার্তা বলে, মন্তব্য করে, রাগ করে, তর্ক করে। বন্ধুদের বাড়ী দৌড়োদৌড়ি করে, নানা রকম খবর নিয়ে আছে।

আজ বলল, 'জান আম্মা, বর্ডার এলাকাগুলোতে না যুদ্ধ হচ্ছে।'
শুনেই চমকে গেলাম, 'যাঃ তা কি করে হবে? সবখানে তো মেরে ধরে পুড়িয়ে শেষ করে দিচ্ছে।'

'তা হয়তো দিচ্ছে। ২৫শে রাত থেকে যেখানে যেখানে প্রতিরোধ গড়ে উঠেছিল, পাকিস্তানীরা সেসব জায়গা আবার দখল করে নিচ্ছে–এটাও সত্যি। কিন্তু সেগুলো তারা এমনি এমনি দখল করতে পারছে না। সেসব জায়গায় তুমুল যুদ্ধ হচ্ছে। বহু জায়গায় বাঙালী আর্মী অফিসাররা রিভোল্ট করেছে। তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে ইপিআর, ইবিআর, পুলিশ, আনসারের লোকজন। ঢাকা থেকে বহু ছেলে-ছোকরা বর্ডারের দিকে লুকিয়ে চলে যাচ্ছে যুদ্ধ করবে বলে। পাক আর্মী যেসব থানা, গ্রাম, মহকুমা জ্বালিয়ে দিয়েছে, সেখানকার লোকজনেরাও বর্ডারের দিকে পালিয়ে যাচ্ছে যুদ্ধ করতে।'

'পালাচ্ছে ঠিকই। তবে যুদ্ধ করতে কি? ওরা তো সব পালিয়ে ভারতে আশ্রয় নিচ্ছে।'
'তা নিচ্ছে ঠিকই। কিন্তু আম্মা, যুদ্ধও হচ্ছে।'
'তুই এত কথা কোথায়, কার কাছে শুনিস?'
'সবখানে–সবার কাছে। আমার বন্ধুদের অনেকের আত্মীয়স্বজন মফস্বল থেকে ঢাকায় আসছে। তাদের কাছে।'
বিশ্বাস হতে চায় না। হায়রে, আমার কোনো আত্মীয় যদি এমনি মফস্বল থেকে আসত, তাহলে তার মুখে শুনে বিশ্বাস হত।
রুমী বলল, 'আমার জানাশোনা অনেক ছেলে বাড়ীতে না-বলে লুকিয়ে চলে গেছে।'
আমি অবিশ্বাসের সুরে বললাম, 'কই, কারা গেছে, নাম বলতো।'
'কেন, বাবুভাই আর চিংকুভাই।'
আমি আবার চমকালাম, 'ওরা? ওরা তো চাটগাঁ গেল।'
রুমী হাসল, 'আসলে ওরা যুদ্ধেই গেছে।'
'কোথায় যুদ্ধ হচ্ছে?'
'তাতো ঠিক করে কেউ বলতে পারছে না। ওরা খোঁজ করতে করতে যাবে।'
আমি স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম। কি রকম ভালো মানুষের মত মুখ করে ওয়াহিদ এই তো কয়েকদিন আগে বলে গেল, মার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে চাটগাঁর গ্রামের বাড়ীতে। চিংকুও যাচ্ছে তার সঙ্গে। চিংকুর ফুফা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। ও ফুফার বাড়ী বেড়াতে যাচ্ছে।
রুমী খুব আস্তে আস্তে কিন্তু দৃঢ় গলায় বলল, 'আম্মা। আমি যুদ্ধে যেতে চাই।'

কি সর্বনেশে কথা। রুমী যুদ্ধে যেতে চায়! কিন্তু যুদ্ধটা কোথায়? কেউ তো ঠিক করে বলতে পারছে না। সবখানে শুধু জল্লাদের নৃশংস হত্যার উল্লাস–হাত-বাঁধা, চোখ-বাঁধা অসহায় নিরীহ জনগণের ওপর হায়েনাদের ঝাঁপিয়ে পড়ার নিষ্ঠুর মত্ততা। যুদ্ধ হচ্ছে–এ কথা ধরে নিলেও তা এতই অসম যুদ্ধ সে কয়েকদিনের মধ্যেই পাকিস্তানী সৈন্যরা তাদের আধুনিকতম মারণাস্ত্র দিয়ে

বিদ্রোহী বাঙালীদের গুঁড়িয়ে মাটিতে মিশিয়ে দেবে। সবখান থেকে তো সেই খবরই শুনতে পাচ্ছি। এই রকম অবস্থায় রুমীকে যুদ্ধে যেতে দিই কি বলে? মাত্র বিশ বছর বয়স রুমীর। কেবল আইইসসিএ পাস করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকেছে। ও যুদ্ধের কি বোঝে? ও কি-যুদ্ধ করবে?

৬ মে বৃহস্পতিবার ১৯৭১

রুমী আগমীকাল রওনা হবে। এর প্যান্টের কোমরের কাছে ভেতর দিকের মুড়ির সেলাই খুলে সেখানে কয়েকটা একশো টাকার নোট লম্বালম্বি ভাঁজ করে রেখে আবার মুড়ি সেলাই করে দিলাম। পকেট ওয়ালেটে শ'দুয়েকের বেশী রাখবে না, কারণ পথে খান সেনারা হাতিয়ে নিতে পারে।

কাপড় জামা রাখার জন্য রুমী সঙ্গে নিচ্ছে একটা ছোট আকারের এয়ার ব্যাগ। তাতে দু'সেট কাটা কাপড়, তোয়ালে, সাবান, স্যান্ডেল আর দু'টো বই–'জীবনানন্দের শ্রেষ্ঠ কবিতা' ও 'সুকান্ত সমগ্র।'

যে বন্ধু দু'জনের সঙ্গে যাবে–তাদের নাম অবশেষে বলেছে রুমী–মবু আর শিরাত। সেই সঙ্গে এটাও বলেছে যে, নাম দুটো কাল্পনিক।

রাতে শোবার সময় রুমী বলল, 'আম্মা আজকে একটু বেশী সময় মাথা বিলি করে দিতে হবে কিন্তু।'

জামী বলল, 'মা, আজ আর আমার মাথা বিলি করার দরকার নেই। 'ওই সময়টাও তুমি ভাইয়াকেই দাও।'

ছোট বয়স থেকে ঘুমোবার সময় দু'ভায়ের মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দিতে হয়। মাঝে মাঝে এ নিয়ে দু'ভায়ে ঝগড়াঝাটিও বাঁধে। রুমী বলে, 'আম্মা তুমি জামীর কাছে বেশীক্ষণ থাকছ।' জামী বলল, 'মা তুমি ভাইয়ার মাথা বেশী সময় বিলি দিচ্ছ।'

আমি রুমীর মাথার চুলে বিলি কেটে দিতে লাগলাম, রুমী 'একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি' গানটার সুরে আস্তে আস্তে শিস দিতে লাগল।

৭ মে শুক্রবার ১৯৭১

সকালে নাশতা খাওয়ার সময় রুমী বলল, 'আম্মা, আমাকে সেক্রেটারিয়েট সেকেন্ড গেটের সামনে নামিয়ে দিয়ো। জামী, তুই এয়ার ব্যাগটা আগেই গাড়ীতে রেখে আয়। পায়ের কাছে রাখবি, যেন দেখা না যায়।'

নাশতা খেয়ে রুমী তার দাদার পাশে বসে তাঁর হাতটা ধরল। বাবা চোখে দেখেন না, তাই যে-ই আসুক, আগে তার হাত ধ'রে। হাত ধরতেই বাবা আস্তে বললেন, 'কে?'

'আমি রুমী, দাদা।'

খানিক একথা সেকথার পর রুমী বলল, 'দাদা, আমি দিনকতকের জন্য বাইরে যাচ্ছি–এক্সকারসনে।'

'এক্সকারসনে? কি–তোমাদের কলেজ থেকে?'

'ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ তো বন্ধ। ঠিক কলেজ থেকে নয়–তবে কলেজেরই কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে–মানে, বাড়ী বসে বসে একেবারে ঘেঁতিয়ে গেছি–কোন কাজকর্ম তো নেই–তাই–'

বাবা খানিকক্ষণ চুপ করে থাকলেন, তারপর তাঁর স্বভাবসিদ্ধ মৃদু গলায় থেমে থেমে বললেন, 'এক্সকারসন খুব ভালো জিনিস। আমাদের সময়ও হত–তবে ছুটির সময়। তা সাবধানে থেক, এখন তো সব জায়গায় খুব গোলমাল শুনি।'

'না দাদা, গোলমাল আর নেই। সব জায়গা এখন তো শান্ত–'
'শান্ত? জামীদের স্কুল তাহলে এখনও বন্ধ কেন? তোমার কলেজ খোলে না কেন?'

বাবাকে নিয়ে এই এক সমস্যা। চোখে না দেখলে কি হবে, চিন্তা ও ধারণাশক্তি এখনও টনটনে। সব কিছু জানতে চান, একটু কোথাও উনিশ-বিশ হলেই উত্তেজিত হয়ে পড়েন, ব্লাডপ্রেসার ধাই করে চড়ে যায়। সেই জন্য ওঁকে সবকিছু খবর বেশ ভালো মত সেন্সার করে বলতে হয়। তবে বাবার একটা পরিমিতিবোধ জন্মে গেছে। আগে যেমন অনেক ব্যাপারে বিধিনিষেধ আরোপ করতেন, এখন আর তা করেন না। সবই মেনে নেন।

ক'দিন থেকেই মাঝে-মাঝে বিকেলে ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে। লেট কালবৈশাখী। আজ আবার সকাল থেকেই আকাশে মেঘ। ইয়া আল্লা, আজ যেন ঝড়বৃষ্টি না আসে।

জামীকে পাশে বসিয়ে আমি স্টিয়ারিং হুইল ধরলাম। ড্রাইভারকে গতকালই বলে দেয়া হয়েছে, আজ তাকে লাগবে না। পেছনে শরীফ আর রুমী বসল। শরীফের হাতে খবরের কাগজ। খুলে পড়ার ভান করছে।

রুমী বলল, 'সেকেন্ড গেটের সামনে আমি নেমে যাওয়া মাত্র তোমারা চলে যাবে। পেছন ফিরে তাকাবে না।'

তাই করলাম। ইগলু আইসক্রীমের দোকানের সামনে গাড়ী থামালাম। রুমী আধাভর্তি পাতলা ছোট এয়ারব্যাগটা কাঁধে ফেলে নেমে সামনের দিকে হেঁটে চলে গেল। যেন একটা কলেজের ছেলে বই খাতা নিয়ে পড়তে যাচ্ছে। আমি হুস্ করে এগিয়ে যেতে যেতে রিয়ারভিউ-এর আয়নায় চোখ রেখে রুমীকে এক-নজর দেখার চেষ্টা করলাম। দেখতে পেলাম না, সে ফুটপাতের চলমান জনস্রোতের মধ্যে মিশে গেছে।

৯ মে রবিবার ১৯৭১

একটা লোহার সাঁড়াশী যেন পাঁজরের দুই পাশ চেপে ধরে আছে। মাঝে মাঝে নিঃশ্বাস আটকে আসে। মাঝে মাঝে চোখ ঝাপসা হয়ে ওঠে। মাঝে মাঝে সব কাজ ফেলে ডুকরে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে করে। কিন্তু মাছের মাকে নাকি শোক করতে নেই। চোরের মাকে নাকি ডাগর গলায় কথা বলতে হয়। রুমী যাবার পর উঁচু ভল্যুমে ক্যাসেট বাজানো হয় প্রায় সারাদিনই। সন্ধ্যে হলেই সারা বাড়ীতে সব ঘরে বাতি জ্বেলে জোরে টিভি ছেড়ে রাখা হয়। অর্থাৎ বাড়ীতে বেশ একটা উৎসব উৎসব পরিবেশ। বেশ গান বাজনা, হৈ-চৈ, কলকোলাহল। আশেপাশের কোন বাড়ির কেউ যেন সন্দেহ না করে যে এ বাড়ীর লোকগুলোর বুক খাঁ খা করছে, ব্যথায় কলিজেয় টান ধরছে।

আকাশের বুকেও অনেক ব্যথা। তার কিন্তু আমার মতো চেপে রাখার দায় নেই। তাই সেও ক'দিন থেকে মাঝে মাঝে অঝোরে ঝরাচ্ছে। না জানি রুমীদের কি কষ্ট হচ্ছে এই বৃষ্টিতে।

জামীও আবদার ধরেছিল সে রুমীর সঙ্গে যাবে। তাকে অনেক করে বুঝিয়েছি, দু'ভাই একসঙ্গে গেলে পাড়ার লোকে সন্দেহ করবে। সবচেয়ে বড় কথা বাবাকে কি কৈফিয়ত দেব? ওঁকে তো কিছুতেই বলা চলবে না মুক্তিযুদ্ধের কথা। তাহলে উদ্বেগে, উত্তেজনায় ব্লাড প্রেসার বেড়ে স্ট্রোক হয়ে যাবে। তাছাড়া আমিই বা থাকব কি করে?

লেখক-পরিচিতি

জাহানারা ইমাম ১৯২৯ সালের ৩রা মে পশ্চিমবঙ্গের মুরশিদাবাদ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সৈয়দ আবদুল আলী, আর মা সৈয়দা হামিদা বেগম। বিয়ের আগে পিতা, পরে পুরকৌশলী স্বামী শরীফ ইমামের উৎসাহ ও আনুকূল্য পেয়ে তিনি আধুনিক শিক্ষাগ্রহণ করেন। ১৯৪৫ সালে কলকাতার লেডি ব্রেবোর্ন কলেজ থেকে তিনি বি. এ. পাস। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এম.এ. করেন। ফুলব্রাইট স্কলার জাহানারা ইমাম আমেরিকা থেকে উচ্চশিক্ষা নিয়ে ১৯৬৬ সালে ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। বিশ শতকের ষাট ও সত্তর দশকে সাহিত্যজগতে জাহানারা ইমাম অল্প-বিস্তর পরিচিত ছিলেন শিশুকিশোর উপযোগী রচনার জন্য। কিন্তু তাঁর সর্বাধিক খ্যাতির কারণ দিনপঞ্জিরূপে লেখা অনবদ্য গ্রন্থ 'একাত্তরের দিনগুলি' (১৯৮৬)। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালে তিনি পুত্র রুমী ও স্বামীকে হারান। মুক্তিযুদ্ধের দীর্ঘ নয় মাস কেটেছে তাঁর একদিকে উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ও ত্রাসের মধ্য দিয়ে; অন্যদিকে মনের মধ্যে ছিল দেশপ্রেম ও স্বাধীনতার স্বপ্ন। সেই দুঃসহ দিনগুলিতে প্রাত্যহিক ঘটনা এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করার বৃত্তান্ত লিখেছিলেন তিনি নানা চিরকুটে, ছিন্ন পাতায়, গোপন ভঙ্গি ও সংকেতে। ১৯৮৬ সালে গ্রন্থরূপ পাওয়ার পর তা জনমনে বিপুল সাড়া জাগায়। বস্তুত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক একটি শিহরণমূলক ও মর্মস্পর্শী ঘটনাবৃত্তান্ত হলো 'একাত্তরের দিনগুলি।' গল্প, উপন্যাস ও দিনপঞ্জি জাতীয় রচনা মিলিয়ে জাহানারা ইমামের আরও কয়েকটি গ্রন্থ রয়েছে। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: 'অন্য জীবন' (১৯৮৫), 'বীরশ্রেষ্ঠ' (১৯৮৫), 'জীবন মৃত্যু' (১৯৮৮), 'চিরায়ত সাহিত্য' (১৯৮৯), 'বুকের ভিতরে আগুন' (১৯৯০), 'নাটকের অবসান' (১৯৯০), 'দুই মেরু' (১৯৯০), 'নিঃসঙ্গ পাইন' (১৯৯০), 'নয় এ মধুর খেলা' (১৯৯০), 'ক্যানসারের সঙ্গে বসবাস' (১৯৯১) ও 'প্রবাসের দিনলিপি' (১৯৯২)। ১৯৯৪ সালের ২৬শে জুন আমেরিকার মিশিগান স্টেটের ডেট্রয়েটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর জীবনাবসান ঘটে।

মূল বক্তব্য

জাহানারা ইমাম রচিত গ্রন্থ 'একাত্তরের দিনগুলি' থেকে নির্বাচিত ১৯৭১ সালের ২৮শে মার্চ, ৯ই এপ্রিল, ৬ই মে, ৭ই মে, ৯ই মে-তে লেখা অংশটুকুতে কিভাবে একজন তরুণ মুক্তিযুদ্ধে গেল তার বর্ণনা আছে। ১৯৭১ সালের ১লা মার্চ থেকে পূর্ব-পাকিস্তানের রাজনীতিতে দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে থাকায় উল্লেখ আছে ২৮শে মার্চ তারিখের ডায়েরিতে। ২৬শে মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা দেবার পর বঙ্গবন্ধুকে যে অজ্ঞাত স্থানে পাকিস্তানিরা নিয়ে গিয়েছিল সে সম্পর্কিত জন-উৎকণ্ঠা এখানে প্রকাশিত। চারদিকে যুদ্ধের প্রস্তুতি ও চোরাগোপ্তা লড়াইয়ের

সংবাদ তরুণদের দারুণভাবে আকৃষ্ট করেছে। শিক্ষিত ও অভিজাত ঘরের তরুণেরাও এই যুদ্ধে যাবার জন্য ভেতরে ভেতরে প্রস্তুতি নেয়। একথা মাতা-পিতা জানার পর স্নেহময়ী মাতার মানসিক বাস্তব প্রতিক্রিয়া এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। অবশেষে মাতা-পিতার সম্মতিতে মেধাবী তরুণপুত্রের মুক্তিযুদ্ধে গমনের পূর্বরাত্র, যুদ্ধে গমনের দিন মাতা-পিতার পথ-এগিয়ে দেয়া, সন্তান যুদ্ধে যাবার পর সে পরিবারের বেঁচে থাকার কথা আছে পরে লিখিত ডায়েরির পৃষ্ঠায়। দেশের জন্য জীবনদানে আগ্রহী রুমী নামের এক তরুণের পাশাপাশি তার ভাইয়েরও মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের ইচ্ছের কথা আছে এখানে। প্রকৃতপক্ষে চয়নকৃত ডায়েরির অংশে এই বক্তব্যই প্রকাশিত যে, মুক্তিযুদ্ধ ছিল বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে, এখানে অশংগ্রহণ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত, এই অংশগ্রহণে পরিবারসমেত বিভিন্নভাবে মানুষ অংশ নিয়েছে। যারা সশস্ত্র লড়াই করেনি, তাদেরও ছিল নানা মাত্রায় অংশগ্রহণ।

খাঁচা

হাসান আজিজুল হক

সিঁড়ির কাছে হাঁফ এসে ধরল। বড্ডো ঠাণ্ডা। কোণাভাঙ্গা আর সাঁতলা-পড়া। বড্ডো পিছল। অধঃপাতের পথের মতো। সেখানে এসে ভাবল, যেতে পারছি না। তখন শিশিরের শব্দ। আর সেতার বেজে উঠল। গ্যাঁও গ্যাঁও আওয়াজ অন্ধকারকে ধরে মুচড়ে দিলে কেউ যেন ব্যথায় কঁকালো। কই আলো আনো–কি করছো ছাই– আলো আনো না–ভারি অন্ধকার যে! সেতার থেমে গেলে চিৎকার। আবার চিৎকার, আলো আনো।

অম্বুজাক্ষ বসে আছে সেতার কোলে। আমাকে খেপিও না এইভাবে। সরোজিনী উঠে এলে হারিকেনের আলো তাকে দেখে বিশ্রী হাসল। খোঁচা খোঁচা দাড়ি, কপালে ল্যাপটানো শণের মতো হালকা চুল। দেয়াল ফাটিয়ে যে অশথ গাছটা উঠেছে তার কালো ছায়া পাগলের মতো মাথা নাড়তে লাগল।

বসো–নিজের পাশে মাদুরে বসার জন্য অম্বুজাক্ষ সাদরে আহ্বান করে।
না–কাজ আছে।
একটু বসো। কাজের কথাই আছে তোমার সঙ্গে। একটু বসো।
ছাদে বসে কাজের কথার ঢং ছাড়ো। কথা থাকে নিচে চলো।
তুমি ভাবছ তোমাকে বাইজি ভাবছি আমি তাই না?
হারিকেনের আলোয় সরোজিনীর শিরা-ওঠা শীর্ণ হাত তর্জন করে।
আমি এখন যাব।
কটা পান দিয়ে যাবে?
পান নেই বাড়িতে।
দোকান থেকে আনিয়ে দাও না–মাতালের ভঙ্গিতে সরোজিনীর কোমর জড়িয়ে ধরে অম্বুজাক্ষ।

তখন উগরে দেয়। সরোজিনী গলগল করে উগরে দেয়। দ্যাখো কতো বিষ আমার! অতি তিক্ত অতি কঠিন গলায় সে বলে, ছাড়ো। ছাড়ো আমাকে।

সরোজিনীর সামনের বাঁদিকের একটা দাঁত পড়ে গেছে। কথা বলতে গেলেই দুর্গন্ধ থুথু বেরিয়ে আসে। অম্বুজাক্ষ তাকে তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিল।

পান আনিয়ে দাও না কটা দোকান থেকে–আবার বলল সে।
পয়সা নেই। আনবার লোক নেই কেউ এখন।
সূর্য কোথায়?
সে বাড়ি আসবে রাত বারোটার পর।
তুমি কি যাত্রা দলের ঘোষক–এ্যাঁ!

একথার জবাবে হারিকেন রেখে সরোজিনী উঠালো। যেয়ো না, সরোজিনী যেয়ো না–তোমাকে আমার ভারি দরকার–এখুনি–সেতারে আকুল হয়ে এই কথাগুলো বাজালো অম্বুজাক্ষ। সরোজিনী সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল। কাজেই বিকৃত হেসে অম্বুজাক্ষ সেতারে আলাপ চালাতে থাকে। শিশিরের শব্দ কানে আসে না, হাওয়া না থাকায় আলাপের বুকভাঙা শব্দ ছাদেই ঘুরতে থাকে ভূতের মতো–তারপর সিঁড়ির ফাঁক পেয়ে সেদিক দিয়ে নামে, নির্জন বারান্দা ধরে ঘুমন্ত পায়রাদের ওপর দিয়ে শূন্য ঘরগুলোতে গিয়ে ঢোকে।

এইভাবে আজকাল সেতার বাজাচ্ছে অম্বুজাক্ষ। বিশ বছর পর। অবশ্য বিশ বছর আগে অম্বুজাক্ষের হাতে সেতার বড়ো খুশি হয়ে বেজে উঠত। তারপর বন্ধ হয়ে গেল। অম্বুজাক্ষ হোমিওপ্যাথি ধরার পর। হোমিওপ্যাথি কঠিন জিনিস। মনোযোগের ব্যাপার। কিন্তু হোমিওপ্যাথি হোক আর এ্যালোপ্যাথি হোক আজকাল কেউ পয়সা দিতে চায় না। রোগ সেরে গেলে দুটো টাকা দিতে পারে। ক'সের চাল দিয়ে যেতে পারে। কিছু শাকসবজি তরিতরকারি বাড়িতে পৌঁছে দিতে পারে। কাজেই রোগ সেরে যেতে পারে–টাইফয়েড নিউমোনিয়া যক্ষ্মা ইত্যাদির মতো নির্দয় রোগ না হোক–নিদেনপক্ষে পেটের অসুখ, সর্দি, গা-গরম ইত্যাদি সারানোর মতো হোমিওপ্যাথি জানতে গেলে সেতার চলে না। থেলো হুঁকো হাতে বুড়ো বাপ এসে জিগগেস করেছিল বাজনাটা ছেঁড়ে দিলি? ও বাজনায় পাগল সেরে যায়–বেশ লাগত সন্ধ্যেটা। ছেড়ে দিলি একেবারে? তখনঅম্বুজাক্ষকে শুনিয়ে দিতে হয়, উপায় কি বলো? জমিজমা শেষ, তোমারও আর কিছু করার শক্তি নেই. একপাল ছেলেমেয়ে। সংসারটা না দেখলে চলবে কেন?

শেষে হোমিওপ্যাথি?
আর কি করি?
একটা স্কুল–মানে একটা টোলের মতো করলে হয় না? আমাদের কুলবিদ্যা, বংশগত বৃত্তি!

অম্বুজাক্ষ বাপের দিকে চায়। হাতে থেলো হুঁকো, গায়ে ময়লা মোটা পৈতে, ঘোলা চোখ।

কি পেয়েছ জীবনে ? কিছু পেয়েছ? খড়ম পায়ে চক্কোবত্তিগিরি করেছ। আর তো চলবে না, এখন পাকিস্তান হয়ে গেল, দেশ ভাগ হয়ে গেল, এখন কি হবে?

অতএব সেতার পশ্চিমের অন্ধকার ঘরে সহায়হীন হয়ে ঝুলে থাকে। অম্বুজাক্ষ বাধক, তড়কা, অজীর্ণ, আমাশা থেকে শুরু করে পিত্তচাঞ্চল্য এবং বায়ুকোপ পর্যন্ত যাবতীয় বঙ্গীয় রোগবিশারদ হয়ে যায়।

কিছু কি হচ্ছে? বাবা একেবারে ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে।

অম্বুজাক্ষ খুচরো গুনছিল বাজিয়ে বাজিয়ে। ভ্রূ কুঁচকে তাকায়। ঠিক যেন চিনতে পারে না একটু সময়। তারপর অন্যমনস্কের মতো বলে, এই আর কি! এই যেমন ধরো, বাবা–অম্বুজাক্ষ কথা শেষ করে না অথচ তার মাথার মধ্যে কথা চলে, যেমন ধরো কেউ দিলে না–ধরো ছেলের পিলে বেরিয়ে এসেছে–কিন্তু বাপ তার নিজের পিলের উপর ছেলেকে বসিয়ে নিয়ে এসেছে–এই অবস্থায়, হ্যাঁ, জমির শেখের কথাই বলি আমি–এই অবস্থায় কার চিকিৎসা করা উচিত আগে আমি বুঝতে পারি না বাবা।

আর পেটের পিলে থেকে কিভাবে টাকা বেরুতে পারে বলতে পারো! কিংবা পদ্মপিসীর কথা

ধরো–দুটো কুসী দিলে, বাবা মাজ্জনা করে দে, আর পারিনে, যমে নেয় না। এই রকম অবস্থা বাবা, বুঝলে? এই রকম। থেলো হুঁকো যেন ফেটে যাবে–কালীপ্রসন্ন চড়াৎ চড়াৎ টানে–দম বন্ধ করে কাশে। হিরণ, (অম্বুজাক্ষের ডাকনাম) অম্বু, আমার মানিক, বুড়ো হয়ে যাচ্ছিস। আমি চিনি না ওকে। ও চেনে না আমাকে। বাবা, এই বয়েসে তোর কষ্ট মুছে দিতে চাই। প্রয়োজনে মরে গিয়ে। মরে গিয়েও।

খুচরো কতক্ষণ গোনা যায়। অম্বুজাক্ষ তাকায়। রোদের মধ্যে বাবা হেঁটে যাচ্ছে খড়মের আওয়াজ তুলে। কার্নিশে কাক ডাকছে। বাবা ফিরে এসো। অম্বুজাক্ষ ইচ্ছে করে। কালীপ্রসন্ন ফিরে এসে অম্বুজাক্ষের হাৎপিণ্ড ধরে মুচড়ে দেয় কসাই-এর মতো।

হিরণ, বাবা দুআনা পয়সা দিবি? তবে অসুবিধে হলে থাক।
কি করবে?
দাড়িটা কামিয়ে আসতাম। হাত কাঁপে, নিজে ক্ষুর ধরতে পারি না।
অম্বুজাক্ষ পয়সা দুআনা ছুঁড়ে দেয়, যাও যাও।
খড়ম করুণ হয়ে বাজে। ফিরে যায়। মহাদ্যুতিমান সূর্য প্রহার করে। সকালে যে সর্বপাপঘ্নকে ডাকাডাকি করেছিল কালীপ্রসন্ন, সে।
কে যায়? অম্বুজাক্ষ হেঁকে ওঠে।
অরুণ।
শুনে যাও।
কেউ আসে না শুনতে।
কই, অরুণ শুনে যা।
দূরে থেকে সে বলে, পরে শুনবো। জরুরি কাজে বেরুচ্ছি একটু।

এই সময় অরুণের মা সরোজিনী আসে। তার কাছে অরুণের ব্যবহারের অভিযোগ করলে সে উকিলের মতো জেরা শুরু করে, কি দরকার ওকে। অম্বুজাক্ষ কোন দরকারের কথা মনে করতে পারে না। সে কিছুই মনে করতে পারে না। কোন দরকারের কথাই তার মনে আসে না।

ওদিকটায় পাহাড় আছে, তাই না? দুহাতে মাটির ওপর ভর করে সরোজিনী অম্বুজাক্ষের দিকে ঝুঁকে আসে, পাহাড় আছে বলছিলে না তুমি? রুগ্ন খুকির মতো বড়ো বড়ো চোখে সে চেয়ে থাকে, পাহাড় না থাকলে ওদিকে যাবো না বাপু–আমার বাবা বলতেন–

ওদিকে পাহাড় কোথায় গো? অম্বুজাক্ষ খেতে খেতে বলে, নলহাটি থেকে তুমি পাহাড় দেখতে পাবে– ছোটনাগপুরের পাহাড়–ঠিক যেন নীল মেঘ, ভারি সুন্দর।

সেখানে যেতে পারব না? সরোজিনী ঠোঁট ফুলিয়ে আবদার করে।
আহা, সে তো অনেক দূর–বিশ ত্রিশ মাইল হবে। ওটা তো সাঁওতালদের জেলা।

তাহলে ওখানে বিনিময় বন্ধ করে দাও তুমি। কত কষ্টে দেশ ছাড়ছি। ইন্ডিয়ায় গেলে বার বার কি বদলাতে পারব? বিনিময় যখন হবে, একেবারে একটা ভালো জায়গায় যাওয়া ভালো না?

আচ্ছা সে করা যাবে, এত ব্যস্ত কেন? মনে হচ্ছে যেন আজই যাচ্ছো? অম্বুজাক্ষ বলে।

যেতে যখন হবেই তখন তাড়াতাড়ি কি ভালো নয়? যত তাড়াতাড়ি মায়া কাটানো যায়। সবাই চলে যাচ্ছে। আমরাও তো যাব।

আমরাও যাব, আমরাও যাব। বাজে। বুকের মধ্যে। এই সব পরিত্যাগ করে, এই সবের মধ্যে মরে গিয়ে। সজল আকাশ, ঠাণ্ডা বাড়ি, পুকুরঘাট, শাদা পথ, লতার মিষ্টি গন্ধ, জমির শেখ, পদ্মপিসী এই সবের মধ্যে মরে গিয়ে আবার বেঁচে ওঠা। নতুন আলোয় চোখ রেখে । সেই নীল পর্বতশ্রেণী, উদ্রিক্ত সমুদ্র চেতনায় দোলে। আমরাও যাব। অম্বুজাক্ষ খুব তাড়াতাড়ি খেতে থাকে, আচ্ছা, আমাদের এই দেশেরই মতো দেখতে কোথাও গেলে হয় না? যেমন ধরো নদী আছে, গাছপালা একটু বেশি–কোন ঠাণ্ডা জায়গায়? অম্বুজাক্ষ প্রশ্ন করে। অর্থাৎ একই পাখি দেখব– একই মেঘ আর আকাশ–এইরকম কথা বলে ফেলে সে।

কোথায় যাবে?

নবদ্বীপের কাছাকাছি কোথাও। শুধু নবদ্বীপ কেন, ও দিকই কতকটা আমাদের দেশের মতো। আমি গেছি তো–বেশ গাছপালা আর সব ছায়া ছায়া।

না বাপু, জঙ্গুলে জায়গায় গিয়ে কাজ নেই। কোনো শুকনো জায়গায় চলো।

বাদ দাও এখন এসব কথা, অম্বুজাক্ষ বারান্দা থেকে হাত ধুয়ে ফিরে আসে, কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। তিনটে বছর চলে গেল কিছুই করতে পারলাম না। বিনিময়ের পাটি পেলেও হয় বনিবনা হচ্ছে না, না হয় গবমেন্ট একটা কিছু বাধিয়ে বসছে। একটা না একটা গণ্ডগোল লেগেই আছে।

আমাদের কিন্তু পাকা বাড়ি চাই, এইরকম–সরোজিনী অবুঝ হবার ভঙ্গি করে।

সে তো বটেই। এতদিনের অভ্যেস কি ছাড়া যায়! পাকাবাড়ি ছাড়া বিনিময় করব না–অম্বুজাক্ষ ঘোষণা করেই আবার বেরিয়ে যাচ্ছিল, সরোজিনী বলে, পান নিয়ে যাও। ভুলে যাচ্ছিলে নাকি?

বাইরের ঘরে আছি। ভ্যাবলাকে দিয়ে পাঠিয়ে দাও।
ভ্যাবলা নেই বাড়িতে।
কোথায় গেছে?
জানি না–ও কোথায় যায় আমি জানি না।

তুমি ঘুমোও নাকি? জানি না–কি জানো তুমি, আঁ? কি জানো সংসারের–অম্বুজাক্ষ মুহূর্তে খেপে ওঠে এবং যত কথা বলে তত খেপতে থাকে। পাষণ্ডের মতো চেঁচায়, তুমি আছো কি জন্যে? ছেলেপুলে এক একটা মূর্তিমান হনুমান হচ্ছে। বড়োবাবু দাড়িগোঁফ চাঁচতে শুরু করেছেন। এত বড়ো বেহায়া যে বাবার ক্ষুর নিয়ে গেছে চুরি করে। মেজোটি মারামারি করে বেড়ান। তার পরেরটির পাত্তাই নেই। বলি এই যে শুয়োরের পালটি পোষা হচ্ছে–কেন শুনি?

সরোজিনীও রাগে দিশেহারা হলো, তোমার পিণ্ডি চটকাতে। তিন বছর ধরে তো খুব

লাফাচ্ছ–ইন্ডিয়া যাব, ইন্ডিয়া যাব। কোথায়? হোমিওপ্যাথি করছেন! ছেলেপুলে এমনি মানুষ হবে, আকাশ থেকে টুপটুপ করে দেবপুত্র নামবে তোমার জন্যে।

শানের মেঝেতে খড়ম বেজে উঠল জোরে।
অন্ধকারে ধারালো ছুরির ফলার মতো চিৎকার সাঁৎ করে ছুটে আসে, সাপ, সাপ!!

কোথায়, কোথায়? তিনি তো সাপ নন। সাপেদের রাজা তক্ষক। গৃহদেবতা। সবচেয়ে বড়ো আর সুন্দর ঘরটার উত্তর পশ্চিম কোণ ফাটিয়ে যেদিন পান্নার মতো কচি পাতা নিয়ে অশথ দেখা দিল, ঠিক সেদিনই অদৃশ্য চিড়গুলোর সুত্রপাত হলো। অশথের পাতার ভিতরে সূক্ষ জটিল জালের মতো চিড়। তারপর সেই বর্ষার শেষে প্রথম শরতে তিনি এলেন, ডেকে উঠলেন–কট কট কট–তোক্কে তোক্কে এবং মুহূর্তে পাতার আড়োলে চলে গেলেন। ছাদ ইতিমধ্যেই চৌচির হয়ে গিয়েছিল বলে ঘর থেকে বাস সরিয়ে নিতে হয়েছিল। সেই ভাঙা ফাঁকা ঘরেই প্রথম দর্শন হোল সেজো ছেলে অরুণের সঙ্গে। বেশ বড়ো একটা টিকটিকি, সবজে ছোপের শাদা রঙ। উপযুক্ত মারণাস্ত্রের খোঁজে বাইরে আসতেই দাদামশায়ের সঙ্গে দেখা–কি ব্যাপার?

ঘরে একটা সাপ–মারব।

কই দেখি। দাদামশাই ঘরে এসে সেটার দিকে চেয়ে থাকেন। চোখ কুঁচকে উঠেছে, কপালে অসংখ্য ভাঁজ। কোনো প্রাচীনতাকে দেখছেন? তারপর আর কি? কাঁপতে থাকল ঠোঁট। চোয়াল চিবুক ভেঙেচুরে কেঁদে ফেললেন, এতদিনে দয়া হলো? এসেছো আমার বাড়িতে? থাকো, অধিষ্ঠান করো চিরঞ্জীব! অরুণের দিকে ফিরে বললেন, ওরে সর্প নয়, সর্পরাজ রে দাদা। খবরদার, ওর গায়ে হাত দিসনে।

এই সব কথা বলতে বলতে তক্ষক অশথ গাছে চলে গেল। সেই থেকে এখানেই আছে। আজ চিৎকার শুনে সরোজিনী দৌড়ে এলেন রান্নাঘর থেকে। তাড়াতাড়িতে কুপিটা নিভে গেল বাতাসে। চেরা গলায় চেঁচানি, সাপ কোথায় অরুণ, কোথায় সাপ দেখলি?

এসো না, এদিকে এসো না। তোমার পায়ের কাছেই জঙ্গলে। খবরদার এগিয়ে না–আমি মারছি ওকে।

শুকনো লম্বা ঘাসে সরসর শব্দ। আগাছা আর ঘাস। লম্বা–প্রায় হাঁটু পর্যন্ত লম্বা সোনালি ঘাস। কাঁটাঝোপ। সেইখানে দাঁড়িয়ে সরোজিনী আপাদমস্তক থরথরিয়ে কাঁপে। ঐখানে বাঁধাঘাট ভেঙে চূর্ণ হয়ে গেছে। কাকচক্ষু জল আর নেই। সেখানে এই অনাহ্যত নির্দয় ঘাস। দেয়ালে দেয়ালে বট আর অশথ। সরোজিনী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপে। কিসের খোঁজে যেন অরুণ দৌড়াদৌড়ি করে। প্রেতের মতো লাগে ওকে। অন্ধকার শূন্য ঘরগুলো খোলা দরজা দিয়ে ওর দিকে চেয়ে থাকে। সেখানে নৈঃশব্দ।

দাদামশাইয়ের ঘরে আলো নিভে গেছে। স্থবির মাথায় কিছুই ঢোকে না। হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছেন। আবছা অতীত হানা দিয়েছে প্রাচীন মস্তিষ্কে। দুর্জ্ঞেয় কিছু চলছে বা সেখানে। কাজেই আবার নৈঃশব্দ। অম্বুজাক্ষ বাড়িতে নেই, তামাক খেতে গেছে কোথাও। আর কেউ

নেই বাড়িতে। কে ডেকে গেল যেন। মহা পৃথিবী থেকে এইখানে। হাওয়ার মতো শিস দিয়ে উঠল। শ্বসিয়ে উঠল হাল্কা বড়ো বড়ো ঘাসে। হাওয়াই এমন প্যাঁচ কষলো যে অগ্নিশিখার মতো পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে শুকনো ঘাস কেমন লেলিহান হয়ে উঠল আর তার বিরাট দেহের জায়গায় জায়গায় ঢেউ উঠল। কেউ কাটে না এই ঘাস। সরোজিনী আপন মনে বলে। কি হবে পরিষ্কার করে, সব ছেড়ে তো যেতেই হবে। অম্বুজাক্ষই কি ফিসফিস করে উঠল?

ইস, সব জঙ্গল হয়ে গেছে। অরুণ, ওদিকে যাসনে বাবা, পায়ে পড়ি তোর। কথা শোন্।

চুপ করো তুমি–কর্কশ কণ্ঠ ভেসে এলো।
সাপ মারতে হবে না, বাবা আমার।

সব ব্যাপারে খ্যাঁচ খ্যাঁচ করো না বলে দিচ্ছি। অরুণের হাতে লাঠি। লাঠি ঝাঁকিয়ে আস্ফালন করে চলল। এত নির্দয় যেন লাঠিই পড়লো সরোজিনীর পিঠে।

কোন্ দিকে গেলি? বেরোও বাবা–সোনা আমার।
সেকি আর আছে রে–চলে গেছে। তুই বারান্দায় উঠে আয়।
খবরদার বুড়ি–রোষকষায়িত চোখে অরুণ চায়।
অন্ধকার লজ্জাহর। সরোজিনী অরুণকে দেখে না।

অরুণের কথা শেষ হয় না, অন্ধকারে আর একটা আঁধার-বিদ্যুৎ চমকে ওঠে। হিস-স-স। দিলি তো শালা কামড়িয়ে–পা চেপে অরুণ ঘাসের উপর বসে পড়লো।

কামড়িয়েছে? কামড়িয়েছে তোকে অরুণ? ভয়ঙ্কর চিৎকার করে সরোজিনী। ওরে তোকে তখুনি বললাম। কি করলিরে–তুই কি করলি?

চুপ করো, কামড়িয়েছে তো কি হয়েছে? কেঁউ কেঁউ করছো কেন?
তুই কি করলি রে বাপ–সরোজিনী বুক চাপড়ে চলে টেনে একটা কাণ্ড করে।

মরে যাব এই তো ? বয়ে গেছে বাঁচতে। এই দ্যাখ্ কলা দেখিয়ে চলে যাব। অরুণ বিরাট অন্ধকারের মধ্যে বুড়ো আঙুল নাড়াতে থাকে।

হোমিওপ্যাথিতে সর্পদংশনের চিকিৎসা আছে? অম্বুজাক্ষ কিছুতেই মনে করতে পারে না। একবার মনে হয় আছে, একবার মনে হয় নেই। আর্নিকা পালসেটিলা নাক্সভমিকা ইত্যাদি নানা কথা মনে আসে বাজে কথার মতো। তার বাবা কালীপ্রসন্ন অন্ধকার থেকে উঠে আসে না। শেষে সাব্যস্ত হয় হোমিওপ্যাথিতে সর্পদংশনের ওষুধ আছে। সাক্ষাৎ ধন্বন্তরির মতো ওষুধ। তবে তার নাম মনে পড়ছে না। হতে পারে জানা নেই। বিদ্যে নেই। হতে পারে স্মৃতিবিভ্রম। যাই হোক, ওঝার জন্যে অপেক্ষাই একমাত্র কাজ। ইতিমধ্যে অরুণ, নেতিয়ে পড়ে, গাঁজলা ভাঙে কষ বেয়ে।

আমি সত্যি করে মরে যাচ্ছি নাকি রে–ঘুমের ঘোরে অরুণ বলে। সরোজিনী চেঁচায়, অরুণ ঘুমোস না–ঘুমোস না অরুণ, অরুণ। অরুণ–অম্বুজাক্ষ ঝাঁকি দেয়, ঘুমিয়ো না অরুণ ঘুমুলে সর্বনাশ হবে।

কি জানি শালা কি ব্যাপার–বলতে বলতে অরুণ নিদ্রায় মধ্যে চলে গেল। ভোরের দিকে সে প্রস্থান করল চিরদিনের মতো।

জানো সরোজিনী, সব ব্যবস্থা হয়ে গেল?
কিসের সব ব্যবস্থা?
বিনিময়ের–বলেই একটু বিব্রত হাসি হাসল অম্বুজাক্ষ।

অনেক দিন থেকেই তো শুনছি–সরোজিনীর হাতে একটা হাতা, রান্না করছিল। রোগা মুখের ওপর চকচক করছিল চোখ দুটো। একটু মেঘের মতো এসে সেটাকে ঢেকে দিয়ে গেল।

না, এবার আর কোন কথা নেই। আমাদের জমিসম্পত্তি সব দেখে গেছে।
পছন্দ হয়েছে? উৎসাহকে প্রশ্রয় না দিয়ে আস্তে আস্তে জিগগেস করলো সরোজিনী।

পছন্দ হবে না মানে–এমন বাড়ি, এমন গাছপালা কোথায় পাবে। শুধু বলল, বড্ডো জঙ্গল, পুকুরটার সংস্কার দরকার। আর বলল, বাড়িটাকে তো শেষ করেছেন। অশথ আর বটগুলোকে উৎখাত না করতে পারলে বাস করাই যাবে না। বাড়ি থাকবে না দুবছরের বেশি। বললাম, আপনি এসে নতুন করে পত্তন করুন না। আমরা কি আর আছি এখানে? এ বাড়িতে আমরা একরকম মরেই গেছি বলতে পারেন। কেন যাচ্ছেন? ভদ্রলোক জিগগেস করলেন। আপনারা কেন আসছেন? আমি জিগগেস করলাম উল্টো।

কি বললেন?
এই আর কি! ভবিষ্যৎ নেই, নিরাপত্তা নেই। যেমন আমরা বলি আর কি!
এখানে আসলে রাজা হয়ে যাবে ভাবছে না?
তাইতো মনে হলো। সব নাকি নতুন করে বানাবে।
আমিও তাই বলি–আমরাও সেখানে গিয়ে সব নতুন করে বানাব।
এমন হয়েছে আজকাল যে চুল নখ বড়ো হলে মনে হয় একবারে সেখানে গিয়ে কাটাবো।
তা ভদ্রলোকের বাড়ি কোথায়?
কটোয়ার কাছে–অগ্রদ্বীপ।
খুব সুন্দর নাম তো!

এমনিতেও সুন্দর। ছেলেবেলায় গিয়েছিলাম একবার বাবার সঙ্গে। কি জন্যে যেন। খুব ছেলেবেলায়। ধবধবে শাদা মাটি আর বিরাট বিরাট মাঠ। মাঠের বুক চিরে রেললাইন গেছে। এদিকে কলকাতা, ওদিকে খাগড়া, আজিমগঞ্জ, নলহাটি, ছোটোনাগপুর ঘেঁসে বোলপুর হয়ে বর্ধমান–এই সব।

সরোজিনী রান্না বন্ধ করে দিল। এই সব শুনলে কিছুতেই কাজ করা যায় না।
কি বিরাট দেশ–অম্বুজাক্ষ বলে যায়, কোথায় যেতে চাও–দিল্লী, আগ্রা, পুরী, মথুরা, বৃন্দাবন? অতি অবহেলায় যেতে পারো।
ওদের বাড়িটা কি পাকা?
হ্যাঁ পাকা। ঠিক জানি না। যেখানে খুশি যেতে পারবে–অম্বুজাক্ষ কথা শুরু করে।

কোথাও যাবার দরকার নেই আমার। কোথাও যাব না আমি। ভারি পরিশ্রম গেছে আমার সারাজীবন। চুপচাপ বিশ্রাম নেব সেখানে গিয়ে। আমাকে আর খাটাতে পারবে না তোমরা। একটা ছোট্ট বাগান করে দিও। শিউলি, বকুল, চাপা, গোলাপ এই সব গাছ দিয়ে–এককালে আমাদের যেমন ছিল।

ছেলেমেয়েগুলোকে–এইটুকু বলেই অম্বুজাক্ষ থামল দম নিতে। সরোজিনীও কি বলতে গিয়ে থতমত খেয়ে গেল। সূর্য আজকাল বাড়ি আসে না। লেখাপড়া ছেড়েছে বহু আগেই। যেখানে-সেখানে মারামারি, বদমাইশি করে বেড়ায়। তার পরের পাঁচজনের দুজনে বাড়িতে একটু-আধটু পড়াশোনা করে। বাকি তিনজনে পরমানন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে ঝোপে, ঝাড়ে, মাঠে-ঘাটে–ছেড়ে দেওয়া গরুর মতো। মাঝে মাঝে নিজেদের মধ্যে আলাপ করে, ইন্ডিয়ায় গেলে বাবা আমাদের ইস্কুলে ভর্তি করে দেবে, তাই না! নতুন জামা আর প্যান্ট দেবে।

ছেলেমেয়েগুলোকে ভর্তি করে দিতে হবে, গলা পরিষ্কার করে অম্বুজাক্ষ বলল। ওদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। আজ যাব কাল যাব করে ওদের ইস্কুলেই দেওয়া হলো না তো। এই বলে একটু চুপ করে হঠাৎ অম্বুজাক্ষ বলে উঠল, হোমিওপ্যাথিতে কিছু নেই আজকাল।

কিছুতেই আর কিছু নেই–সরোজিনী বলে।

তাই মনে হয় আমারো।
তাহলে বিনিময়ের ব্যবস্থা হয়ে গেল বলছো?
প্রায়।
আবার প্রায়। এই না বললে হয়ে গেছে?
অনেক রকম বায়নাক্কা আজকাল–সহজে বিনিময় সম্ভব নয় আর।
আর কবে যাব? বুড়ো হয়ে গেলাম যে।
বুড়ো হয়ে যাচ্ছি–তাই না?

অম্বুজাক্ষ অন্যমনস্ক হয়ে বসেছিল। অশথ গাছ থেকে তক্ষক ডেকে উঠলে চমকে উঠল সে। বাইরে দুপুরের তীব্র রোদ। বাড়ির সামনের লম্বা ঘাসগুলো শুকিয়ে হালকা হয়ে গেছে।

ঠিক এখন আগুন দেবার সময়, অম্বুজাক্ষ ভাবল, একটিমাত্র দেশলাই কাঠি খরচ করলেই হু হু আগুন জ্বলবে, আগুন এগিয়ে যাবে ছাদে, বরগায়, শূন্য ধানের গোলায়, সরেজিনীর শুকনো হাড়ে। লাগিয়ে দিলে হয়, অম্বুজাক্ষ আবার ভাবলো, তারপর সরোজিনীকে জড়িয়ে ধরি, বুকে টেনে আনি–তারপর আমি, সরোজিনী, বাবা, সূর্য, বরুণ, কমল, ভ্যাবলা সবাই দাঁড়িয়ে থাকি, সর্বনাশ দেখি–শেষে ধ্বংস হয়ে যাই। কি বিশ্রী কথা, অম্বুজাক্ষ ঠিকমতো দেখতে পাচ্ছিল না সম্ভবত, চোখ ঘষলো বারে বারে, তখন দেখতে পেল অশথ গাছটা কতো বড় হয়ে গেছে। প্রতিষ্ঠা করা গাছের মতো বিশাল, সবুজ–উত্তর দিকের দেয়ালটার তলা পর্যন্ত ফাট ধরেছে। চেয়ে থাকতে থাকতে রোদ আরো তীব্র হয়ে উঠলো আর যেন চোখের ওপরেই চড়াৎ শব্দ করে দেয়ালটা চৌচির হয়ে গেল।

শিগ্‌গির একবার এদিকে এসো তো–সরোজিনী সোজা এসে ঘরে ঢুকলো। অবাক অম্বুজাক্ষ তাকায়, কি হলো?
এসো না একবার।

অম্বুজাক্ষ ধীরে-সুস্থে ওষুধের বাক্সো বন্ধ করে। ময়লা কোঁচাটা বার দুই ঝাড়ে ফটফট করে, চেয়ে দেখে সরোজিনী চলে গেছে। বাইরে এসে দরোজায় শিকল তুলে দেখল দ্রুতপায়ে সরোজিনী কালীপ্রসন্নর ঘরের দিকে যাচ্ছে। সেখানে এসে অম্বুজাক্ষ একটি অদ্ভুত ব্যাপার দেখতে পায়–সরোজিনী দুহাতে আলিঙ্গন করে আছে কালীপ্রসন্নকে। প্রাণপণে চেষ্টা করছে তাঁকে তুলতে। কালীপ্রসন্নর চোখ বোঁজা।

বাবার কি হয়েছে?
হঠাৎ পড়ে গেলেন। ধরো একটু, বিছানায় শুইয়ে দিই। কালীপ্রসন্ন তারপর নিঃসাড়ে বিছানায় পড়ে থাকেন।

কতবার বলেছি, বুড়ো মানুষ কোন কাজ নিজে করার দরকার নেই। কিছুতেই শুনবে না। হলো তো–ভোগো এখন ছমাস। হোঁচট খেয়ে পড়েছে নিশ্চয়। অম্বুজাক্ষ ভারি তেঁতো গলায় এই সব কথা বলে। কিন্তু শোনা গেল কোন কিছুতেই হোঁচট খান নি কালীপ্রসন্ন। খড়ম খুলেও যায় নি। হাঁটতে হাঁটতে বিনা কারণে পড়ে গেছেন।

অম্বুজাক্ষ বজ্রাহতের মতো দাঁড়িয়ে থাকে, শেষে বলে, তাহলে হয়ে গেল?
কি?
পক্ষাঘাত।
তক্ষকটা তখুনি ডেকে ওঠে। কালীপ্রসন্ন চোখ মেলে ডাকেন, হিরণ।
অম্বুজাক্ষ বিছানার কাছে যায়। কালীপ্রসন্নর ওপর ঝুঁকে পড়ে বলে, বাবা, কিছু বলছ?
আমার কি হয়েছে হিরণ?
কিছু হয় নি তোমার, এমনি পড়ে গেছো।
ডান দিকটা হঠাৎ কেমন অবশ হয়ে গেল, মাথা ঘুরে উঠল–
শরীর দুর্বল থাকলে অমন হয় বাবা, আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যাবে।
কালীপ্রসন্ন ডান হাতটা নাড়াতে চেষ্টা করেন, হিরণ, আমি হাতটা নাড়াতে পারছি না।
সব ঠিক হয়ে যাবে।

কালীপ্রসন্ন যেন কিছুই শুনতে পান না, দেখতে পান না, পাগলের মতো চেঁচিয়ে ওঠেন, তবে কি আমার পক্ষাঘাত হয়ে গেল রে? না মরে গিয়ে আমি কি তাহলে ফাঁদে পড়ে গেলাম?

অম্বুজাক্ষ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। কালীপ্রসন্নর মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, গাল ভেঙে ভিতরে ঢুকে গেছে–জটিলগ্রন্থিতে দুর্বোধ্য লাগছে কদাকার মুখ।

মানুষ নিজের ইচ্ছায় মরতে পারে না হিরণ, তবে নিজেকে মেরে ফেলা যায় ইচ্ছে করলে। আমাকে মেরে ফ্যাল–বাবা, তোর, পায়ে পড়ি, তোর ভাল হবে–আমি আশীর্বাদ করব তোকে।

কি পাগলের মতো বকছ–অম্বুজাক্ষের মনে আস্তে আস্তে বিরক্তি বাসা বাঁধে।

আমাকে একটা কিছু দে, খেয়ে মরি। আমি এক্ষুনি মরে যেতে চাই। হিরণ, বাবা আমার–কালীপ্রসন্ন জড়িয়ে জড়িয়ে ঘ্যান ঘ্যান করে।

এরকম করলে আমি এখুনি চলে যাব।
তাহলে আমি কি করব বলে দে।
চুপচাপ শুয়ে থাকো।

বুড়ো মানুষকে কাঁদতে দেখলে অম্বুজাক্ষের বরাবরই আশ্চর্য লাগে যদিও সে জানে একমাত্র বুড়োরাই কাঁদতে পারে ছেলেদের মতো।

তবে শিশুদের কান্নায় চেয়ে বৃদ্ধের কান্না অসহ, কারণ সে তার কান্নার মধ্যে সারাজীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা ঢেলে দিতে পারে। কালীপ্রসন্ন সেই তেঁতো কান্না কাঁদে। তার স্বস্তিহীন কান্না দড়েচড়ে বেড়ায় ঘরের আনাচে কানাচে–সবশেষে সরোজিনীকে কাঁদায়। সরোজিনী মুখে আঁচল চাপা দিয়ে দশ বছরের মেয়ের মতো কাঁদে। এই সময়ে নাটকীয়ভাবে সূর্য এসে ঢোকে। লুঙ্গিটা হাঁটুর উপর তুলে পরেছে, খালি গা, গুলিখোরের মতো চোয়াড়ে চেহারা–এসেই কালীপ্রসন্নর বিছানার দিকে চেয়ে স্বভাবসিদ্ধ কর্কশ গলায় জিজ্ঞেস করে, কি হয়েছে?

তার কথার কেউ জবাব দেয় না।
সং-এর মতো সব দাঁড়িয়ে আছো কেন?
তোর দাদামশাই-এর পক্ষাঘাত হয়ে গেছে রে সূর্য–ফোঁপাতে ফোঁপাতে সরোজিনী জবাব দেয়।
কি হয়েছে?

পক্ষাঘাত।
হয়ে যখন গেছেই কি আর করবে ? কাঁদছো কেন ফোঁস ফোঁস করে?
তার কথা এত রূঢ় আর অমানুষিক শোনায় যে কালীপ্রসন্ন পর্যন্ত লজ্জায় কান্না থামিয়ে ফেলে।

ওষুধপত্র করো আর কি, না মরা পর্যন্ত–সূর্য তেমনি হিসহিসে হিংস্র কণ্ঠে বলে, তারপর লোহার মতো কঠিন হাতে সরোজিনীর ডান হাতটা নাড়া দিয়ে আদেশ চালায়, দুটো ভাত দাও তো–খেয়ে একটু বেরুবো–এই বলে সে বাইরে চলে যায়।

এই শহরেও শিয়াল ডাকে কেমন দ্যাখো–সরোজিনী চলে গেলে অম্বুজাক্ষ সেতার কোলে ভাবে। বাস্তবিকই, যেন হাজার হাজার শিয়াল চিৎকার করছিল একসঙ্গে। ভারি ঠাণ্ডা ছিল তখন বাতাস। এরই মধ্যে তক্ষকটা ডেকে উঠল কট্‌কট্ করে। সেতার থামিয়ে অম্বুজাক্ষ বিরাট অশথ গাছটার কাছে গেল। সাবধানে যেতে হলো। দেয়ালে এখন বড় বড় ফাটল হয়ে গেছে। অন্ধকারে দেখা যায় না, কিন্তু অম্বুজাক্ষ জানে দুএকটি ফাটল এত বিরাট হয়ে যে, পা পর্যন্ত ঢুকে যেতে পারে ভিতরে! হাঁ করে আছে। মাঝে মাঝে ইট পর্যন্ত খসে পড়তে শুরু করেছে।

অশথ গাছটার নিচে গেলে ছাদ যেন দুলতে শুরু করল। সেখানে দাঁড়িয়ে অম্বুজাক্ষ তীক্ষ্ণ চোখে

তক্ষকটাকে দেখার চেষ্টা করে। কিন্তু পাতার ফাঁকে শরতের ঠাণ্ডা বাতাসই শুধু শিস দেয়। অনেক চেষ্টার পর হতাশ হয়ে অম্বুজাক্ষ হাত থেকে ইটটা ছুঁটে ফেলে দিয়ে ফিরে আসে। ঘাসে শেওলার আস্তর এতো পুরু যে গালিচার মতো নরম লাগল তার আর এই আবেশে থাকতে থাকতে এমন পিছল একটা জায়গায় এসে পড়ল যে, আর একটু হলেই পা হড়কে পড়ে যাচ্ছিল অম্বুজাক্ষ। বহু কষ্টে সামলাতে হলো। তার বুকের ভিতরে হাতুড়ি পেটার মত ধক্‌ধক্‌ আওয়াজ সে শুনতে পেল।

সরোজিনী কি তাহলে আসবে না? এই ভাবতে ভাবতেই সরোজিনী এসে হাজির, নিচে চলো, খেয়ে নেবে। আমার কাজ আছে বিস্তর।

একটু বসো না সরোজিনী–অম্বুজাক্ষ গলাটা কাঁদো কাঁদো করে ফেলে।
আজ তোমাকে কি ভূতে পেয়েছে? এরকম করছো কেন?
একটু বসো সরোজিনী–অম্বুজাক্ষ মন্ত্রের মতো একটা কথাই আওড়ায়। মাদুরের এককোণে সরোজিনী বসে।
সে বসলে অম্বুজাক্ষ চুপ করে যায়।

আমরা আর যাচ্ছি না সরোজিনী–অনেকক্ষণ পর একটি একটি করে উচ্চারণ করে অম্বুজাক্ষ, তারপর কথাটার অনতিক্রম্য বিষাদ কাটিয়ে ওঠার জন্যে বলে হাসতে হাসতে, যাওয়া গেল না আর কি। সব গোলমাল হয়ে গেল। গিয়েই বা লাভ কি বলো? একই কথা। খবরাখবর যা পাচ্ছি তাতে মনে হয় এখানে তবু খেতে পাচ্ছি দুমুঠো–সেখানে লোকজন শুকিয়ে মরে যাচ্ছে।

সরোজিনী চুপ করে থাকে।

কোথাও যাব ভাবতেই ভালো–যাওয়া ভালো না। তাই না? এতদিন যাব যাব করে কাটালাম। এখন যেতে হবে না ভেবে দেখি কেমল লাগে–অত্যন্ত আবছা অস্পষ্ট কথা চালিয়ে যায় অম্বুজাক্ষ।

তাছাড়া সবাই কতো ভালোবাসে–সবচেয়ে বড় কথা বাবার এই অবস্থা, মানে মানে–না মরে যাওয়া পর্যন্ত–

কথাগুলো এতো এলোমেলো হয়ে যায় যে, তার মাথামুণ্ড ধরা যায় না। তাছাড়া সরোজিনী ঠিক প্রেতের মতো বসে আছে। সেজন্যে বাধ্য হয়ে অম্বুজাক্ষ আবার সেতার তুলে নেয় আর কত দ্রুতই না দেশ রাগের অভ্যন্তরে চলে যায়।

শেষ শরতের উছলে-পড়া কালো আকাশের মতোই সুর উপছে উপছে পড়ে। হারিকেনের লাল আলো আরো লাল হয়ে যায়। অম্বুজাক্ষ দুই চোখ বন্ধ করে মাথা নাড়ে তালে তালে।

এই সময়ে বিকট আওয়াজ করে সেতারের খোলটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে গেলে অম্বুজাক্ষ চোখ মেলে সরোজিনীকে দেখতে পায়। সে তখন হাতের ছোট লাঠি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হারিকেনটা তুলে নিয়েছে। সেটা চুরমার হয়ে গেলে সরোজিনী অম্বুজাক্ষের দিকে এগিয়ে আসে। অম্বুজাক্ষ বার বার চেঁচায়, মিনতি করে, সরোজিনী, আমাকে নয় আমি নই।

লেখক-পরিচিতি

হাসান আজিজুল হক ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুযারি ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার যবগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মোহাম্মদ দোয়া বখশ্‌ এবং মাতা জোহরা খাতুন। তিনি ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দে যবগ্রাম মহারানী কাশিশ্বরী উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিকুলেশন এবং ১৯৬০ সালে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। কর্মজীবনে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। রাজশাহী কলেজে পড়ার সময় ভাঁজপত্র 'চারপাতা'য় আমের মাহাত্ম্য সংক্রান্ত তাঁর প্রথম লেখা ছাপা হয়। সিকান্দার আবু জাফর সম্পাদিত 'সমকাল' পত্রিকায় ১৯৬০ সালে 'শকুন' ছোটগল্প প্রকাশের মধ্য দিয়ে মূলত হাসান আজিজুল হক সাহিত্যাঙ্গনে তাঁর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রথম গল্পগ্রন্থ 'সমুদ্রের স্বপ্ন শীতের অরণ্য' এর প্রথম গল্প 'শকুন'-এ সুদখোর মহাজন তথা গ্রামের সমাজের তলদেশ উন্মোচিত করেছিলেন তিনি। প্রায় অর্ধশতাব্দীর গল্পচর্চায় বিষয়, চরিত্র ও নির্মাণকুশলতায় হাসান আজিজুল হক অনেক উল্লেখযোগ্য গল্পের রচয়িতা। এসবের মধ্যে রয়েছে 'শকুন', 'তৃষ্ণা', 'উত্তরবসন্তে', 'বিমর্ষ রাত্রি', 'প্রথম প্রহর', 'পরবাসী', 'আমৃত্যু', 'আজীবন', 'জীবন ঘষে আগুন', 'খাঁচা', 'ভূষণের একদিন', 'ফেরা', 'মন তার শঙ্খিনী', 'মাটির তলার মাটি', 'শোণিত সেতু', 'ঘরগেরস্থি', 'সরল হিংসা', 'খনন', 'সমুখে শান্তির পারাবার', 'অচিন পাখি', 'মা-মেয়ের সংসার', 'বিধবাদের কথা', 'সারা দুপুর', 'কেউ আসেনি'। তার প্রকাশিত ছোটগল্প গ্রন্থগুলো হলো: 'সমুদ্রের স্বপ্ন শীতের অরণ্য' (১৯৬৪), 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ' (১৯৬৭), 'জীবন ঘষে আগুন' (১৯৭৩), 'নামহীন গোত্রহীন' (১৯৭৫), 'পাতালে হাসপাতালে' (১৯৮১), 'আমরা অপেক্ষা করছি' (১৯৮৮), 'রাঢ়বঙ্গের গল্প' (১৯৯১), 'রোদে যাবো' (১৯৯৫) ইত্যাদি। ১৯৬০ সালে 'বৃত্তায়ন' নামে তিনি একটি উপন্যাস লেখেন। পরে 'আগুনপাখি' নামে আর একটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে ২০০৬ সালে। তাঁর পরের উপন্যাস 'সাবিত্রী উপাখ্যান' ২০১৩ সালে প্রকাশিত হয়। হাসান আজিজুল হক একজন বাংলাদেশী ছোটগল্পকার এবং ঔপন্যাসিক। গত শতকের ষাটের দশকে আবির্ভূত এই কথাসাহিত্যিক তাঁর সুঠাম গদ্য এবং মর্মস্পর্শী বর্ণনাভঙ্গির জন্য প্রসিদ্ধ। জীবনসংগ্রামে লিপ্ত মানুষের কথকতা তাঁর গল্প-উপন্যাসের প্রধানতম অনুষঙ্গ।

মূল বক্তব্য

হাসান আজিজুল হকের 'খাঁচা' ছোটগল্পটি ধর্মের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালের ভারত-পাকিস্তান ভাগের পর পাকিস্তান থেকে ভারতে গমনেচ্ছু একটি হিন্দু পরিবারের উপর আলোকসম্পাত করে রচিত, যে পরিবারটি অবশেষে মত বদল করে এবং জন্মভূমি ছেড়ে ভারতে যায় না, পাকিস্তানেই থেকে যায়। এই গল্পের পেছনে আছে আর একটি গল্প এবং তা হলো, ভারত থেকে যে মুসলিম পরিবারটির বাড়ি-বদল করে পাকিস্তানে আসার কথা ছিল, সঙ্গত কারণেই তাদেরও আসা হয় না। লেখক বোঝাতে চেয়েছেন, রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে কোটি কোটি মানুষের জন্মভিটা পরভূমিতে যারা পরিণত করে, মানুষের মনোরাজ্য সেই জন্মভিটাকে পরভূম মনে করতে পারে না কখনো। হাসান আজিজুল হক এই গল্পে মূলত একটি বাঙালি হিন্দু পরিবারের কথা এবং আজকের বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট বর্ণনা আছে। ১৯৭৪ সালে দেশভাগের কারণে শত শত বছরের বাপদাদার ভিটা ছেড়ে চলে যাবার ব্যাপার আসে। এ অবস্থায় পূর্ব বাংলার এক ব্রাহ্মণ

পরিবার নিজের জমিতেই যেন আটকে পড়ে। অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, বাড়ি-বদল করতে হবে তাদের। পশ্চিমবঙ্গের কোন মুসলিম পরিবারের সাথে বাড়িটি বদল করে সেখানে পাড়ি জমাবার কথাও ভাবে তারা। সেই দুঃস্বপ্ন-স্বপ্নকে ঘিরে চলতে থাকে তারা। আর ধীরে ধীরে ক্ষয়িষ্ণু হতে থাকে পরিবারটির জীবনের গল্প। এই বাংলাদেশ অবশ্য তখন ছিল দেশ হিসেবে পাকিস্তান। গল্পে দেখানো হয়েছে, আশৈশব অম্বুজাক্ষ যে দেশকে নিজের জেনে এসেছে, একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের কারণে হিন্দু বলে সে দেশ আর তার থাকছে না এবং তাই পরদেশ ভারতকেই তাকে আপন ভাবতে হচ্ছে।

রাজনৈতিক এই সিদ্ধান্ত মেনে সে চেষ্টাও করেছে পরদেশকে আপন ভাবতে, কিন্তু পারেনি। এর পেছনে কার্যকর জন্মভূমির প্রতি টানতো আছেই, আর আছে পরদেশের পরিবেশ নিয়ে শঙ্কা, গৃহের মমতা আর প্রতিবেশীদের প্রতি অমিত আগ্রহ। অবশেষে, রাজনৈতিক নেতাদের সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করে অম্বুজাক্ষের মতো কোটি বাঙালি তাদের জন্মভূমি পূর্ব বাংলা ছেড়ে ভারতে গমন করে না, থেকে যায় স্বদেশেই, জন্মভূমিতে। আর কেনই-বা জন্মভূমি-স্বদেশ ছাড়বে, কোথায় যাবে তারা? অম্বুজাক্ষ-পরিবারটি হয়ে ওঠে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে বলি হওয়া লক্ষ পরিবারের প্রতিনিধি।

অপঘাত

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস

ডুকরে-ওঠা কান্নার একেকটি ধাক্কায় মোবারক আলির বন্ধ চোখের মণি কাঁপে, চোখের পাতা আলগা হয়ে আসে, তার বাঁ পায়ের পাতা শিরশির করে। দুই হাঁটুর ভেতর হাতজোড়া ভাঁজ করে ডান কাত করে শুলে বাঁ পায়ের পাতার ওপর একজিমা চুলকাবার জন্য উঠে বসার উৎসাহ পায় না। এদিকে দেখতে দেখতে কান্নার ফাঁকগুলো সব ভরে যায় এবং কান্না একটানা বিলাপে পরিণত হয়ে তার ঝুনা করোটির ভেতরকার ঠকঠক দেওয়ালে ঘনতালে বাজতে থাকে। বাজনাটা একবার বৃষ্টি বলে মনে হয়েছিলো; কিন্তু বৃষ্টিপাতের ফলে ঘরের কান্নাকাটির খবর বাইরে যাবে না–এই আশা করে একটু নিশ্চিত হবার আগেই বৃষ্টির বিভ্রম কাটে। বিলাপের আওয়াজ তার আঁশের মতো চুলের গোড়ায় গোড়ায় হ্যাচকা টান মারে। টানাটানির ফলে চোখের ঢাকনি সম্পূর্ণ উদাম হলে মোবারক কিছুই দেখতে পায় না, ঘরে ঘনঘোট অন্ধকার। ভালো করে তাকাবার বলও তার নাই, ঘুম-ভাঙা শরীরে স্ত্রীর বিলাপ অবিরাম ঠেলা দেওয়ায় সে নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। তবে কি-না মুণ্ডুর প্রতিক্রিয়ায় নিস্তেজ শরীরেও মোবারক আলি বিরক্ত হওয়ার বলটুকু পায়: এটা কি বিলাপ করার টাইম হলো? এই বয়সেও বুলুর মায়ের কাণ্ডজ্ঞান হলো না তো হবেটা কবে? ২৫০/৩০০ গজ দূরে হাইস্কুলের দালানে মিলিটারির ক্যাম্প, স্কুলের চওড়া বারান্দায় গাদা গাদা বালুর বস্তার আড়ালে থাবার মতো সব হাতে ধরা রয়েছে কতো কিসিমের অস্ত্র, মোবারক ওসবের নামও জানে না, শুনলেও তার মনে থাকে না। সপ্তাহখানেক হলো ইউনিয়ন কাউন্সিল অফিসটাও মিলিটারি দখল করে নিয়েছে, সে তো ১৫০ গজও হবে না। বুলুর মায়ের বুকের পাঁটা কতো বড়ো যে এইভাবে বিলাপ করে কাঁদে? মেয়েমানুষের এতো সাহস ভালো না, সব ছারখার করে ফেলবে। এই বিলাপ শুনে ইউনিয়ন কাউন্সিল অফিস থেকে দুজন সেপাই এসে পড়লে মোবারক আলির ক্ষমতা হবে যে তাদের সামনে সোজা হয়ে দাঁড়ায়? তারপর সেপাই, মানে সেপাই সায়েব যদি জিগ্যেস করে তোমার বৌ কাঁদে কেন?–তো সে কী জবাব দেবে? যদি বলে তোমার ছেলেমেয়ে কটা?–তখন না হয় বলা যাবে, জি দুই ছেলে, দুই মেয়ে। সঙ্গে সঙ্গে জানাতে হবে যে মেয়ে দুটোর বিয়ে হয়ে গেছে, তারা সব স্বামীদের সঙ্গে থাকে। তবে ছোটো মেয়েটা দুমাস হলো এখানে এসেছে, তিনদিন আগে সে গেছে তার মামাবাড়ি। তার মামা আলেম মানুষ, ঠনঠনিয়া মোস্তাফাবিয়া মাদ্রাসার হেড-মোদাররেস, সারা শীতকালটা ওয়াজ করে বেড়ায়, জেলা জুড়ে তার নাম।–সেপাই ধমক দিতে পারে, আরে, এতে তার বিবির কান্নাকাটির কী হলো? ঠিকভাবে কথার জবাব দাও।–তখন বাধ্য হয়ে বলতে হবে যে তার বড়োছেলের মৃত্যুই হলো তার স্ত্রীর কান্নাকাটির কারণ।–বড়ো ছেলে?–জি, আমার দুই ছেলে, ছোটোটা ঘরেই আছে, ক্লাস ফোরে পড়ে।–সেপাই চটে যাবে, বাখোয়াজি রাখো। বড়োটা মারা গেছে? কী করতো?–জি, কলেজে পড়তো।–কলেজে পড়তো? মুক্তি ছিলো? কীভাবে মরলো?–হুজুর, অপঘাতে মারা গেছে।–অপঘাত? অপঘাত কেয়া হ্যায়?–না, মানে এ্যাক্সিডেন্ট হ্যায় না? হেঁ হেঁ।–ক্যায়সা

এ্যাক্সিডেন্ট? সাচ বলো!–এরপর মোবারক আলি আর বলতে পারবে না।–জি না স্যার, জি না হুজুর, জি না মেজর সাহেব, জি না ক্যাপ্টেন বাহাদুর, আমি কিছু জানি না!–শালা তোমার ছেলে মিসক্রিয়ান্ট ছিলো? তোমার ঘরে তুমি মিসক্রিয়ান্টদের শেলটারও দাও?–না হুজুর!–মিসক্রিয়ান্টদের কথা সে জানে না। ইউনিয়ন কাউন্সিলের কেরানি মোবারক আলি হাজার হলেও পাকিস্তান গভমেন্টের চাকরি করে, জি, তার বেতন আসে বগুড়া ট্রেজারি থেকে, মিসক্রিয়ান্টদের খবর সে রাখবে কোত্থেকে?–না, তার শুকনা এবং কাঠ-কাঠ গলা থেকে এইসব বাণী হাঁকা অতো সহজ নয়। মিলিটারির সঙ্গে কাল্পনিক বাক্যবিনিময়ের সংকল্পে তার বল তাই বাড়ে না। তার পাশে শুয়ে-থাকা ছোটো ছেলে টুলু ঘুমের মধ্যে বিড়বিড় করে কী বলে, তাতে মোবারক আলির তন্দ্রা একবারে ছিঁড়ে যায় এবং সে উঠে বসে। এখন আর শিরশির না করলেও একজিমার খানিকটা চুলকে নেয় এবং পাশের ঘরে দেড় বছরের নাতিটা হঠাৎ কেঁদে ওঠে। তখন তার মগজের ময়লা কাটে, মোবারক আলি বোঝে যে এই একটানা বিলাপের উৎস তার নিজের বাড়ি নয়। আওয়াজ আসছে দক্ষিণ থেকে। নাতি তার ফের কাঁদে এবং মোবারকের মাথায় বিদ্যুৎ খেলে যায়: চেয়ারম্যানের ছেলেটা তা হলে মারা গেলো!

বিকালেও সে চেয়ারম্যানের বাড়ি গিয়েছিলো। ইউনিয়ন কাউন্সিলে মিলিটারি ক্যাম্প হবার পর থেকে অফিসের টুকটাক কাজ সারতে হয় চেয়ারম্যানের বাড়িতে। বিকালবেলা চেয়ারম্যানের চোখমুখ একটু হাল্কা মনে হচ্ছিলো, শাজাহান মনে হয় একটু ভালো। না, ভালো আর কোথায়? জ্বরটা রেমিশন হচ্ছে না, তবে একটু আগে লেবু দিয়ে প্রায় এক গ্লাস বার্লি খেয়েছে। চেয়ারম্যান একটু আলাপও করলো, এখানে চিকিৎসা একেবারেই হচ্ছে না, অবস্থা একটু ভালো হলে বগুড়া পাঠাবে। চার গাঁয়ের এক ডাক্তার চেয়ারম্যানেরই কীরকম চাচাতো ভাই, একই বাড়ি, মার্চের প্রথমদিকে দিনাজপুরে শ্বশুরবাড়ি গেলো মরণাপন্ন সম্বন্ধীকে দেখতে, গোলমাল শুরু হতেই ওপারে ভাগলবা। আর সেরপুরের বীরু সান্যাল, পুরনো আমলের ন্যাশনাল পাশ,–১০/১২ বছর আগেও এই গ্রামের সবাই তার কাছেই যেতো, তা শোনা যাচ্ছে বর্ডার পার সময় বেয়নেটের খোঁচায় বুড়ো সাফ হয়ে গেছে।–ছেলেকে নিয়ে চেয়ারম্যান এখন যায় কোথায়? গোরুর গাড়ি করে সেরপুর পর্যন্ত না হয় গেলো, সেরপুরে জনমনিষ্যি কেউ নাই, বড়ো রাস্তায় খালি মিলিটারি, খালি মিলিটারি। তা এখানে হাইস্কুল ক্যাম্পের ক্যাপ্টেন সাহেবের সঙ্গে চেয়ারম্যানের একটু আলাপ হয়েছে, তবে ওদের সাহায্য চাইতে ভয় হয়, ঘরে সোমত্ত বয়সের মেয়েরা আছে, কিসের বিনিময়ে আবার কী চেয়ে বসে! তা দ্যাখা যাক, আজ তো বার্লি খেলো, অবস্থা একটু ভালো হোক, এর মধ্যে কি অনেকটা নর্ম্যাল হবে না? দেশের অবস্থা নর্ম্যাল হওয়ার আগেই ছেলেটা মারা গেলো? তাহলে সন্ধ্যার পার থেকে কি খারাপ হচ্ছিলো? মনসুর সরকার কয়েক বছর থেকে হোমিওপ্যাথিক প্র্যাকটিস করে, কাউকে না পেয়ে তাকে দ্যাখানো হলো, তার ডায়াগনোসিস হলো টাইফয়েড। দুর, টাইফয়েড কি দুটো সপ্তাহ সময় দেবে না? ১০/১২ দিনেই সব শেষ হলে গেলো? আহা! ছেলেটার মায়ের স্বর স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, তার সঙ্গে ছলকে ছলকে ওঠে চেয়ারম্যানের মায়ের কান্না। এদের কান্নাকে মোবারক বুলুর মায়ের বিলাপ বলে ভুল করলো কী করে? স্ত্রীর জন্য তার মায়া হয়, শোকে বুলুর মা একেবারে কাঠ হয়ে গেলা! বৌয়ের ওপর সে মিছেমিছি রাগ করছিলো।

বিছানা থেকে নেমে মোবারক আলি ঘরের উল্টো প্রান্তে বৌয়ের বিছানার দিকে পা বাড়ায়।

তক্তপোষের কাছাকাছি যেতে পা লেগে নেভানো হ্যারিকেনটা গড়িয়ে পড়ে। কেরোসিনের ঝাঁঝালো গন্ধে মাথা আরেকটু পরিষ্কার হয়। মনে পড়ে যে নাতিকে নিয়ে বুলুর মা শুয়ে রয়েছে পাশের কামরায়। এই ঘরটায় থাকতো বুলু। মোবারক আলি একটু দমে যায়, তবু অন্ধকারে হেঁটে হেঁটে বারান্দা দিয়ে সে পাশের কামরায় ঢোকে । বুলুর মা বলে ওঠে, 'আস্তে হাঁটো, টেবিলের উপর দুধের বোতল, কাচের গিলাস!' মোবারকের মুখস্থ। আজ ২ রাত হলো বুলুর মা এখানে শোয়, কিন্তু বুলুর খবর শোনার পর থেকে মোবারক অনেক রাত্রে পেচ্ছাব করতে বেরিয়ে একবার করে এই ঘরে বসে। অল্পক্ষণ বসে, কাঠের চেয়ারে পাছা ঠেকাতে না ঠেকাতেই উঠে নিজের ঘরে যায়। কিন্তু তার জানা আছে কোথায় বুলুর তক্তপোষ, কোথায় তার কেরোসিন কাঠের টেবিল। টেবিলে পুরনো ক্যালেন্ডারের মলাট লাগানো বই, খাতা, দোয়াত, কলম–কীভাবে সাজানো সব তার জানা। বিছানার দিকে এগোবার বদলে মোবারক টেবিলের বইপত্র হাতড়াতে শুরু করে। বুলুর মায়ের সাড়া পেয়ে সে বিড়বিড় করে, 'দিয়াশলাই পাই না, দুর!'

'বাতি জ্বালায়ো না।' স্ত্রীর ভিজে ভিজে গলায় এই সতর্ক নিষেধ শুনে মোবারক এসে দাঁড়ায় তক্তপোষের মাথায়। মাস দেড়েক হলো প্রতিরাতে পেচ্ছাব সেরে এ ঘরে এসে ঠিক এখানেই দাঁড়িয়ে মোবারক বিছানাটা ভালো করে ঠাহর করার চেষ্ট করে। আজ তার মাথায় তন্দ্রার রেশ নাই, সুতরাং বুলুর ঢ্যাঙা শরীরটাকে এখানে শুইয়ে অন্ধকারে নয়ন ভরে আর দ্যাখা হয়ে ওঠে না। চোখেজোড়া তাই ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে এবং বিছানার ওপরকার শূন্যতা চোখের মধ্যে নুন হয়ে জমতে শুরু করলে নিজেকে সামলাবার জন্য তাকে অনাবশ্যক স্বাভাবিক গলায় বলতে হয়, 'চেয়ারম্যানের ব্যাটা বুঝি মারা গেলো।' শাজাহানের মৃত্যু-সংবাদ সম্পূর্ণ প্রকাশিত হওয়ার আগেই বুলুর মা ফোঁপাতে শুরু করে। এই ফোঁপানো হলো কোনো দীর্ঘকান্নার রেশ। বুলুর মা তাহলে অনেকক্ষণ ধরে কাঁদছে। ঘুম ও তন্দ্রার ভেতর দক্ষিণপাড়ার আখন্দবাড়ির বিলাপকে যখন সে স্ত্রীর কান্না বলে ভুল করে, বুলুর মা তখনো কাঁদছিলোই। তবে বাইরের বিলাপের তোড়ে রোগা গলার কান্না চাপা পড়েছিলো। স্ত্রী বিলাপ করছিলো বলে একটু আগে তার ওপরে রাগ করায় মোবারকের যে অস্বস্তির মতো হচ্ছিলো তা এখন কেটে যায়। স্ত্রীর ওপর বিরক্ত হবার সুযোগটি সে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহার করে, 'আস্তে! আস্তে কান্দো! বিপদ বোঝো না?'

চুপ করার চেষ্টায় বুলুর মায়ের কান্না আরো উথলে ওঠে। কান্নায় সম্পূর্ণ মগ্ন থাকায় এবং অন্ধকারের জন্যেও বটে, বুলুর মা স্বামীকে দেখতে পাচ্ছে না। ভয় ও রাগে মোবারক আলির চোখমুখনাকঠোঁটের ওলটপালট হবার দশা: বুলুর মা সারাটা জীবন কি অবুঝ মেয়েমানুষই থেকে যাবে? তার কান্না শুনে মিলিটারির ১ জন সেপাই যদি এসেই পড়ে তখন এই পুত্রশোকের ব্যাখ্যা করা যাবে কী করে? তখন কি খুঁড়তে খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়বে না? তারপর? তার পরে? তারপরের ঘটনা মোবারকের জানা আছে। তাকে ধরে নিয়ে যাবে স্কুলের দালানে, হেডমাস্টারের কামরায় এখন টর্চার সেল। মোবারক আলির মেরুদণ্ড শিরশির করে। সুতরাং টর্চার সেলের ছবি তাড়াতাড়ি মুছে ফেলার জন্য সে কাতর হয়। তার বাড়িতে ওরা নির্ঘাত আগুন ধরিয়ে দেবে। এই পুরনো মাটির বাড়ি, টিনের চাল, বাঁশের সিলিঙ–সব দাউদাউ করে জ্বলবে। আগুনের আঁচ সে এখনি অনুভব করেতে পারে। তলপেটে আগুনের আঁচ লাগে। তার ভয় হয় যে লুঙিতে প্রস্রাবের ফোঁটা পড়ছে। একটু বাইরে গেলে হতো। কিন্তু এও তার জানা আছে যে বাড়ির পেছনে ভেরেণ্ডা ঝোপে বসলে গুণে গুণে ৮ ফোঁটাও পড়বে কি-না সন্দেহ।

সে প্রায় চিৎকার করে ধমক দেয়, 'চুপ করো, বুলুর মা চুপ করো। সোয়াগ দ্যাখাবার টাইম পাও না, না?' ধমকে কাজ হয়। বুলুর মা চুপ করে। এই সুযোগে মাথা তোলে দক্ষিণপাড়ার বিলাপ। মোবারক আলি হঠাৎ খুব জোরে নিশ্বাস ফেলে তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে-চলে-যাওয়া পাছাটিকে ধপাস করে তক্তপোষের একধারে ফেলে দিলে বুলুর মা বলে, 'আস্তে!' এই একটিমাত্র শব্দে স্বামীর প্রতি তার অনাস্থা বা সাময়িক অনাস্থা প্রকাশ প্রায়। প্রায় মিনিট দুয়েক সময় পার হলে মোবারক আলির শিরদাঁড়ায় স্পন্দন থিতিয়ে আসে এবং আপোশ-আপোশ গলা করে সে বলে, 'চেয়ারম্যানের একটাই ব্যাটা গো।'

শাজাহানের জন্যে মোবারক আলির খারাপ লাগে। এই শাজাহান স্কুলে সাত বছর বুলুর ক্লাসমেট ছিলো, আহারে! না, স্কুলজীবনে দুজনের তেমন খাতির হয়নি। শাজাহান ছাত্র খুব ভালো, রাতদিন লেখাপড়া নিয়ে থাকে। বুলু গড়পড়তা ছাত্র, সেকেন্ড ডিভিশনে পাস করেই খুশি। ফার্স্ট ডিভিশন পেয়েও শাজাহানের তৃপ্তি হয়নি, আর ক'টা নম্বর পেলেই সে অনেক ভালো করতো। এই নিয়ে তাঁর আক্ষেপের আর শেষ নাই। শাজাহান বছরের ১টা মাস কোনো না কোনো রোগে ভোগে, নইলে চেয়ারম্যান কি তাকে গ্রামের স্কুলে ফেলে রাখে? শহরে তাদের কতো আত্মীয়স্বজন, জেলা স্কুলে পড়লে কেবল রোল নম্বর নয়, খবরে কাগজে তার নামও ছাপা হতো। এসএসসি'র পর শাজাহান শুনলো না, জেদ করে ভর্তি হলো ঢাকায়। বুলু গেলো বগুড়া কলেজে। অথচ, তখন থেকে দুজনের ভারী ভাব, ছুটিতে বাড়ি এলে প্রায় সারাদিন এক সঙ্গে কাটায়। শাজাহান ছেলেটি ভারী ভদ্র, বাপ-চাচাদের মতো কথায় কথায় খোঁচা-মারা কথা বলে না।–বুলুর কথা ভোলার জন্য মোবারক আলি শাজাহানের কণ্ঠস্বর মনে করার চেষ্টা করে, আহা কী অমায়িক ছেলে, দ্যাখা হলেই 'স্লামালেকুম চাচা, বুলু বাড়ি নাই?'–আহা, সেই ছেলে কয়েক দিনের জ্বরে এভাবে– ।–শাজাহানের জন্য শোকটা তারিয়ে তারিয়ে দেখবে, তা বুলুর মা তার দিকে পিঠ ফিরিয়ে আস্তে আস্তে ফোঁপাতে লাগলো। ছেলের শোক বহন করার চেষ্টা সে এখন করছে একা একা! মেয়ে মানুষের দৌড় মোবারক আলির জানা আছে। একটু পরেই তার হাত জড়িয়ে হাউমাউ করতে শুরু করবে। কেন, ছেলেকে আগলে রাখতে পারোনি, এখন হায় হায় করে লাভ কী? বুলুটা বড্ডো বেশি বেড়ে গিয়েছিলো। মুক্তিবাহিনী করে তোরা করলিটা কী? মিলিটারি এসে গ্রামকে গ্রাম উজাড় করে দিচ্ছে, মরা ছাড়া তোরা আর কী বাকিটা ছিঁড়তে পারিস?–রাগে মোবারক আলি মনে মনে মুখ খারাপ করে। করবে না? মিলিটারি কলেরার মতো আসে, ম্যালিরিয়ার মতো আসে। যে গ্রামে একবার হাত দেয় তার আর কোনো চিহ্ন রাখে না। গতকাল বৃহস্পতিবার গেলো, তার আগের বৃহস্পতিবার মাইল ছয়েক উত্তরে মালিয়ানডাঙায় মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা এক রাত্রির জন্য আশ্রয় নিয়েছিলো।

একদিন পরে, শনিবার দিনগত রাত্রে সিঙড়া ক্যাম্প থেকে মিলিটারি এসে গোটা গোটা গ্রাম জ্বালিয়ে দিলো। প্রাইমারি স্কুলটাও বাদ দেয়নি,–তা মুক্তিবাহিনী, তোরা কী করতে পারলি? সরকার-বাড়ির ল্যাংড়া জমির আলির মেয়ে আর ভাইঝিকে নিয়ে গেলো। কী ব্যাপার? না, তাদের নামে কমপ্লেন আছে।–মেয়ে মানুষের নামে কমপ্লেন?–হ্যাঁ, তারা সব ইনফর্মার, মুক্তিবাহিনীকে খোঁজখবর পাঠায়।–তাদের একজন ফিরে এলো দিন দশেক পর। সেই মেয়েকে নিয়ে ল্যাংড়া জমির আলি যে মুসিবতে পড়েছে, কপালে তার আরো কতো যে ভোগান্তি আছে!–গজব! গজব! গজব ছাড়া এসব কী?–চেয়ারম্যান যে চেয়ারম্যান,–যে

সরকারই আসুক, লোকটা ঠিকঠাক সামলাতে পারে, সবাইকে খুশি করার মতো ক্ষমতা তার আল্লার রহমতে ভালোই আছে,–তো সেই চেয়ারম্যান পর্যন্ত পরশুদিন সকালবেলা মোবারক আলিকে বলে, 'মোবারক মিয়া, ডাঙর বেটিছেলেকে বাড়িতে না রাখাই ভালো গো!'–'কেন?'–মোবারকের অজ্ঞতায় চেয়ারম্যান বিরক্ত হয়, 'বোঝেন না?' ইউনিয়ন কাউন্সিলের মধ্যে মিলিটারি ক্যাম্প করিছে, একরকম ঘরের মধ্যেই ঢুকলো, না কী কন? মিলিটারির সব মানুষ তো একরকম নয়। হাতের পাঁচ আঙুল কি এক সমান হয়? আবার এটাও কই, দুই চারটা মাথা-গরম মানুষ না থাকলে মিলিটারি চলে না।'

চেয়ারম্যানের পরামর্শে মোবারক আলি তার ছোটো মেয়েকে পাঠিয়ে দিলো সম্বন্ধীর সঙ্গে। চেয়ারম্যানও তার মেজো মেয়েটিকে সঙ্গে দিলো। মেয়েটি বেশ ফর্সা, নাকমুখ চোখে পড়ার মতো, তাই বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। মোবারক আলির সম্বন্ধী নামকরা মওলানা, জেলার নামকরা মাদ্রাসার হেড মোদাররেস, গোলমালের জন্য মাদ্রাসা বন্ধ থাকায় বাড়িতেই থাকে, আল্লা আল্লা করে, মানুষকে হেদায়েত করে,– সেটাই চেয়ারম্যানের ভরসা। কুদ্দুস মওলানা লোকও খুব ভালো। কোত্থেকে ভাগ্নের খবর পেয়ে বোন-ভগ্নীপতির সঙ্গে দ্যাখা করতে এসেছিলো। আহা, উপযুক্ত ভাগ্নে তার, তার ওপর কি-না খোদার গজব পড়লো, নইলে এভাবে গুলি খেয়ে মরে? মোবারক আলি ফিসফিস করে জানায় যে এখানে এসব নিয়ে কথাবার্তা না বলাই ভালো। মিলিটারি খবর পেলে নির্বংশ করে ছাড়বে। তা মওলানা সাহেব জবাব দিয়ে গেছে, বাড়ি গিয়ে বুলুর নামে কোরান-খতম করাবে, আরো যা যা করার সব করবে। তারপর মোবারক আলির এক কথায় ভাগ্নীকেও সঙ্গে নিলো, এমন কি জোহরার দেড় বছরের ছেলেটিকেও নিতে চেয়েছিলো। কিন্তু মেয়ের শরীরের কথা ভেবে বুলুর মা নাতিকে রেখে দিলো। পোয়াতি মেয়ে,–জমির আল দিয়ে, বাঁশঝাড়ের মধ্যে দিয়ে লুকিয়ে ছাপিয়ে যাবে, কোলে বাচ্চা থাকলে বিপদ আপদে সামলাতে পারবে? জামাই ঢাকায় ব্যাঙ্কের কেরানি, বৌ বাচ্চা পাঠিয়ে দিলো,–না, ঢাকায় ফুটফাট লেগেই আছে, আর এ সময়টা মেয়েরা তো মায়ের কাছেই ভালো থাকে। মায়ের কাছে আর রাখা গেলো কোথায়?–আল্লা না করুক জোহরার যদি কিছু হয়!–জোহরার সম্ভাব্য বিপদের কথা মনে হলে মোবারক আলির নিয়ন্ত্রণহীন শরীর আরো এলিয়ে পড়তে চায়। শরীর সামলাবার উহ্য বাসনাতেই সে বলে, 'যাই! চেয়ারম্যানের বাড়িতে যাই। একটাই ব্যাটা! কয়টা দিন খুব ভুগলো গো! চেয়ারম্যানের বৌ এই কয়টা দিন একটা মিনিটও ব্যাটার কাছ-ছাড়া হয় নাই। ব্যাটা ব্যাটা কর‍্যা মনে হয় জান দিবি!'

এবার ডুকরে কেঁদে ওঠে বুলুর মা। বলকানো কান্নার জন্য প্রথমদিকে তার কথা জড়িয়ে যাচ্ছিলো, কিছুক্ষণের মধ্যে কান্নার স্বর নিচে নামে এবং কথা স্পষ্ট হয়, 'সেই কথাই তো কই গো, হামি সেই কথাই কই!' কোন কথা তা শোনার জন্য মোবারক আলিকে আরো কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করতে হয়, 'দ্যাখো তো, চেয়ারম্যানের ব্যাটা, এ্যাঁ, তাঁই মরলো মায়ের সামনে, বাপের সামনে! মাও তো তার ব্যাটাক জান ভর‍্যা দেখ্যা লিবার পারলো! আর হারাম বুলু কোটে কার গুলি খায়া মুখ থুবড়্যা পড়্যা মলো গো, ব্যাটার মুখকোনা হামি একবার দেখবারও পারলাম না গো! হামার বুলুর উপর গজব পড়ে কিসক গো? বুলু অপঘাতত মরে কিসক গো?'–এর জবাব দেওয়া মোবারক আলির সাধ্যের বাইরে। বুলুর মায়ের এই বিলাপময় প্রশ্নের খাঁড়া থেকে ঘাড় বাঁচাবার জন্য এক্ষুনি তার বাইরে পালানো দরকার। কিন্তু দরজার

ফাঁক দিয়ে বোঝা যায়, ফর্সা হতে এখনো বাকি। অন্ধকারে বাইরে বেরুলেই গুলি করে দেবে। ১০/১২ দিন আগে সরকারবাড়ির এক বর্গাদার চাষা পিঠে গুলি খেয়ে মরলো পানধোয়া বিলের ধারে। বিলের কাছে তহসিন সরকারের নাবা জমিতে লোকটা ঘর করে থাকে, তহসিন সরকারের জমিতেই বর্গা চাষ করে। রাত্রে বিলের ধারে পায়খানা করতে বসেছিলো, হাইস্কুলের ক্যাম্প থেকে গুলি করা হয়। পেটে গুলি লেগে লোকটা সঙ্গে সঙ্গে শেষ। তারপর হাই স্কুলের দপ্তরি নজীবুল্লার পিঠে গুলি লাগলো, সেও রাত্রেই। নজীবুল্লা গিয়েছিলো বেলকুচি হাটে। মিলিটারি ক্যাম্প হওয়ায় এদিককার হাটবাজার সব লাটে ওঠার অবস্থা,–গত বছরের সের পাঁচেক মরিচ ছিলো, তাই বিক্রি করতে নজীবুল্লার বেলকুচি যাওয়া। ফিরতে একটু রাত হয়েছিলো, রাত আর কতো, এই এশার আজান কি দেয়নি, স্কুলের সামনে দিয়ে সে হনহন করে হেঁটে যাচ্ছে তো মিলিটারি তাকে হুঙ্কার দিয়ে থামতে বলে। নজীবুল্লা থামবে কি, পড়িমরি করে দৌড় দেয় সামনের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে গুলি এসে লাগে তার পিঠে। মনে হয় গুলি লাগার পরেও লোকটা দৌড়েছিলো, তার লাশ পাওয়া যায় আমিনুদ্দিন সরকারের বাঁশঝাড়ের ভেতর। আমিনুদ্দিন সরকারের ভাইপো তবারক, লাঠিডাঙার আয়নুল, পদুমশহরের হাশেম মণ্ডল, হাই স্কুলের অঙ্ক স্যার নুর মোহাম্মদ–এদের মারা হয়েছে লাইনে দাঁড় করিয়ে, স্কুল দালানের পেছনে, ছোটো ক্লাসের ছেলেরা যেখানে দাড়িয়াবান্ধা, গোল্লাছুট, হাডুডু খেলতো সেখানে এদের পুঁতে রাখা হয়েছে। বিলের ধারে লাশ, বাঁশঝাড়ে লাশ, স্কুলের পেছনে লাশ,–তাইতো একটা মাস যতোগুলো মানুষ পড়লো সব কটা গুলি খেয়ে মরেছে।–সব্বাই! তাই তো!–সকলের অপঘাতে মৃত্যু! এমন কি পুব অঞ্চলে বিয়ে হয়েছে তার খালাতো বোন আমেনাবুবুর, সে মেলা দূর, যমুনার তীরে কেষটিয়া গ্রাম, প্রত্যেক বছর বর্ষাকাল আসে তারা নদীভাঙার ভয়ে তটস্থ হয়ে ওঠে; এবার এসেছে নদীর বাপ মিলিটারি। আমেনাবুবুর দেওরের ছেলে আলি আকবর, চন্দনবাইসা কলেজে আই কম পড়ে, তাকে গুলি করে ফেলে দিয়েছে যমুনায়। চন্দনবাইসা তহশিলদার অফিসে মিলিটারি ক্যাম্পের সামনে ছেলেটা ধরা পড়ে, তার কাছে অস্ত্র পাওয়া গিয়েছিলো। আহা, বেচারা বংশের একমাত্র ছেলে, ঐ বাড়িতে আর সবকটা মেয়ে, ছেলেটাকে খুব কষ্ট দিয়ে মেরেছে। না, না, বুলুকে কিন্তু কষ্ট দেওয়ার সুযোগ পায়নি। ধরা পড়ার আগেই ও গুলি খায়।–সেই অজ্ঞাত জায়গার অশ্রুত গুলির শব্দে মাথাটা দুলে ওঠে, হঠাৎ মনে হয়, তাইতো, কয়েক মাস এই এলাকায়, এমন কি কোন পুব অঞ্চলে কেষটিয়া গ্রাম, সেখানে পর্যন্ত–সবাই মারা গেছে গুলি খেয়ে। সব অপঘাতে মৃত্যু, স্বাভাবিকভাবে লোকে মরে না, গজব, আল্লার গজব, গজব না পড়লে মানুষের এরকম মৃত্যু হয়?–চেয়ারম্যানের ভাগ্য!–তার ছেলেরই এমন স্বাভাবিক মরণ। এসব ভাগ্যের ব্যাপার! চেয়ারম্যান লোকটার সবদিকেই ভাগ্য ভালো, তার জমিতে ফসল হয় সবচেয়ে ভালো, যেবার যা বোনে সেবার তাতেই লাভ থাকে। ধান বলো, মরিচ বলো, পেঁয়াজ বলো, আলু বলো–চেয়ারম্যানের জমিতে যার ফলন ভালো সেই ফসলের সেবার দাম উঠবে। আবার দ্যাখো না, তিন তিনবার ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হলো, ইলেকশনে লোকটা কখনো হারে না। একমাত্র ছেলে, ছাত্র কতো ভালো, গত কয়েক বৎসর এই-স্কুল থেকে তার মতো রেজাল্ট কেউ করতে পারেনি। আবার দ্যাখো সবাই যখন এদিক ওদিকে মরছে, চেয়ারম্যানের ছেলে তখন মায়ের কোলে দোল খেতে খেতে চোখ বোজে। এটা ভাগ্য ছাড়া কী?–দীর্ঘনিশ্বাস চাপার জন্য মোবারক আলি একটু কাশে। আর বুলু–কী সুন্দর ছেলে তার, কী রকম ঢ্যাঙা হয়ে উঠছিলো, তাই না?–মাথায়

মোবারক আলিকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলো, ও ঠিক ওর দাদার মতো হতো,–সেই ছেলে, দিব্যি ভালো ছেলে, বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলো, ৪ মাস পর খবর এলো যে সে গুলি খেয়ে মারা গেছে। কোথায়? না, সে এখান থেকে মেলা দূর! একই জেলা, তবে সে হলো পুবের পলি এলাকা। হ্যাঁ, আমেনাবুর শ্বশুর বাড়ির কাছেই হবে। গ্রামের নাম তার জানা নাই।

দেড় মাস আগে বুলুর মরার খবর পেয়ে মোবারক ভেবেছিলো যে বৌয়ের কাছে খবরটা একেবারে চেপে যাবে। তো শোনার পর কয়েকটা ঘণ্টা সে চুপ করেই ছিলো, তাও যে ছেলেটি খবর নিয়ে এসেছিলো তার বিশেষ অনুরোধে। অনুরোধ না বলে আদেশ বলাই ঠিক, যাদের হাতে অস্ত্র থাকে তারা কি অনুরোধ করতে পারে? ছেলেটার নাম যেন কী?–না, নামটা মনে না করাই ভালো, বাড়ির কাছে মিলিটারি ক্যাম্প, কখন কে এসে ধমক দিলেই মোবারক আলি তার নাম ফাঁস করে দেবে। নাম মনে না থাকলে কী হয়, তার চেহারা প্রায় ২৪ ঘণ্টাই মোবারকের সামনে দোলে। ঘন কালো মেঘের সামনে শ্যামবর্ণ একখানা মুখ। ও যখন আসে তখন বিকালবেলা। খুব মেঘ করায় অন্ধকার হয়ে এসেছিলো। মোবারক হাট থেকে ফিরছিলো পা চালিয়ে। এদিকে, এই ৫/৬/৭ মাইলের মধ্যে মিলিটারি ক্যাম্প তখনো হয়নি, তাই আকাশে জমাট মেঘ ছাড়া জোরে হাঁটার অন্য কোনো কারণ ছিলো না। ছেলেটিকে সে প্রথম দ্যাখে, বড়োমিয়ার আউশের জমির পাশে সাইকেল ঠেলে ঠেলে নালা পার হচ্ছিলো। তারপর সাইকেলে উঠে ছেলেটি তাদের গ্রামের দিকে চলে যায়। পাকুড় গাছের তলায় এসে রাস্তা হঠাৎ বাঁক নিয়েছে, ছেলেটি সেখান থেকে আড়াল হয়ে পড়লো। তার দিকে মোবারক আলি ভালো করে লক্ষও করেনি। হাটে শুনে এসেছে যে সেরপুর শহরে মিলিটারি ঢুকে বাড়িঘর তছনছ করে ফেলছে। তারপর বগুড়ার নাকি মিলিটারির বিরাট আড্ডা। মানুষের লাশের গন্ধে নাকি টাউনে ঢোকা যায় না। আবার এরই মধ্যে কোন এক বড়ো মিলিটারি অফিসারকে মেরে ফেলেছে কারা। বর্ডারে জোর যুদ্ধ চলছে। এবার পাটের দর বাড়তে পারে। হাঁটের ভেতরেই লোকজন ফিসফিস করে এইসব আলোচনা করে। মোবারক আলি ইউনিয়ন কাউন্সিল অফিসের সামনে এসে পড়ে, না সাইকেলের তখন চিহ্নমাত্র দ্যাখা যায়নি। অফিসের পাকা বারান্দায় উঠে মোবারক অফিস ঘরের তালা দুটো একবার করে টেনে দ্যাখে। না, ঠিক আছে। এ পর্যন্ত ভুল তো কোনোদিন হলো না, তবু যতবার এদিক দিয়ে যাবে,–তা সে জমি দেখতে হোক কি হাটে বাজের হোক বা বিলে মাছ ধরতে হোক–বারান্দায় উঠে তালা দুটো তার পরীক্ষা করা চাই। বারান্দায় দাঁড়িয়ে সে একবার আকাশের দিকে মেঘের ভারটা ঠাহর করার চেষ্টা করলো। না, তাড়াতাড়ি বাড়ি যাওয়া দরকার। বারান্দা থেকে নিচে নামছে এমন সময় অফিসের পেছন থেকে এসে ওর মুখোমুখি দাঁড়ালো শুকলু পরামানিক। শুকলুকে দেখে মোবারক ভ্রু কোঁচকায় : এইসব চাষাভুষাদের মানুষ করা তার বাপের সাধ্যের বাইরে। এতোবার বারণ করা হয় তবু শালাদের হাগামোতা সব এই অফিসের পেছনে। চেয়ারম্যান সাহেব এতো সখ করে শেফালির চারা লাগিয়েছে, তা এদের গুয়ের গন্ধে ওদিকে উঁকি দেওয়া যায় না। কিন্তু তাকে ধমক দেওয়ার আগেই শুকলু বলে, 'চাচামিয়া, একটা চ্যাংড়া আপনের ঠিকানা পুস করিচ্ছিলো। সাইকেল লিয়া আচ্চে।'

'কেটা'

'কে জানে বাপু? হামি পুস করনু তো ক'লো বুলুর সাথে কলেজত পড়ে। হামাগোরে ইঠানকার

মানুষ লয় গো চাচামিয়া। হামি এক লজর দেখ্যাই বুঝিছি টাউনের মানুষ।'

'নাম পুস করিছিস?'

'ক্যাঙ্কা কর্যা করি? এ্যানা কথা কঁতে না কতে সাইকোলোত উঠ্যা তাঁই হাঁটা দিলো।'

বুলুর ক্লাসমেট? মোবারক আলি যতো তাড়াতাড়ি পারে ছুটতে লাগলো। আজ ৪ মাস বুলুর দ্যাখা নাই। মার্চের মাঝামাঝি বাড়ি এলো। এখানেও তখন খুব তোড়জোড়। রাস্তায়, হাটে, বাজারে, পুকুর ধারে খালি মিছিল। গাঁও-গেরামে এতো মানুষ কোনোদিন দ্যাখা যায় নাই। মানুষ যেন ফুলে ফেঁপে উঠছিলো। মানুষ হয়তো ২০টা কি ৩০টা, কিন্তু ওদের চিতানো বুক দেখে মনে হয় একেকজনের গায়ে ১০ মানুষের বল। বুলুর খাওয়া নাই, গোসল নাই, খালি এ-গ্রাম ও-গ্রাম করে, জোয়ান জোয়ান ছেলেদের নিয়ে প্যারেড করে, এইসব কালোকিষ্টি চাষাভুষা রাখালদের নিয়ে সে যেন জগৎ জয় করবে। ছেলেটা হঠাৎ ঢ্যাঙা হয়ে গেছে। শহরে দূর সম্পর্কের মামাবাড়িতে থাকে, কী খায়, কী পরে–অথচ দেখতে দেখতে তাগড়া জোয়ান হয়ে গেলো। মার্চের শেষে ঢাকায় মিলিটারিরা মানুষ মারতে শুরু করলো, আর বগুড়া থেকে শুরু হলো মানুষ আসা। বগুড়ায় মিলটারিকে ঢুকতে দিচ্ছে না, শহরের উত্তরদিকে ব্যাংকের দালানের ওপর পজিশন নিয়ে ছেলেরা ফাইট করে যাচ্ছে। চেয়ারম্যান একদিন এসে অভিযোগ করে, 'মোবারক মিয়া, বুলু এই গোলমালের মধ্যে যাচ্ছে, আপনে শাসন করিচ্ছেন না? আবার শাজাহানকে খালি খালি চেতাচ্ছে, শাজাহান স্কলার ছাত্র, অর কি ইগলান করা মানায়, কন?' তারপর আস্তে আস্তে বলে, 'কী পাগলামি শুরু করিছে, কন তো! চ্যাংড়াপ্যাংড়ার মাথার মধ্যে পোকা ঢুকিছে! গাদাবন্দুক আর দাও কুড়াল খন্তা লিয়া মিলিটারির সাথে যুদ্ধ করবি, এ্যাঁ?' মোবারক আলিও এসব বোঝে। কিন্তু বুলুকে বোঝাবার আগেই সে একদিন উধাও হয়ে গেলো। ৪ দিন যায় ৫ দিন যায় তার পাত্তা নাই। খবর আসে যে বগুড়ায় মিলিটারি ঢুকে বাড়িঘর সব পুড়িয়ে দিচ্ছে। সেখান থেকে মানুষের ঢল আসে, এই গ্রামের ভেতর দিয়ে মানুষ যায়, বেশিরভাগই ভদ্দরলোক। তাদের কী সুন্দর সুন্দর মেয়ে! চশমা চোখে জুতা পায়ে হাঁটে। জীবনে গ্রামে আসেনি, তারা হাঁটতে হাঁটতে টলে, টলতে টলতে পড়ে যায়। সেরপুর থেকে মানুষ পালালো। এমন কি ব্যাংক ভেঙে টাকা নিয়ে নেতারা পর্যন্ত এই পথ দিয়ে বর্ডারের দিকে চলে গেলো। সেই টাকা দিয়ে তারা দেশ স্বাধীন করবে। কিন্তু বুলুর দ্যাখা নাই।–বাড়ির দিকে যেতে যেতে মোবারকের বুক টিপটিপ করে। বয়স তো হলো, এখন কি অমনি করে ছোটা যায়? সাইকেলওয়ালা ছেলেটি হয়তো বুলুও হতে পারে। ছদ্মবেশ ধরে এসেছে। শুকলু হয়তো চিনতে পারেনি। এরকম হতে পারে না?–না।–এরকম যে হয়নি সেই ক্ষোভ মোবারকের আজও কাটেনি। ছদ্মবেশী বুলুকে দ্যাখার আশাভঙ্গের দৃশ্যটি সে তাই মুছে ফেলতে চায়। শুকলু পরামাণিকের কথাবার্তা বরং আরেকবার শোনা যায় না? না, তাও যায় না। এর সপ্তাহ দুয়েক পর গ্রামে যখন মিলিটারি ঢোকে,শুকলু তখন বড়োমিয়ার জমিতে কাদামাটিতে উপুড় হয়ে বীজতলা থেকে ধানের চারা তুলছে। জিপের আওয়াজে সে চমকে উঠে দাঁড়ায়। তার হাতে ১ আঁটি কলাপাতাসবুজ ধানগাছের চারা এবং চোখে বোকাবোকা ভয়। মিলিটারি সোজা গুলি করে তার পেটে।–মিলিটারি কি বুলুরও পেটেই গুলি চালিয়েছিলো?–অন্ধকার ঘরে নাতিকে নিয়ে শুয়ে-থাকা স্ত্রীর পাশে বসে মোবারক আলি নিজের পেটে আস্তে আস্তে হাত বুলায়। পেটের বাঁ কোণ তার বহুদিনের একটা চিনচিন ব্যথা ছিলো, আজ মাস তিনেক হলো সেটা বোঝা যায় না। নিজের পেটে গুলিবারুদ পেতে নিয়ে বুলু কি তার পেটের ব্যাথা চিরকালে জন্য শুষে নিয়ে গেছে? মোবারকের মনেই থাকে না যে সাইকেলওয়ালা ছেলেটি বুলুর মৃত্যুর যে বিবরণ দিয়েছে তাতে পেটে গুলি লাগার কোনো কথা নাই। হয়তো একটু পরেই সেটা তার মনে পড়তো, কিন্তু ফের প্যান প্যান করতে শুরু করে বুলুর মা, 'একবার চোখের দ্যাখাটাও দেখবার পারনু না গো! কোটে কোন পাথরের মধ্যে একলা একলা দাপাদাপি কর্যা মরলো, মুখোত এ্যানা পানিও পালো না গো! হামার ব্যাটার উপরে ইঙ্কা গজব কিসক পড়লো গো? আল্লার বিচার ক্যাঙ্কা কও তো? তার মাটিও হয় না, কোটে কোন কাদোর মধ্যে পড়্যা থাকে, কও তো।

'থামো!' মোবারক আলি ভয় পায় যে বুলুর মা এবার চ্যাঁচাতে শুরু করবে, 'থামো! মাটি হয় নাই তোমাকে ক'ছে?'

'তুমি একবার দেখবার গেলা না কিসক?' বুলুর মা রাগ করে, 'তুমি যায়া তার কবর জিয়ারত কর্যা আসলা না কিসক! অপাঘাতত মরছে, তো তাঁই কি তোমার ব্যাটা লয়? পাষাণ বাপ হছো, ব্যাটা তোমার লিজের পয়দা লয়?'–রাগ করতে চাইলেও বুলুর মা রাগ টিকিয়ে রাখতে পারে না। রাগ তার মুখ থুবড়ে পড়ে শোকে, শোকে এবং ভয়ে, নাতির ঘুম ভাঙার ঝুকি থাকা সত্ত্বেও মোবারকের উরুর ওপর ১টি রোগা কালো হাত রেখে সে ফোঁপায়, 'হামরা কী গুনা করছিলাম গো, হামাগোর উপরে গজব পড়ে কিসক? হামাগোর ব্যাটা অপঘাতত মরে কিসক গো? মোবারক আলি ভয় পায়। ছাদের ফুটো দিয়ে বাঁশের সিলিং ফুঁড়ে ঘরে আলো ঢুকছে। মোবারক জানলা খুলে দেয়, ভোরবেলার লালচে সাদা আলোয় আকাশ, গাছপালা ও মাটি যেন স্বপ্নের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসছে। ঝিরঝিরে বাতাস ঢুকে মশারি কাঁপায়। জোহরার ছেলেটা হাত পা ছাড়িয়ে ঘুমায়, বাতাসের ঝাপ্টায় ঘুম গাঢ় হয়।

মোবারকের একটু ভয় হলো, তার বোধ হয় দেরি হয়ে গেলো। চেয়ারম্যানের বাড়িতে এর মধ্যেই মেলা লোক এসে পড়েছে। বাইরে আমতলায় হাঁটু ভেঙে মাটিতে বসেছিলো কাবেজউদ্দিন। এদের বাড়ির পুরনো কাজের লোক, বড়ো হয়ে গেছে, দুটো চোখেই ছানি পড়তে শুরু করছে, একটু কাছে না এলে লোক চিনতে তার কষ্ট হয়। মোবারক তার পাশে দাঁড়িয়ে জিগ্যেস করে, 'কাবেজ, চেয়ারম্যান সাহেব কৈ?' 'তাঁই না আপনাকে উটকাচ্ছিলো!' চেয়ারম্যান তাকে খুঁজছিলো শুনে মোবারক আলি ঘাবড়ে যায়, তার আরো আগে, আসা উচিত ছিলো। শুকনা গলা করে ফের জিগ্যেস করে,'সমাচার কী?' 'ফজরের আগে আন্ধার থাকতে মিলিটারি খবর দিয়া চিয়ারম্যানোক লিয়া গেছিলো। তাঁই কলো, মোবারক মিয়া থাকলে একসাথে গেলামনি।'

দ্যাখা হলে চেয়ারম্যান কিন্তু এসব কিছুই বলে না। মোবারক আলিকে জড়িয়ে ধরে লোকটা হঠাৎ বেগে কাঁদতে শুরু করে। তাকে নিয়ে মোবারক ভেতরের বারান্দায় কোণে জলচৌকিতে বসায়, নিজেও পাশে বসে। কিছুক্ষণের মধ্যেই চেয়ারম্যান চোখ মোছে, সে আবার স্বভাবে ফেরার চেষ্টা করে। আস্তে আস্তে বলে, 'মোবারক মিয়া, সাজু তামায় রাত খালি বুলুর কথাই ক'ছে। রাত আটটা সাড়ে আটটার সময় প্রলাপ শুরু হলো যতোক্ষণ প্রাণ ছিলো খালি বুলুর কথা কয়।' যে জলচৌকিতে তারা বসেছিলো তার সঙ্গেই চেয়ারম্যানের শোবার ঘরের দরজা।

সেই ঘর থেকে চেয়ারম্যানের স্ত্রীর কান্নার শব্দ আসছিলো। স্বামীর কথা কানে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার বিলাপে সে ছেলের শেষ কথাগুলো যোগ করে, 'খালি বুলু, খালি বুলু! তামাম রাত খালি বুলুকই ডাকে, খালি বুলুকই ডাকে। বুলুর সাথে চল্যা যামু,– বুলুক কও আমাক না লিয়া যেন যায় না। ও মা, বুলুক আঁটকাও, আমাক ছাড়া উঁই গেলো।'

মোবারকের মাথা দুলে ওঠে। এই দুলুনি সারা শরীরে চালান হয়ে গেলে সে বেশ চাঙা হয়। এতোটাই চাঙা যে শাজাহান বুলুর সঙ্গে কোথায় যেতে চেয়েছিলো জানার জন্য প্রবল আগ্রহ বোধ করে। চেয়ারম্যানের বৌ এবং এই বাড়ির এক পুরনো দাসী মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত শাজাহান যা কিছু প্রলাপ বকেছে তার সবই অত্যন্ত এলোমেলোভাবে উদ্ধৃত করে চলে। শাজাহান তার বাবা মা, ভাই, বোন কারো সঙ্গে কথা বলতে চায়নি। এক ঢোঁক পানি খাবার জন্য এদিকে ওদিক তাকায়নি। একবারও বলেনি, মা, আমার মাথাটা টিপে দাও না। মউত এলে মানুষ আজরাইলকে দেখে ভয়ে চোখ বড়ো করে ফেলে, কিন্তু শাজাহানের চোখ খালি অস্থির হয়ে এদিক ওদিক ঘুরছিলো বুলুর খোঁজে; তার শুধু এক কথা, বুলুকে ডাকো, আমি বুলুর সঙ্গে যাবো। চেয়ারম্যানের বৌ জানায় যে এইসব শুনেই বুকের মধ্যে সে সঙ্কেত পেয়েছে, তার শাজাহান বাঁচবে না।–স্ত্রীর এইসব বিলাপে চেয়ারম্যান উসখুস করে, পুত্রবিয়োগ তার বিবেচনাবোধ বিনাশ করতে পারেনি। সে এখনো ভালোভাবে জানে যে, বৌডোবা খালের ব্রিজে মিলিটারি জিপ উড়িয়ে দেওয়ার পর পরই বুলুর নিহত হওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়লে মোবারক তো মোবারক, এই গ্রামে ১টি মানুষকেও আস্ত রাখা হবে না। চেয়ারম্যান এ পর্যন্ত খবরটা গোপন রেখেছে, কিন্তু বৌকে কোন কথাটা না বলে থাকা যায়? এখন বৌকে চেয়ারম্যান থামায় কী করে? বাড়ির পাশে মিলিটারি, তাদের কানে খবরটা গেলে গ্রামে কেয়ামত ঠেকাবে কে?–কিন্তু মোবারক আলির রক্তমাংসহাড্ডিমজ্জা সব তোলপাড় করে ওঠে, বুলুর সঙ্গে বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে শাজাহান তাহলে অস্থির হয়ে উঠেছিলো! শাজাহান আর কী বলেছিলো?–কিন্তু সে সব বিস্তারিত জানার উপায় নাই। কারণ চেয়ারম্যানের বৌয়ের বিলাপ এখন চাপা পড়েছে বুলুর মায়ের হামলানো কান্নায়। এই বারান্দারই অন্যপ্রান্তে শাজাহানের লাশ। লাশের মুখ থেকে কাপড় সরাতেই বুলুর মা চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করে। তার কান্না বাজে সমস্ত আওয়াজ ছাপিয়ে। এর ফলে মেয়েদের মধ্যে যাদের কান্না নিস্তেজ হয়ে এসেছিলো তারা ফের নতুন করে কাঁদতে থাকে। মোবারক আলি উঠে লাশের দিকে চলে যায়। না, বৌকে থামাবার কোনোরকম ইচ্ছা তার নাই। কাঁদবার এরকম সুযোগ বুলুল মায়ের কতোদিন জোটেনি, আবার কবে জোটে কে জানে। যতো খুশি সে কেঁদে নিক, মোবারক তাকে একটুও বাধা দেবে না। তার নিজের চোখ একেবারে খটখটে, সেই পরিষ্কার শুকনা চোখে সে শুধু শাজাহানকে একবার ভালো করে দেখবে।

মরার পরও শাজাহানের ভ্রূর মাঝখানে ছোট্টো একটা ভাঁজ। সামনের দুটি দাঁত দিয়ে চেপে ধরেছে নিচের পাতলা ঠোঁট। বুলুর সঙ্গে বৌডোবা খালের ব্রিজে গ্রেনেড মারার সুযোগ না পাওয়ার ক্ষোভ কি এখনো ভ্রূতে, গালে, দাঁতে ও ঠোঁটে বিঁধে রয়েছে? বুলুর সঙ্গে এর চেহারার কোনো মিল নাই–বুলু শ্যামবর্ণের, এর গায়ের রঙ ফর্সা; বুলুর গাল ভাঙা, কয়েক দিনের জ্বরে মলিন হলেও শাজাহানের গালের ফোলা ফোলা ভাবটা রয়েই গেছে। মিলিটারি জিপ উল্টিয়ে দেওয়ায় বুলু হয়তো এরকম অসন্তুষ্ট মুখ করে মরেনি। কে জানে, শাজাহানের বুকে হয়তো

গুলির দাগ ২/১টা লেগে থাকতে পারে। গুলিটা তো বুলুর বুকেই বিঁধেছিলো। সাইকেলওয়ালা ছেলেটি তো তাই বলে গেছে।–সন্ধ্যার পর পরই সেদিন খুব চেপে বৃষ্টি আসে। এমনি অন্ধকার, তার ওপর দেওয়ালের মতো বৃষ্টি। ছেলেটির বাইরে যাওয়ার উপায় ছিলো না। সেই রাত্রেই তার চলে যাওয়ার কথা, বৃষ্টিতে আটকে না পড়লে হয়তো এতো কথা বলতো না। ওরা সব কজের ছেলে, নিহত বন্ধুর বাপের সঙ্গে এতো কথা বলার সময় কোথায়? ছেলেটি এদিকে এসেছিলো ভবানীহাট গ্রামে, এখান থেকে মাইল দুয়েক পথ। কী কাজে আসে তা একবারো বললো না, খালি বলে ওদিকে ওদের লোক আছে। ফেরার সময় তার মনে হয় যে সুলতানদের গ্রাম তো এদিকেই, একবার ওর বাবার সঙ্গে দ্যাখা করে যাবে। সুলতান হলো বুলুর ভালো নাম, ওর কলেজে এই নামেই বুলু পরিচিত। সাইকেলওয়ালা ছেলেটি ওর এক ক্লাস ওপরে পড়ে, বগুড়া শহর মিলিটারিদের কব্জায় চলে গেলে ওরা একসঙ্গে পূর্বদিকের গ্রামে পালায়। ছেলেটি অনেকক্ষণ পর পর কথা বলছিলো, প্রথমদিকে খুব রেখেঢেকে, খুব সাবধানে। পরে আস্তে আস্তে সব বলে ফেলে। বুলুর মৃত্যুর সময় ওদের আরেক বন্ধুর সঙ্গে এই ছেলেটিও ছিলো। জায়গাটার নাম?–এখান থেকে সেরপুর গিয়ে সেরপুর হাটের ওখানে করতোয়া পার হয়ে যেতে হয়। ওসব জায়গা মোবারক আলি চেনে। তারপর? তারপর চওড়া কাঁচা রাস্তা চলে গেছে একেবারে যমুনার পশ্চিম তীর পর্যন্ত। যমুনার কাছাকাছি, যমুনা থেকে সোয়া মাইল কি দেড় মাইল হবে, সেখানে বৌডোবা খাল। তারপর? ধূনট বাজারে মিলিটারির ক্যাম্প বসেছে। ধূনট-থেকে আরো অনেকটা পূর্বে দেবডাঙা গ্রাম। দেবডাঙায় মুক্তিবাহিনী তখন কেবল এসে জমা হচ্ছে। ঐ গ্রামের এক দালাল শালা ধূনটে গিয়ে খবরটা পৌঁছে দেয় মিলিটারি ক্যাম্পে। তা ওরাও খবর পেয়ে যায় যে মিলিটারি এদিকে আসছে। ধূনট দেবডাঙা রাস্তায়, দেবডাঙার একেবারে কাছে বৌডোবা খাল। রাস্তা আড়াআড়ি চলে গেছে। এই খালের ওপর ছোট্টো পাকা ব্রিজ। ওরা ৩ জন মাইন পুঁততে যায় ব্রিজের নিচে। মাইন পোঁতার কাজ শুরু করবে এমন সময় জিপের আওয়াজ। জিপ যে এতো তাড়াতাড়ি আসবে ওরা ভাবেনি। সঙ্গে সঙ্গে ৩ জনেই নেমে পড়ে রাস্তার ধারে। নিচু জমি, ঘন পাটখেতে মানুষ সমান পাট। পাটখেতে ঢুকে নিশ্বাস বন্ধ করে ৩ জনেই জিপের অপেক্ষা করে। এই ব্রিজ পর্যন্ত রাস্তা খারাপ, ব্রিজ কোনোমতে পার হলেই কয়েক মিনিটের মধ্যে দেবডাঙা। মুক্তিবাহিনীর ছেলেগুলো একটু তৈরি হবার সময় পাবে না। উঁচুনিচু রাস্তায় টলোমলো চাকায় জিপ যখন ব্রিজের ওপর উঠেছে, বুলু করলো কি, পাটখেত থেকে হঠাৎ করে বেরিয়ে গ্রেনেড ছুড়ে দিলো জিপ লক্ষ করে। অব্যর্থ লক্ষ। ড্রাইভারের পাশে বসা অফিসার একেবারে সঙ্গে সঙ্গে ব্রিজ ডিঙিয়ে নিচে পড়ে যায়। নিচে বৌডোবার খালে তখন ৫ হাত পানি। ডাইভার সামলাতে না পারায় গাড়ি গড়িয়ে পড়ে ব্রিজের একটু আগে রাস্তার ঢালুতে, সেখান থেকে গড়াতে গড়াতে ফের খালের মুখে আটকে গেলো। বুলু এবং সেই ছেলেটি তখন দৌড়ে যায় জিপের দিকে, রাস্তার অন্য ঢালে জিপ, সুতরাং রাস্তা ক্রস করা দরকার। ওদের এখন অস্ত্র চাই। স্টেনগান মেশিনগান তখনো ওরা চোখে দ্যাখেনি, এই থানা টানা থেকে ছিনিয়ে-নেওয়া থ্রি নট থ্রি, গাদাবন্দুক এবং দুদিন আগে পাওয়া ককেটা গ্রেনেড ওদের সম্বল। কিন্তু জিপ থেকে এক সেপাই যে আগেই লাফিয়ে পড়েছে তা বোঝা যায়নি। ওদের দুজনকে রাস্তায় উঠতে দেখে লোকটা গুলি ছোড়ে রাস্তার ঢাল থেকে। দুটো গুলিই লাগে বুলুর বুকে। লোকটা তারপর সোজা ছুটতে থাকে ধূনটের দিকে। কিন্তু বুলুর সঙ্গীদের রাইফেলের গুলি সে এড়াতে পারেনি। তার পায়ে গুলি লাগে, কিন্তু সে তখন অনেকটা

এগিয়ে গেছে। আহত সেপাইকে ওরা ধরতে যাবে কি-না ঠিক বুঝতে পারছে না, এমন সময় ফের মিলিটরি গাড়ির শব্দ আসে। ওদের দুজনকে ফের ঢুকতে হয় পাটখেতের ভেতর। আহত সেপাইটিকে হয়তো একটি গাড়ি ঠিক তুলে নিয়েছে। তবে গাড়িগুলো ব্রিজের এখানে এসে এক পলকের জন্যেও গতি কমায়নি। কিছুক্ষণ পর দেবডাঙার দিক থেকে পাল্টাপাল্টি গুলিবর্ষণের শব্দ আসে, প্রায় মিনিট ১৫ ধরে ক্রস-ফায়ারিং চলে। এরপর দারুণ নীরবতা। আরো কয়েক মিনিট পর সেদিকে আগুনের মস্ত শিখা চোখে পড়ে। এর সঙ্গে সাংঘাতিক কোলাহল ও আর্তস্বর। গ্রামের লোকজনকে পালাতে হয় যমুনার দিকে, নয়তো মাঠ পার হয়ে তারা এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ে। রাস্তাটি কেউ ব্যবহার করতে পারেনি, রাস্তার মুখে কড়া মিলিটারি। বুলুর সঙ্গী দুজন সারারাত এবং পরদিন বিকাল পর্যন্ত পাঠখেতেই ছিলো। এর মধ্যে মিলিটারি জিপ জিপ বেশ কয়েকবার রাস্তা দিয়ে ধূনট-দেবডাঙা করে।

'বুলুর লাশ?'

ছেলেটি মাথা নিচু করে ছিলো!–না, না, তাকে বিব্রত করতে চায়নি মোবারক, এমনি জিগ্যেস করেছিলো। বুকে গুলি লেগেছিলো–হ্যাঁ, দুটো গুলি। বুলু তখনো রাস্তায় সম্পূর্ণ ওঠেনি, রাস্তার অন্য ঢাল থেকে গুলি ছোড়া হয় বলে তারা কেউ সাবধান হতে পারেনি। বিপরীত ঢালে সে পড়ে যায়!–চিৎ হয়ে–?–হ্যাঁ, চিৎ হয়ে। তার মাথা ছিলো নিচের দিকে, শরীরটা ওপরের দিকে।–খালের পানিতে মাথা ডুবে যায়নি?–চুলগুলো পানি ছুঁয়েছিলো।–তারপর ছেলেটা এ সম্পর্কে আর তেমন কিছু বলেনি। গুলি দুটো ঠিক কোথায় ঢোকে?–না, সে কিছুই না বলে উঠে পড়ে। বৃষ্টি তখন ধরে এসেছে, অন্ধকার ও টিপটিপ বৃষ্টির মধ্যে সে সাইকেলের প্যাডেলে পা রাখে। এখন শাজাহানের লাশের সামনে দাঁড়িয়ে তার বুকটা এক নজর দ্যাখার জন্য মোবারক আলির চোখজোড়া নিসপিস করে।

সে নিজেও ঠিক জানে না কেন, হয়তো এই উদ্দেশ্য কিংবা এমনি প্রতিবেশীসুলভ সৌজন্যের খাতিরে বা ওপরওয়ালা চেয়ারম্যানের মন যোগাবার জন্য বা ছেলের সহপাঠীর প্রতি ভলোবাসা–যে কোনো কারণে মোবারক আলি এগিয়ে যায় উঠানে চাদরঘেরা জায়গায়। সেখানে তখন শাজাহানের লাশ ধোয়ানো হচ্ছে। কাবেজ খুব যত্ন করে সাবান মাখায় আর বিড়বিড় করে, 'ছোট থাকতে বড়া দিঘিত নিয়া কতো গোসল কর‍্যা দিছি, কী দাপাদাপি করিছে। এখন তাঁই একটা কথাও কচ্ছে না গো!'

নাঃ! শাজাহানের মৃতদেহে কোথাও গুলির একটি চিহ্ন পর্যন্ত নাই। ব্যাপারটা মোবারক আলির এতো স্পষ্ট করে মনে হয়নি! কিন্তু তার নিজের চোখ জোড়া বড্ডো পরিষ্কার ঠেকে। বুলুকেও ভালোভাবে দ্যাখা যায়, শাজাহানকেও দ্যাখা যায়। বুলু এবং শাজাহান সম্পূর্ণ আলাদা ২ জন যুবক। চোখের মাধ্যমে সে মাথার জট খুলতে থাকে এবং শাজাহানের শেষকৃত্যের দায়িত্ব এসে পড়ে প্রধানত তার ওপরই। চেয়ারম্যান তাকেই বলে যে একটু তাড়াতাড়ি করা দরকার, ভোর হবার আগেই স্কুল দালান থেকেই ক্যাপ্টেন সাহেব তাকে ডেকে পাঠিয়েছিলো–এতো চ্যাঁচামেচি কিসের? মিসক্রিয়েন্টরা কি তার বাড়ি এ্যাটাক করলো?–না, তার ছেলে মারা গেছে।–তাহলে যতো তাড়াতাড়ি পারে, এই ২/৩ ঘন্টার মধ্যেই যেন তার দাফন করা হয়। দরকার হলে তার ট্রুপ তাকে সাহায্য করবে।–সাহায্য-প্রস্তাব অনেক কষ্টে এড়ানো গেছে, এখন দেরি হলে আবার ট্রুপ যদি চলে আসে! বাড়িতে বৌ-ঝিরা আছে।

জুম্মাঘরে জানাজা হয়ে গেলো বেলা সাড়ে ১০টার মধ্যে। এদের পারিবারিক গোরস্থানটা বাড়ি থেকে একটু দূরে, ৪০০/৪৫০ গজ পথ পার হয়ে যেতে হয়। কিন্তু ইউনিয়ন কাউন্সিলের সামনে কয়েকজন সেপাই পথ রোধ করে দাঁড়ালো। এতো লোক একসঙ্গে কোথায় যাচ্ছে?–চেয়ারম্যান ছিলো মোবারকের পাশে, মোবারকের ডান কাঁধে খাটিয়ার একটা কোণ। মোবারক গলা খাঁকারি দিয়ে বলে, 'লাশ হ্যায়, খান সাব। চেয়ারম্যান সাহেবের লড়কা।'

তাদের ক্যাম্পের সামনে দিয়ে এতোগুলো মানুষের একসঙ্গে যাওয়া নিষেধ। জুম্মাঘরের ইমাম-কাম-মোয়াজ্জেন মিনমিন করে, 'মুসলমান কা লাশ খান সাব! দাফন কা লিয়ে লে রহা। মেহেরবানি করকে–।'–না, সৈন্যরা কোনো ঝুঁকি নেবে না। মানুষ যদি মরে থাকে তো তাকে দাফন করতেই হবে। যেখানে ইচ্ছা দাফন করুক, এদিক দিয়ে শবযাত্রা যেতে দেওয়া যায় না। কানুন নাই। চেয়ারম্যান এবার নিজেই এগিয়ে আসে। ভয়, দ্বিধা ও সঙ্কোচে তার শোক প্রায় মুছে যায় যায়। বাঙলা উর্দু এবং ইংরেজি মিশিয়ে সে জানায় যে রাত্রি পৌনে চারটায় তার ছেলের মৃত্যু হয়েছে। তাদের বাড়ির কান্নাকাটির আওয়াজ পেয়ে স্কুলদালান থেকে ক্যাপ্টেন সাহেব তাকে তলব করেছিলো। সব শুনে ক্যাপ্টেন সাহেব আদেশ দিয়েছে যে যতো তাড়াতাড়ি পারে লাশ যেন দাফন করা হয়। তারই হুকুমে এরা এতো তাড়াতাড়ি এসেছে। এমন কি তাদের আত্মীয় স্বজন অনেকে এখনো এসে পৌঁছেনি। মোবারক আলি তাড়াতাড়ি যোগ করে, 'উনার বেটিও আসতে পারেনি।' কিন্তু মেয়ের ব্যাপারটা জানাতে চেয়ারম্যানের সায় নাই। সে শুধু মিনতি করে যে তারা যদি মেহেরবানি করে–।–না অনুমতি দেওয়া যায় না। সৈন্যরা তাদের সিদ্ধান্ত জানিয়ে নিজেদের মধ্যে পা মেলাতে মেলাতে ইউনিয়ন কাউন্সিলের বারান্দায় গিয়ে উঠলো। শবযাত্রীরা কী করবে বুঝতে পারে না। ওদিকে সৈন্যদের ২ জন বন্দুক তাগ করে রেখেছে এদের দিকে, এক পা সামনে বাড়ালেই সাংঘাতিক বিপদ হতে পারে। প্রায় ১০/১৫ মিনিট পর ২ জন সেপাই ফের এগিয়ে আসে, জিগ্যেস করে, 'লড়কা? জওয়ান লড়কা? উমর কেতনা?' ইমাম-কাম-মোয়াজ্জেন বলে, 'জ্বি হাঁ হুজুর! আঠারো বয়স কা নওজেয়ান!' ২ জন সৈন্যের ১ জন হাসে, অপরজন গম্ভীর মুখে যুবকের মৃত্যুর কারণ জানতে চায়। মোবারক শাজাহানের জ্বরের কথা বলে শেষে করতে না করতে সৈন্য ফের বলে, 'সালা মুক্তি থা? গোলি থাকে খতম হুয়া?' পেছন থেকে কাবেজউদ্দিন কি বোঝে সে-ই জানে, কেবল বিড়বিড় করে, 'তাহলে তো কামই হলোনি!'

চেয়ারম্যানের ছোটোভাই আস্তে করে তাকে ধমক দেয়, 'চুপ কর!' এবং একই সঙ্গে ইমাম-কাম-মোয়াজ্জেন সৈন্যের সন্দেহের প্রতিবাদে ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠে, 'নেহি হুজুর। বহুত আচ্ছা লড়কা থা।' সৈন্য ২ জন তেতো হাসি ছোড়ে। চেয়ারম্যান একটু এগিয়ে ফের জানায় যে সকালবেলা ক্যাপ্টেন সাহেব নিজে তাকে অনুমতি দিয়েছে, এখন তারা যদি মেহেরবানি করে তাকে ক্যাপ্টেনের সঙ্গে দেখাটুকু করিয়ে দেয় তো বড়ো উপকার হতো। এবার ২ জন সেপাই একসঙ্গে রাগ করে এবং ২ জনের রাগ ১ জনের গলায় প্রকাশিত হয় দ্বিগুণ ঝাঁঝের সঙ্গে। ক্যাপ্টেন কি তাদের মতো জানোয়ার যে ইচ্ছা করলো আর তার সঙ্গে দ্যাখা হয়ে গেলো? ক্যাপ্টেন কি তার বাবার চাকর যে এত্তেলো দিলেই চলে আসবে?

এদিকে লাশ কাঁধে করে কতোক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা যায়। কিছুক্ষণ পর পর শবযাত্রীরা খাটিয়ার

নিচে ঘাড় বদল করে। হঠাৎ খুব গুমোট শুরু হওয়ায় সবাই ঘামতে শুরু করেছে, কেউ কেউ ভাবছে এর চেয়ে রোদ ভালো। পাশের নিচু জমি থেকে পানি সরে যাচ্ছে, কিন্তু পচা ঘাসপাতা ও কাদার জমাটবাঁধা গন্ধ বাতাসের একেকটি ঝাপটায় ভালোরকম জানান দিয়ে যায়। এর মধ্যে ১ জন সেপাই চেয়ারম্যানকে ডেকে নরম গলায় বলে যে এভাবে অপেক্ষা করে তাদের ফায়দা হবে না। যেখানে পারে তারা লাশ পুঁতে ফেলুক। চেয়ারম্যান রাজি হয় না। লোকটি তখন বিরক্ত হয়ে বলে, ঠিক আছে, তা হলে তার কিছু করার নাই। তবে এখানকার লোকদের তো হিন্দুদের সঙ্গেই আঁতাতটা বেশি এবং তারা একরকম হিন্দুই বলা চলে তখন ছেলের লাশ সে পুড়িয়ে ফেললেই পারে। সেনাবাহিনী দেশলাই সরবরাহ করতে প্রস্তুত।

চেয়ারম্যান কাঁদো কাঁদো মুখে শবযাত্রীদের কাছে আসে। কী করা যায়? শরৎকালের ফাজিল মেঘ থেকে এমন সময় পেচ্ছাবের মতো ছর ছর করে বৃষ্টি শুরু হয়। চেয়ারম্যান বলে, 'চলো চলো, বাড়ি চলো।' কিন্তু লাশ নিয়ে একবার বাড়ি থেকে বেরুলে আর ফেরা যায় না। সুতরাং মুশকিল হলো। ডানদিকে নিচু জমিতে কোনো বড়ো গাছ নাই। বাঁদিকের জমিও নিচু, তবে রাস্তার ঢালে ১টা শ্যাওড়া গাছ। শ্যাওড়াগাছের নিচে তেমন আড়াল হবে না, তার ওপর ঐ গাছে একটা ভূতপেত্নীর আড্ডা, তারা আবার সব হিন্দু। কিন্তু আর কোনো উপায় না থাকায় খাটিয়া নামাতে হলো ওখানেই। চেয়ারম্যানের চাচাতো ভাই কোত্থেকে বাঁশের চাটাই এনে লাশের ওপর বিছিয়ে দেয়, কিন্তু তার আগেই শবযাত্রীদের কারো হাতের ছাতা নিয়ে লাশের শিওরে তাই ধরে বসে পড়েছে কাবেজউদ্দিন। বৃষ্টি থেমে যায় এবং দেখতে দেখতে মেঘ ও গুমোট কেটে রোদ উঠলো। রোদও ভয়ানক চড়া। মোবারকের কানের কাছে মুখ দিয়ে কাবেজউদ্দিন বলে, 'শালার ওদের তেজ কী! ওদপানি সবই গেলো চ্যাংড়ার শরীলের উপর দিয়া! কন তো, কী গজব পড়িছে, কন তো বাপু।'

জ্যান্ত মানুষের শরীরেও রোদপানির তেজ কম লাগে না। মোবারক আলির পায়ের একজিমা টাটায়, সেখানে একটু চুলকে নিলে হতো।

ইমাম-কাম-মোয়াজ্জেন সায়েব তাকে একটু তফাতে নিয়ে ফিসফিস করে নতুন প্রস্তাব দেয়। লাশ নিয়ে পেছনে হটে চেয়ারম্যানদের বাড়ির দক্ষিণে বড়ো দিঘির উঁচু পাড় দিয়ে কিছুদূর হেঁটে তারপর নিচে জমির আল দিয়ে গোরস্থানে যাওয়া যায়।–মোবারক একটু ভাবে।–হ্যাঁ, তা যাওয়া যায় বটে, কিন্তু নিচু জমি থেকে পানি এখনো সম্পূর্ণ সরে যায়নি। লাশ নিয়ে ঐ জমিতে কি যাওয়া যাবে?–কষ্ট একটু হবে, তবে জমিতে পা দেওয়া দরকার কী? আল দিয়েই তো দিব্যি হাঁটা চলে।–কিন্তু সদর রাস্তা ছেড়ে পেছন দিক দিয়ে লাশ নিয়ে যাওয়ার কথা চেয়ারম্যানকে বলা যায় কী করে?

মাথার উপর রোদ গজায়। এবার আর ভ্যাপসা নয়, রোদের একেকটা শিখা শিকের মতো খুলিতে বেঁধে। ইমাম-কাম-মোয়াজ্জেন সায়েব আরেকজন শবযাত্রীকে ডেকে তার প্রস্তাব বুঝিয়ে বলে। মোবারক আলির মুখে প্রস্তাবটা শুনে চেয়ারম্যানের চাচাতো ভাই মন্তব্য করে না। তবে তার সায় বোঝা যায়।

জুম্মার নামাজের সময় হলে ইমাম সাহেব জুম্মার ঘরে চলে যায়। যাবার সময় চেয়ারম্যানের হাত ধরে ডাকলো। এই ইমাম-কাম-মোয়াজ্জেন সায়েবকে চেয়ারম্যান তেমন পাত্তা দেয় না। কিন্তু আজ কী করতে হবে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না বলে চেয়ারম্যান সুড়সুড় করে তার সঙ্গে চললো। এমন কি শবযাত্রীদের প্রতি প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে সে ভুলে যায়। চেয়ারম্যানকে অনুসরণ করা মোবারক আলির কর্তব্য।

জুম্মার ঘর একেবারে ভরে বারান্দায় পর্যন্ত মুসল্লিদের ভিড়। গোলমাল শুরু হবার পর থেকে মানুষের নামাজপড়া খুব বেড়ে গেছে। তার ওপর আজ জুম্মার নামাজ। জুম্মার নামাজের পর এখানে কতো কথাবার্তা হয়, কিন্তু আজ সবাই খুব চুপচাপ। মোবারক আলি নামাজে উপযুক্ত মনোনিবেশ করতে পারে না। নিরাকার আল্লাহর জায়গায় তার চোখ জুড়ে ঝাঁঝরা-বুক বুলুর চিৎ-হয়ে-থাকা লাশ। বুলুর চুল ধুয়ে যাচ্ছে খালের পানি। তার শরীর বড়ো ক্লান্ত, দেখে মনে হয় দিনমান খেটে এসে ছেলেটা না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়েছে। ওকে ডিসটার্ব না করাই ভলো। ঘুমাক। নামাজের পরও ছেলেটা ওর চোখ-ছাড়া হয় না। তা থাক না! ওর জন্য মোবারক আলির কোনো অসুবিধা হচ্ছে না।

শ্যাওড়াতলায় ফিরে গিয়ে দ্যাখা যায় চেয়ারম্যানের ভাই আলিম আখন্দ মিলিটারির সঙ্গে কথা বলছে। এই সেপাই নতুন, দুপুরের পর ওদের ডিউটি বদল হয়। শবযাত্রীদের সংখ্যা খানিকটা কমে গেছে। যারা নামাজ পড়তে গিয়েছিলো তাদের অনেকেই বাড়ি গেছে খাওয়া-দাওয়া সারতে। আবার তারা নামাজ পড়তে গেলে এখান থেকে কেউ কেউ কেটে পড়েছে। নাকি প্রথম থেকেই একটু একটু করে সরছে, মোবারক আলি হয়েতো খেয়াল করেনি।

'না যাবার দিবার লয়!' লাশের মাথায় ছাতা ধরে বসে কাবেজ এখনো বিড়বিড় করেই চলেছে। এবার সবাই তার দিকে তাকায়। মানুষজন কমে যাওয়ায় কাবেজকে এমনিতেই চোখে পড়েছে। আপন মনে বিড়বিড় করা তার এক মুহূর্তের জন্য থামেনি। চাষাভুষা না হলে তার ঠোঁট নাড়ানোকে কলেমা পাঠ বলে মনে হতো। একটু স্বর বাড়ায় কাবেজ, 'যি মিলিটারি হুকুম দিবি, তাই বলে কড়িতলাত গেছে। চ্যাংড়াপ্যাংড়া কড়িতলার থানা বলে খাম করিছে।'

'আস্তে।' চেয়ারম্যান তাকে ধমক দেয়, 'শালা বলদের বাচ্চা বলদ। চুপ কর!'

আলিম আখন্দ বলে যে ক্যাপ্টেন এখানে নাই। সকালবেলাতেই তাকে যেতে হয়েছে কড়িতলা। সেখানে যে কী হয়েছে আলিম আখন্দ ঠিক বলতে পারে না, তবে সাঙ্ঘাতিক একটা কিছু ঘটেছে।–চেয়ারম্যানের ধমক খেয়ে কাবেজউদ্দিনের বিড়বিড় ধ্বনি ফের খাদে নেমে এসেছে। কাবেজ কী বলছে?–না, চেয়ারম্যান তখন যদি বুলুর সঙ্গে শাজাহানকে যেতে দেয় তো শাজাহানের এই পরিণতি হয় না। আজ সে ব্যস্ত থাকতো কড়িতলা থানা বিজয়-অভিযানে। শাজাহান তখন সঙ্গে গেলে বুলু কি তাকে না নিয়ে কড়িতলায় আসে!–বুলুর খবর তাহলে কাবেজ জানে না। মোবারক আলির মাথা থেকে পা পর্যন্ত ছটফট করে। মিলিটারির জিপ উল্টিয়ে ২/৪/১০ টাকে খতম করে বুলু কীভাবে মরলো–এর বিস্তারিত চলচ্চিত্র তার করোটির ছাদের ভেতর দিয়ে গলিয়ে টাকরা গড়িয়ে পড়ে শুকনা জিভের খসখসে জমিতে, জিভ সুড়সুড় করে। দাঁত দিয়ে মোবারক আলি নিজের জিভ চুলকায়।

আবার ওঠো, খাটিয়া তোলো, ঘুরে দাঁড়াও, আখন্দ-বাড়ির পেছন দিয়ে ঘুরে চলো গোরস্থানে।

চেয়ারম্যানের বাড়ির পেছনে বাঁশঝাড় পেরোবার সময় বাড়ির মেয়েদের কান্না নতুন করে চড়ে। তাদের শোককে পরিচর্যা করার সময় শবযাত্রীদের নাই। দেরি হয়ে গেছে, অনেক দেরি হয়েছে, তাড়াতাড়ি দাফন করা দরকার। মেয়েদের দিকে দেখতে দেখতে কাবেজউদ্দিন বিড়বিড় করা অব্যাহত রাখে, 'আম্মরা সব এখন কান্দিচ্ছেন? বুলুর সাথে তখন যাবার দিলেন না? তখন বার হয়া গেলে চ্যাংড়াটাক এতো জুলুম সওয়া লাগে?' বলতে বলতে শবযাত্রার সঙ্গে পা চালিয়ে কাবেজ বাঁশঝাড় পেরিয়ে উঠে পড়ে জোড়-পুকুরের উঁচু পাড়ের ওপর।

পুকুরের পাড় আসলে একটা রাস্তার অংশ, এই রাস্তায় হাঁটতে শবযাত্রীদের কোনো অসুবিধা হয় না। এমন কি সরু ও কাঁচা পথটি থেকে নিচে নামাটাও স্বচ্ছন্দে সম্পন্ন হয়। জমিতে নামবার ঢালে পানি সরে গেছে। নিচের জমিতে আমান ধান। ভালো করে দেখলে মনে হয় ধানের সবুজ শীষ বাতাসে একবার ফুল ওঠে, একবার বসে যায়। জমিতে এখনো ইঞ্চি দেড়েক পানি। ৮/১০ দিন আগে পানি ছিলো ১$\frac{১}{২}$ হাত, বর্ষা শেষ হয়ে গেলে কমতে কমতে ১$\frac{১}{২}$ পানি সরতে সপ্তাহের পুরোটাই লাগবে।

লাশের খাটিয়া যাদের ঘাড়ে তাদের একটি সারি যাচ্ছে জমির আলোর ওপর দিয়ে, আরেকটি সারিকে হাঁটতে হয় ধানজমির ওপর। মোবারক আলির কাঁধে খাটিয়ার ডান দিকের প্রথম কোণ। তার আগে আগে ইমাম-কাম-মোয়াজ্জেন সায়েব। ঐ সারির শেষ কোণ আলিম আখন্দের ঘাড়ে। তার পেছনে চেয়ারম্যান। তারপর চেয়ারম্যানের চাচাতো ভাই। এদের পেছনে লম্বা সারিতে অন্য সবাই। আর ওদিকে পাশের পঙ্‌ক্তিতে খাটিয়ার প্রথম কোণ বহন করছে কাবেজউদ্দিন। তার আগে আগে চলছে চেয়ারম্যানের সবচেয়ে বড়ো বর্গাচাষী বিটলুর বাপ ও তার ছেলে বিটলু, বিটলুর কোলে তার আড়াই বছর বয়সের ন্যাংটা শিশু। ঐ সারিতে খাটিয়ার পেছনের কোণ কাঁধে নিয়েছে গুণাহারের আরজ আলি সাকিদার, এ লোকটি চেয়ারম্যানের ধানকলের কর্মচারী, তার সামনে খাটিয়ার নিচে হেঁটে যায় আরজ আলির ভাইপো, এই সারির সর্বশেষ ব্যক্তি হলো নিহত শুকলু পরামাণিকের ছেলে ওবায়েদ। এই সারিতে আর কেউ নাই। ধানজমিতে হাঁটা এখন রীতিমতো কঠিন কাজ। ধানগাছের ফাঁকে ফাঁকে খালি জায়গায় পা পড়লে ডুবে যায় কাদার মধ্যে। লালমাটির কাদা, এমনভাবে খামচে ধরে যে পা তুলতে খুব কষ্ট হয়। কিন্তু এই সারির এরা মাঠে মাঠে কাজ করে বলে মাঠ ওদের বেশ পোষা, মোঠের নাড়িনক্ষত্র এদের মুখস্থ। ধান গাছের গোড়ার একটু ওপর এমন করে পা ফেলবে যে একটুখানি হেলে ধানগাছ অনেকটা পাপোষের কাজ করবে। কাদার কামড় থেকে এইভাবে বাঁচতে হয়। আবার দেখতে হয় ধানগাছ যেন একেবারে চিরকালের মতো শুয়ে না পড়ে। অতো দ্যাখাদেখির দরকার পড়ে না, তদের পায়ের সঙ্গে মাঠ ও কাদার বোঝাপড়া ভালো, সহজে কেউ কাউকে ঘাঁটায় না।

সতর্ক পা ফেলতে হয় জমির আলো উপর দিয়ে যারা চলছে তাদের । জমির আল মাত্রেই দিন দিন রোগা হয়ে আসছে, এর ওপর এতোদিন বর্ষার পানির নিচে থাকায় কোথাও কোথাও ক্ষয় হয়েছে। আলের ওপর তাই হাঁটতে হয় পা টিপে টিপে। আলিম আখন্দ মাঝে মাঝে উপদেশ দিচ্ছে, 'সাবোধান, খুব সাবোধান! দেখ্যাশুন্যা কদম ফালাও। কাদার মধ্যে পড়লে বিপদ হবি।' সবাইকে সাবধান করার দায়িত্ব পালনে মগ্ন হয়ে লোকটা নিজের বাত-চুম্বিত চরণযুগলের প্রতি

অবহেলা করে। কয়েক গজ মাত্র চলার পর ৭ম কি ৮ম সাবধানবাণী সম্পূর্ণ নিঃসৃত হবার আগেই তার মোটাসোটা ডান পা আল থেকে পড়ে যায় নিচে। খাটিয়ার ওপর শাজাহানের লাশ অনেকটা ডানদিকে গড়ায়। মোবারক আলির বুকে ধড়াস করে আওয়াজ ওঠে: লাশ কাদার মধ্যে পড়ে গেলো! তবে আলিম আখন্দের পায়ের পতনের সঙ্গে সঙ্গে অন্য সবার মতো সেও খাটিয়ার কোণ এবং খাটিয়ার পা দুই হাত দিয়ে ধরে ফেলে। এইভাবে শাজাহানকে পতন থেকে উদ্ধার করা হয়। আলিম আখন্দের পা পড়েছিলো একটি ধান গাছের গোড়ায়, তাই রক্ষা। তবু বেচারার পায়ের পাতায় শামুকের খোলা লেগেছে, একটু রক্তও বোধহয় বেরিয়েছে। কিন্তু খাটিয়া বহনের কাজ থেকে তাকে রেহাই দেওয়া বড়ো সহজ কাজ নয়। কারণ জমির আলের সারির কারো পক্ষে কাউকে পেরিয়ে সামনে যাওয়া কঠিন, এরকম যেতে হলে তাকে আল থেকে নেমে কাদার ওপর দিয়ে যেতে হবে। যাক, আলিম আখন্দ সামলে নিয়েছে, অন্যদের সাবধান করার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিয়ে সে এখন সতর্ক পায়ে হাঁটছে। জমিতে খসখস শব্দ। মাঝে মাঝে পানির ওপর পা পড়লে পানি ও ধানগাছের মিলিত আওয়াজ। আর আলের ওপর দিয়ে যারা চলছে তাদের পায়ের নিচে শব্দ একঘেয়ে। তবে এই সারির পুরোভাগে ইমাম-কাম-মোয়াজ্জেন সায়েব অবিরাম কলেমা পড়ে চলেছে, ফলে আলের ওপরেও বৈচিত্র্য আছে বৈ কি! মোবারক আলির ভয় হয় যে কলেমা পাঠে ইমাম সাহেবের অখণ্ড মনোযোগ নিজের কদমের প্রতি তাকে অসতর্ক না করে। এই ভয় ভালো করে দানা বাঁধতে না বাঁধতে ঘাড়ের ওপর খাটিয়া কেঁপে ওঠে, মোবারক আলির কাঁধ থেকে খাটিয়ার কোণ বলতে গেলে একটু সরেও যায় এবং সে চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে পড়ে। তার বন্ধ চোখের ভেতরটা পর্দার মতো কাঁপে এবং মোবারক আলি দ্যাখে যে শাজাহানের লাশ ধান খেতের কাদায় মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে গড়াতে থাকে বুলুর মুখ। কোথায় কোন বৌডোবা খালের ধারে বুলুর লাশ পানিতে ভেজে। না, বুলু ছিলো চিৎ হয়ে। তার বন্ধ চোখের মণি তাগ করা ছিলো আকাশের দিকে। মিলিটারি জিপ উল্টিয়ে দিয়ে, ২/৪/১০টা মিলিটারিকে খতম করে বুলুর তখন যা তেজ তাতে চোখের পাতা টাতা ভেদ্ করে সে সব দেখতে পাচ্ছিলো। –এ দৃশ্যটি মোবারক আলি আগেই দ্যাখে এবং এটা দেখতে দেখতে তার বাম পা হড়কে পড়ে যায় জমির কাদায়। আবার এও হতে পারে যে তার পা নিচে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে শাজাহানের লাশের কথা ভেবে বিচলিত হয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলে এবং এই দৃশ্যটি দেখতে থাকে।

কাদা থেকে পা তুলতে মোবারক আলিকে একটু বেগ পেতে হয়। তার একজিমায় কাদাপানি লাগায় জায়গাটা বড়ো চুলকাচ্ছে। এখন সেখানে আর হাত লাগায় কী করে? কিন্তু চোখের বন্ধ পাতা ভেদ করে তাকানো বুলুর তেজি চোখজোড়া ঝেড়ে ফেলা দরকার, নইলে ফের পা হড়কাবার সম্ভাবনা। আবার ওদকে একজিমার যন্ত্রণা। সেটাও ভোলা দরকার। অস্থির হয়ে মোবারক একটু জোরে পা চালাবার চেষ্টা করতেই কাবেজ ও আলিম আখন্দ এক সঙ্গে চিৎকার করে, 'আস্তে। আস্তে।' এবার মোবারকের পদস্থলন ঘটে না বটে, কিন্তু সে ধাক্কা খায় ইমাম-কাম-মোয়াজ্জেন সায়েবের পিঠে। সামনে জমির আল হঠাৎ খুব সরু হয়ে গেছে, ইমাম সায়েব সেজন্য প্রস্তুত ছিলো, কিন্তু মোবারকের ধাক্কায় তার সমস্ত প্রস্তুতি ভণ্ডুল হয়ে গেলো, আলের দুই পাশে কাদায় তার দুই পা গেঁথে যাওয়ায় লোকটার গতি একেবারে রুদ্ধ হয়। মনে হয় সাদা কাপড়ে জড়ানো ১ জোড়া খুঁটি পুঁতে তাকে স্থাপন করা হয়েছে। এখন কেবল তার মুণ্ডুতে চাঁদ-তারা-খচিত নিশান কোনোভাবে একটা ফিট করে দিলেই ইমাম-কাম-মোয়াজ্জেন সায়েব পত পত আওয়াজে জাতীয় সঙ্গীত গাইতে শুরু

করবে। কিন্তু তার মুখ দিয়ে বমির মতো তোড়ে বেরিয়ে আসে, 'শালা জালেমের বাচ্চারা!'

বিটলুর বাপ এদিকে এসে আলের ওপর বসে ইমাম সায়েবের চরণ উদ্ধারে আত্মনিয়োগ করে। এই জায়গায় কাদা বড়ো থকথকে। এক পা তুলতে গেলে শরীরের ভার পড়ে অন্য পায়ে এবং দ্বিতীয় পাটি কাদায় অনেক বেশি করে গেঁথে যায়। তার পেছনে লাশ ঘাড়ে নিয়ে এতোগুলো মানুষ অধীর আগ্রহের সঙ্গে বিটলুর বাপেরে প্রচেষ্টার অগ্রগতি লক্ষ করে। ইমাম-কাম-মোয়াজ্জেন সকলের লক্ষ্যবস্তু হয়ে বিব্রত হয়। দিনে ৫ বার অবশ্য অনেক লোকের সামনে তাকে দাঁড়াতে হয়। তবে সেটা হলো মেলা দিনের অভ্যাসের ব্যাপার। আর সেখানে তার নিজের কিছুই করার নাই। মুসল্লিরা কাতার বেঁধে দাঁড়ালেই সে ইঞ্জিনের ঠেলায় চলতে-থাকা রেলগাড়ির মতো চাপ অনুভব করে এবং ১টির পর ১টি সুরা আবৃত্তি করে চলে। কিন্তু এখানে দৃশ্য বা অদৃশ্য কোনো চাপ নাই যে তার ওপর ভরসা করে পেছনের লোকদের উৎকণ্ঠাকে সে অগ্রাহ্য করে। সারির সামনে ইমাম সায়েব অচল বলে সবার গতি রুদ্ধ, দায়টা কি তবে তার ওপরেই বর্তায় না? ইমাম-কাম-মোয়াজ্জেন প্রায় আজান দেওয়ার মতো আওয়াজ তুলে আল্লার কাছে নালিশ করে 'আল্লা পরওয়ারদিগার, তুমি দ্যাখো মুসলমানের মুর্দার সাথে এরা কীরকম নাফরমানি করে, মুসলমানের মুর্দার দাফন দিতেও এরা বাধা দেয়, আল্লা, এরা কাফেরেরও অধম, জানোয়ার, সব হায়ওয়ান!' আল্লার উদ্দেশ্যে বললেও তার প্রকৃত লক্ষ্য শবযাত্রীরা এই আপাত, অভিযোগকে কৈফিয়ত বলে সনাক্ত করতে পারে এবং মেনেও নেয়। তবে এরকম না করলেও তার চলতো, কাদার ভেতর তার পা গেঁথে যাওয়ায় তার ওপর কেউ বিরক্ত হয়নি। এমন কি বিটলুর বাপ, যে কি-না গতবারের আগের বার চাষের সময় সার কেনার অর্ধেক টাকা যোগাড় করতে ইমাম সায়েবের কাছ থেকে ৪ মাসের কড়ারে ৫০ টাকা হাওলাত নিয়ে ৭ মাস পার করিয়ে দেওয়ায় ঔ শেষ কটা মাসের জন্য দ্বিগুণ হারে সুদ দিয়েও কেবল একবেলা খোরাকিতে তার পাতকুয়া সাফ করে রক্ষা পেয়েছিলো, সে পর্যন্ত তার পদসেবায় এতোটুকু ফাঁকি দিলো না।

'কন তো ইমাম সায়েব, আমার ব্যাটার সাথে অরা ইটা কী করিচ্ছে, কন তো।' চেয়ারম্যানের এই বিলাপে সবাই চুপচাপ মাটির দিকে তাকিয়ে থাকে। প্রায় ফোঁপাতে ফোঁপাতে চেয়ারম্যান জানতে চায় তার নিরীহ নিষ্পাপ মাসুম বাচ্চাটির ওপর আল্লার গজব নামে কেন? লেখাপড়ার বাইরে সে তো কিছুই জানে না, কোথাও কোনো ঝগড়াঝাটির আভাস পেলেও সে ওখান থেকে শতহাত দূরে থাকে।–তো তার ওপর এরকম জুলুম কেন?–কেউ এর জবাব না দিলে গুনাহারের আরজ আলি সাকিদার জোর গলায় মনিবকে সমর্থন জানায়, 'কিসের ক্যাম্প খাড়া করছে, তার সামনে দিয়া যাবার দিবি না।–ক্যান?–মুর্দা কি কাফনের মধ্যে বন্দুক লিয়া যাচ্ছে? মুর্দার হাতে হাতিয়ার আছে?'

'তালে তো কামই হতো।' জমির ওপর থেকে খাটিয়া কাঁধে জবাব দেয় কাবেজ, তার বিড়বিড় এতোক্ষণে বাক্যের আকার পায়, 'বন্দুক কি কচ্চেন গো, মানষের হাতে পান্টি দেখলে শালারা বলে গোয়ার কাপর তুল্যা কোটে দৌড় মারবি তার দিশা পায় না, কড়িতলাত গেলে দ্যাখা গেলোনি, সেটি বলে দুধের ছোলেরা এই জাউরাগুলাক খাম কর্যা দিলো–'

'প্যাচাল পাড়িস না কাবেজ! শালার চাষার মুখ বন্ধ হয় না।' আলিম আখন্দের ধমকে কাবেজ

থামে, কিন্তু ইমাম-কাম-মোয়াজ্জেনের চরণ-উদ্ধারের পর তার বিড়বিড় ফের শুরু হয়। শবযাত্রীরা কলেমা শাহাদত পড়ে, আর কাবেজ হলো জাহেল মানুষ, খোদার কালাম জানে না কলেমা জানে না, সে কেবল জপে যে, বুলুর সঙ্গে তখন শাজাহান যদি চলে যায় তো আজ কি তার এতো কষ্ট হয়?–কাবেজের জপপাঠ শোনে আর মোবারক আলির ঠোঁটজোড়া নিসপিস করে, বুলুর কথাটা কাবেজকে জানানো খুব দরকার।–বুকে গুলি লেগে বুলু মারা গেছে। না, এমনি মার খেয়ে মরেনি, মরার আগে হাত দিয়ে বোমা ছুড়ে মটোর ভর্তি মিলিটারি নিশ্চিহ্ন করে তাদের গাড়িগুলো সব উল্টিয়ে তারপর–। তারপর বুকে, নাকি পেটে? না, বুকেই গুলি লাগলে বুলু গড়িয়ে পড়ে বৌডোবা খালে, বৌডোবা খাল কোথায়?–আরে পুবে, যমুনা থেকে একটু পশ্চিমে। তা এতোদিনে বৌডোবা খালে সে কি আর আছে? সে কি বসে থাকার ছেলে? বর্ষার ঢলে বুলুর লাশ ঠিক পৌঁছে গেছে যমুনার স্রোতে। যমুনার স্রোতের কথা খিয়ার অঞ্চলের মানুষ কাবেজ জানবে কোত্থেকে?–যমুনার একেকটা ছোবলে ঘরবাড়ি, ফসলের জমি, হাটবাজার গ্রামকে গ্রাম, এমন কি গুনাহারের প্রদ্যোৎনারায়ণ হাই স্কুলের মতো দালানও টুপ করে ধসে পড়ে, কোনো চিহ্ন থাকে না। তো সেই স্রোতের ওপর সওয়ার হয়ে তার বুলু রওয়ানা দিয়েছে কোন দিকে? কোথায়? যমুনা গিয়ে মিশে কোথায়? পদ্মায়? না-কি মেঘনায়? তারপর আত্রাই পেরোতে হবে না? তারপর গুনাহারে কাপড়ের দোকানদারের বাড়ির পাশের নদী ধলেশ্বরী, সেটা কোথায়? মোবারক আলি সুরমা নদীর নামে জানে, কর্ণফুলির নাম জানে, করতোয়া তো তার চাচতো বোন, স্কুলে তাদের ইতিহাসের মাস্টার ছিলো, বাড়ি তিতাস নদীর তীরে, কোথায় যেন ভৈরব, কোথায় শীতলক্ষ্যা–এতোসব নদীর নাম মনে করতে করতে মোবারক হাবুডুবু খায়, থই পায় না। নদী উপনদীর বিপুল স্রোতোধারা তার কানে এমন বেগে আছাড় খায় যে এমন কি বুলুর মায়ের কান্নাও চাপা পড়ে। এই বিশাল জলধরায় তার রোগা ঢ্যাঙা কালো ছেলেটার গুলিতে-ঝাঁঝরা বুক কানায় কানায় ভরে গিয়েছে। এই গুমোট গরমে সিন্দুকের মতো গর্তে মাটিচাপা হয়ে থাকতে হচ্ছে না বলে বুলু তার ইচ্ছামতো হাতপা ছড়াতে পারে। সে কি চিৎ হয়ে শোয়? না-কি উপুড় হয়ে? বুলু কি ভেসে ভেসে চলে? না-কি রুই কাৎলা চিতল বোয়াল খলসে পুঁটির ঝাঁকের সঙ্গে পানির নিচে এগিয়ে যায়? কিন্তু এতোসব প্রশ্নের জবাব খুঁজে বার করা মোবারকের পক্ষে বেশ কঠিন। সময়ও হয় না। গারস্থানে পৌঁছে খাটিয়া নামিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতেই চোখে পড়ে খেজুরতলার ধসে-পড়া এক কবরের ভেতর থেকে মোটাসোট ১টা শেয়াল সরাসরি তার দিকেই তাকিয়ে রয়েছে। মাটির ঢিল হাতে নিয়ে তাকে তাগ করে মোবারক খুব জোরে ছুড়ে মারে!

ফেরার সময় কয়েকজনের সঙ্গে মোবারক আলিও চেয়ারম্যানের বাড়িতে কিছুক্ষণ বসলো। মাইল তিনেক তফাৎ কড়িতলায় আজ খুব একচোট হয়ে গেছে, মিলিটারিও নাকি বেশ কয়েকটা সাফ।–খবর শুনে চেয়ারম্যানের পুত্রশোক মাথায় ওঠার দশা, এই ক্যাম্পে মিলিটারির ক্যাপ্টেনকে না হলেও ১০ বার সে বলেছে যে তার ইউনিয়ন সম্পূর্ণ পবিত্র, ঐসব মুক্তি ফুক্তির ছোঁড়ারা অন্তত রেললাইন পেরোতে পারবে না,–এ ব্যাপারে সে নিশ্চিত। যে মুকুন্দহাটের গ্রামভর্তি হিন্দুরা গোলমালের শুরুতেই বর্ডার পার হয়েছে, এখন গোটা এলাকায় সাচ্চা মুসলমান ছাড়া আর মানুষ নাই।–এখন মিলিটারি এসে তার হাল কী করবে তা জানে কেবল আল্লা পরওয়ারদিগার আর মিলিটারি আর খানিকটা অনুমান করতে পারে সে নিজে। বাড়ির লোকজনও জান ভরে কাঁদতে পাচ্ছে না, কেবল শাজাহানের মায়ের ক্লান্ত ও বসা গলার

কান্না মধ্যরাত্রির কুকুরের ইনিয়ে বিনিয়ে কান্নার মতো টানা আওয়াজ তুলে অশুভ ইঙ্গিত দিয়ে চলেছে। কড়িতলার শোধ নিতে মিলিটারি এই গ্রামে কতোরকম কায়দায় মানুষ-খুনের কেরামতি দ্যাখাবে তাই নিয়ে মানুষ নিজেদের মধ্যে আতঙ্ক বিনিময় করে। পশ্চিমপাড়া মক্তবের কয়েকটি তালেব-এলেম শাজাহানের ঘরে, ঐ ঘরের বারান্দায় এবং উঠানে যে যে জায়গায় শাজাহানের লাশ ছিলো,–বসে কোরান শরিফ পড়ছে। আগরবাতির ধোয়ার পাতলা পর্দার আড়ালে এদের মিনমিনে ঝাপসা আওয়াজ শুনে কে বলবে এরা আল্লাপাকের কালাম পড়ছে, না আগে আগে নিজেরাই নিজেদের জানাজা পড়ে নিচ্ছে,–মিলিটারির হাতে মরলে জানাজা হয় কি-না কে জানে? এদের সঙ্গে মোবারক আলি কথা বলে কী করে?

চেয়ারম্যানের বাড়ির বাইরের উঠানে কেবল কাবেজউদ্দিন। চেয়ারম্যানের গোরুবাছুর নিয়ে সে যাচ্ছে গোয়ালঘরের দিকে। বুলুর কথা শোনাবার জন্য তাকে দাঁড়াতে বলে মোবারক ফ্যাসাদে পড়ে, কথাটা শুরু করে কীভাবে? তা কাবেজউদ্দিনই তাকে উদ্ধার করে , 'দ্যাখেন তো চাচামিয়া, অলেয্য কথাটা হামি কী কনু, কন তো? তখন বুলুর সাথে গেলে শাজাহানের আজ বলে এতো দুক্ষু পোয়ান লাগে? শালারা অর সাথে এতো জুলুম করব্যার পারে?' হঠাৎ গলা নামিয়ে সে জিগ্যেস করে, 'কড়িতলাত কি বুলু আসিছিলো, সোম্বাদ পাচ্ছেন?' আজ বুলু বেঁচে থাকলে কড়িতলার আক্রমণ হয়তো তারই পরিচালনায় সম্পন্ন হতো, কে জানে? কিন্তু বুলু মরার আগে যে কাণ্ডটা করে গেছে,–সেটা? কাবেজের নিচু স্বরকে পরোয়া না করে মোবারক স্বাভাবিক গালায় বলে, 'কাবেজ, বুলুর খবর তুমি কি জানো? অর লাশ লিয়া শয়তানি করবি এই ইবলিশের পয়দা মিলিটারি? বুলুর লাশ বলে বৌডোবা খাল থেক্যা বার হয়া–।'

'লাশ? বুলুর লাশ? কী কচ্ছেন চাচামিয়া?'

মোবারক আলি তখন বৌডোবা খালের ধারে পাটখেতের ভেতর থেকে বুলুর গ্রেনেড ছুড়ে মিলিটারি মারার গল্প বলে। মস্ত বড়ো গাড়ি ভর্তি মিলিটারি খতম করার পর ওদের এক গুলিতে বুলু গড়িয়ে পড়েছে খালে। বুলুর লাশের দীর্ঘ জলযাত্রা পর্যন্ত পৌঁছবার আগেই গোরুর পালের পাটকিলে বাছুরটা দৌড় দেয় সামনের খড়ের গাদার দিকে, কাবেজ ছোটে তার পেছনে। একটুখানি দাঁড়িয়ে মোবারক রাস্তায় নামলো।

রাস্তা খাঁ খাঁ করছে। কেবল খুব জোরে পা চালিয়ে বাড়ির দিকে যাচ্ছে বিটলুর বাপ। তার ধ্যাবড়া পায়ের একেকটি কদমে রাস্তার নির্জনতা অনেক দূর পর্যন্ত প্রসারিত হয়। মোবারক হঠাৎ করে তার সামনে এসে দাঁড়ালে সে চমকে ওঠে। মোবারক বলে, 'এখনি বাড়িত যাস?'

'কড়িতলার সোম্বাদ শুনছেন? যাই। আত হয়া যাবি। ঘাটাত যদি ধরে তো–।'

'কেটা ধরবি?'

'বেলা ডুবলে অরা ধরবি না?' এই বারবেলায় মিলিটারির নাম মুখে আনতে বিটলুর বাপের বুক ঢিপঢিপ করে, ইউনিয়ন কাউন্সিল অফিসে ক্যাম্প হওয়ার পর থেকে সন্ধ্যা থেকে এখানে অঘোষিত কার্ফ্যু জারি হয়।

'আরে থো', মোবারক প্রায় ধমক দেয়, 'হামার বুলু বলে একো বন্দুকের গুলিত মটোর ভরা

মিলিটারিক শ্যাষ করিছে সেই বিত্তান্ত জানিস?'

'কী কন?' বুলু ইন্ডিয়া গেছে এই নিয়ে সে কানাঘুসা শুনেছে, তা ঐ বোকাসোকা কাবেজের কথায় আমল দেয় কে? 'তাই তো, বুলুক অনেকদিন দেখি না। হামি কই তার কলেজ আছে, তাঁই বগুড়া থিকা আসবার পারিচ্ছে না।' বিটলুর বাপ স্থির হয়ে দাঁড়ালে মোবারক বুলুর কথা বলে। তবে বলতে বলতে সে একটু আনমনা হয়ে যাচ্ছিলো, অনেক দূর থেকে ভেসে আসা চাপা আওয়াজে তার বুক হু হু করে, আহারে, বুলুর মা আজ চোখ ভরে, গলা ভরে, বুক ভরে কাঁদে! এই সুযোগটা দেওয়ায় শাজাহানের জন্যে একটু বেশিরকম মায়া হয়, কিন্তু বুলুর গল্প বলার সুযোগ নষ্ট হয়ে গেলো; গাছপালা, ঘরবাড়ি, ফসলের জমি এবং বাতাসের ওপর দিয়ে ভেসে আসা সেই আওয়াজে হাওয়া লাগে, খুব বেগে তা এগিয়ে এলে দুজনই দক্ষিণে তাকিয়ে তার উৎস খুঁজতে থাকে। দেখতে দেখতে কড়িতলার মাইলখানেক দক্ষিণে রেললাইনের ওপরের অনেকটা জায়গা আগুনে, ধোঁয়ায়, চিৎকারে আর্তনাদে সামনে এগিয়ে আসে। বিটলুর বাপ ফিসফিস করে, 'মনে হয় আইলগর। অরা গেছে!' 'হুঁ, মিলিটারি পড়িছে। রায়নগর মোকামতলা ঘোড়াঘাটের একটা পোকাও অরা রাখবি না, দেখিস। কুত্তার বাচ্চারা মানুষ সহ্য করবার পারে না।' মোবারক আলির গলা কাঁপে।

'বাড়িতে যাই ভাইজান, অনেকক্ষণ বেলা ডুবিছে, যাই।' পা বাড়িয়ে বিটলুর বাপ এগোয় না, বলে, 'তা ভাইজান, বুলু যখন বোমা না বন্দুক মারলো ঐ মটোরের মধ্যে অরা কয়জন আছিলো? ব্যামাক কয়টাই মরিছে?'

'তো তোমাক কলাম কি?'

বিটলুর বাপ হন হন করে হাঁটা দিলে ঝপ করে রাত নামলো, কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ থেকে আলোর সঙ্গে অন্ধকার চোঁয়ায় প্রায় সমান সমান। আসমত সরকারের আমবাগানের পশ্চিম মাথায় ভাঙাচোরা, কেবল ১০/১২টি ইটসর্বস্ব শাহবাবার মাজারশরিফের শিয়রে মস্ত শিমুল গাছের নিচে বিড়ি টানতে টানতে রাতভোর বসে থাকে ভিখুপাগলা, ঐ গাছের পুরনো বাসিন্দা শাহবাবার পোষা জিনের কাছে সে গুপ্তবিদ্যার পাঠ নিচ্ছে আজ কম করে হলেও ৭ বছর তো হবেই। ভিখুপাগলাটাও আজ নাই, মনে হয় কড়িতলা রায়নগরের খবর তারও কানে গেছে। মোবারক একটু দমে গেলো, ভিখুপাগলাকে বুলুর গল্প বললে তার ধ্রুতে আসমানি জীবের এলাকায় বুলুর গলাটা ঠিক পৌঁছে যেতো। তবে একটু এগোলে এই ক্ষোভ মুছে যায়, জুম্মাঘরের অন্ধকার বারান্দায় বসে ইমাম-কাম-মোয়াজ্জেন বদনা থেকে পানি ঢেলে অজু করছে। ইমাম সায়েবের কুলকুচো করার আওয়াজ আজ এতোটাই খাদে নেমেছে যে মনে হতে পারে লোকটা সবাইকে লুকিয়ে চুপচাপ কোনো নিষিদ্ধ পানীয়তে চুমুক দিচ্ছে এবং সঙ্গে সঙ্গে তওবা করে তাই আবার নীরবে বমি করে ফেলছে। মোবারকের অবশ্য তা মনে হয় না। বারান্দার নিচে দাঁড়িয়ে সে আজকের কড়িতলা সংঘর্ষের বিবরণ ছাড়ে। তার বর্ণনা থেকে খুঁটিনাটি জিনিসও বাদ পড়ে না, কড়িতলায় আশেপাশে কোনো খাল না থাকায় মিলিটারির গাড়ি চুরমার হয়ে পড়ে যায় প্রাইমারি স্কুলের মাঠে। এখানে পাটখেত নাই, তাই রোগা ঢ্যাঙা কালো ছেলেরা বোমা ছুড়েছিলো স্কুলের উত্তরের বাঁশঝাড় থেকে। মিলিটারি যতোগুলো গিয়েছিলো প্রাণ নিয়ে কেউ ফেরেনি। ছেলেদের মধ্যে মারা গেছে একজন, হ্যাঁ প্রথম বোমাটি

সেই ছুড়েছিলো। তারপর ফ্ল্যাশ ব্যাক করে মোবারক বুলুর গল্প করে। সবই বলে, এমন কি তার যমুনায় পৌঁছে যাওয়ার খবরটিও বাদ পড়ে না। মিলিটারি সম্বন্ধে সে বাঞ্চোৎ, বেজন্মা, বেশ্যার পয়দা, জাউরা, হারামির বাচ্চা ও হারামখোর এইসব বিশেষণ প্রয়োগ করলে অত্যু ক্তি হতে পারে জেনেও ইমাম সায়েব লালচে কালো ধানখেতের দিকে তাকিয়ে শেষপর্যন্ত তার কথা শোনে।

ওদিকে বুলুর মা দাঁড়িয়ে ছিলো দরজার কপাট ধরে। গ্রামে মিলিটারি ক্যাম্প পড়ার পর থেকে বুলুর বাপ বেলা থাকতে থাকতে ঘরে ফেরে, মগরেবের নামাজ সে আজকাল ঘরেই পড়ে। আর আজ কি-না এশার আজান পর্যন্ত পড়ে গেলো, তার দ্যাখাই নাই।

ভেতরের বারান্দায় জলচৌকির ওপর গামছা ও বদনা ভরা পানি দিয়ে বুলুর মা রাগ করে, 'দেরি হলে খবর পাঠাবার পারো না? একটা মানুষ পাই না যে তোমার কথা পুস করি।'

তার জন্য স্ত্রীর এই দুশ্চিন্তা দেখে মোবারক আলি বিরক্ত হয়। যার ছেলে মারা গেছে মাস দুয়েকও হয়নি, সেই মা অন্য কারণে উতলা হয় কীভাবে? সন্ধ্যার পর ছেলের জন্য হামলে কেঁদে মা যদি সারা গ্রাম মাথায় না তুললো তো বুলু এরকম মরা মরতে গেছে কোন দুঃখে?

লেখক-পরিচিতি

কথাসাহিত্যিক আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ১৯৪৩ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি গাইবান্ধা জেলার গোটিয়া গ্রামের মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস বগুড়ায়। তিনি বগুড়া জিলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক (১৯৫৮) পাসের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় বি.এ. সম্মান (১৯৬৩) ও এম. এ. (১৯৬৪) ডিগ্রি লাভ করেন। কর্মজীবনে তিনি ছিলেন সরকারি কলেজের অধ্যাপক। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস এদেশের প্রগতিশীল ও মানবতাবাদী সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রতি একনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি একজন স্বল্পপ্রজ লেখক। বহুগ্রন্থ রচনার চেয়ে গুণসম্পন্ন অল্পগ্রন্থ রচনা ছিল তাঁর লক্ষ্য। দুইটি উপন্যাস, গোটা পাঁচেক গল্পগ্রন্থ আর একটি প্রবন্ধ সংকলন–এই নিয়ে তাঁর রচনাসম্ভার। বাস্তবতার নিপুণ চিত্রণ, ইতিহাস ও রাজনৈতিক জ্ঞান, গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও সূক্ষ্ম কৌতুকবোধ তাঁর রচনাকে দিয়েছে ব্যতিক্রমী সুষমা। তিনি কথাসাহিত্যিক হিসেবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন বিষয় ও রচনাগুণ উভয়ের পরিপ্রেক্ষিতেই। তাঁর লেখায় সমাজবাস্তবতা ও কালচেতনা গভীরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। বিশেষত, তাঁর রচনাশৈলীর ক্ষেত্রে যে স্বকীয় বর্ণনারীতি ও সংলাপে কথ্যভাষার ব্যবহার লক্ষণীয় তা সমগ্র বাংলা কথাশিল্পে অনন্যসাধারণ। বাঙালির ঐতিহাসিক অর্জনসমূহ নিয়ে গণমানুষের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নানা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ তিনি শিল্পের আধারে নিজের রচিত গল্প ও উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গল্পগ্রন্থ হলো: 'অন্যঘরে অন্যস্বর' (১৯৭৬), 'খোয়ারি' (১৯৮২), 'দুধভাতে উৎপাত' (১৯৮৫), 'দোজখের ওম' (১৯৮৯); আর উপন্যাস হলো: 'চিলেকোঠার সেপাই' (১৯৮৭), 'খোয়াবনামা' (১৯৯৬)। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের বক্তব্যে সুদৃঢ়তা ও আদর্শিক ঋজুতা একই সঙ্গে প্রকাশের ক্ষেত্রে অপূর্ব অনন্যতা তাঁকে পৃথক স্থান নিশ্চিত করেছে। ১৯৯৭ সালের ৪ঠা জানুয়ারি তিনি ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

মূল-বক্তব্য

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'অপঘাত' ছোটগল্পে যুদ্ধকালীন জীবনের তীব্র আর্তি ও যন্ত্রণা শব্দরূপ পেয়েছে। 'অপঘাত' গল্পের প্রাণশক্তির মূলে রয়েছে গ্রামের ইউনিয়ন পরিষদের কেরানি মোবারক আলির আত্ম-উন্মোচন। মুক্তিযুদ্ধে শহিদ পুত্রের খবর জনসমক্ষে প্রকাশ পেলে অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কায় যে সন্ত্রস্ত, সেই মোবারক আলিই গোপন সংবাদের সরল ঘোষণার মধ্য দিয়ে উত্তীর্ণ হয় এক দ্বিধাহীন, আলোকোজ্জ্বল অনুভবলোকে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হবার চার মাস পর পিতা মোবারক পুত্র বুলুর মুক্তিযুদ্ধে শহিদ হওয়ার কথা জানতে পারে। তবে পাকিস্তানি মিলিটারি ও তাদের দোসরদের ভয়ে সন্তানের জন্য অশ্রুপাতও করতে পারে নি। বুলুর বন্ধু চেয়ারম্যানপুত্র অসুস্থ শাজাহান হঠাৎ মৃত্যুবরণ করে। একদিকে শহিদ হওয়া, অন্যদিকে স্বাভাবিক মৃত্যু। অনেকে এভাবে শহিদ হওয়াকে 'অপঘাত' বলে মনে করে! মুক্তিযুদ্ধকালের এ-ও এক বাস্তবতা। তবে স্বাভাবিক মৃত্যু হলেও শাজাহানের লাশ নিয়ে বিড়ম্বনায় পড়তে হয় স্বজনদের। এসব দেখে বুলুর পিতা মোবারক আলির আদর্শিক উত্তরণ ঘটে। সে আর ভীত থাকে না বরং বীরপুত্রের দেশের জন্য আত্মদানে সে নিজেও ধন্য বলে মনে করে এবং তা প্রচার প্রায়। আসলে, উত্তরবঙ্গের বগুড়ার নিস্তরঙ্গ জনপদে পাকহানাদার বাহিনীর অবস্থান ও অমানবিক কার্যক্রম, এজন্য মুক্তিযোদ্ধার শহিদ হওয়া এবং অন্য এক স্বাভাবিক মৃত্যুর সমান্তরাল অন্তর্ময় বিন্যাস প্রভৃতি প্রসঙ্গকে নিরাবেগ সততায় 'অপঘাত' ছোটগল্পে উন্মোচন করেছেন গল্পকার।

প্রবন্ধ

বাঙ্গালা ভাষা

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রায় সকল দেশেই লিখিত ভাষা এবং কথিত ভাষায় অনেক প্রভেদ। যে সকল বাঙ্গালী ইংরেজি সাহিত্যে পারদর্শী, তাঁহারা একজন লণ্ডনী কক্‌নী বা একজন কৃষকের কথা সহজে বুঝিতে পারেন না, এবং এতদ্দেশে অনেক দিন বাস করিয়া বাঙ্গালীর সহিত কথাবার্তা কহিতে কহিতে যে ইংরেজেরা বাঙ্গালা শিখিয়াছেন, তাঁহারা প্রায় একখানিও বাঙ্গালাগ্রন্থ বুঝিতে পারেন না। প্রাচীন ভারতেও সংস্কৃতে ও প্রাকৃতে, আদৌ বোধ হয়, এইরূপ প্রভেদ ছিল, এবং সেই প্রভেদ হইতে আধুনিক ভারতবর্ষীয় ভাষাসকলের উৎপত্তি।

বাঙ্গালার লিখিত এবং কথিত ভাষায় যতটা প্রভেদ দেখা যায়, অন্যত্র তত নহে। বলিতে গেলে, কিছু কাল পূর্ব্বে দুইটি পৃথক্ ভাষা বাঙ্গালায় প্রচলিত ছিল। একটির নাম সাধুভাষা; অপরটির নাম অপর ভাষা। একটি লিখিবার ভাষা, দ্বিতীয়টি কহিবার ভাষা। পুস্তকে প্রথম ভাষাটি ভিন্ন, দ্বিতীয়টির কোন চিহ্ন পাওয়া যাইত না। সাধুভাষায় অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দসকল বাঙ্গালা ক্রিয়াপদের আদিম রূপের সঙ্গে সংযুক্ত হইত। যে শব্দ আভাঙ্গা সংস্কৃত নহে, সাধুভাষায় প্রবেশ করিবার তাহার কোন অধিকার ছিল না। লোকে বুঝুক বা না বুঝুক, আভাঙ্গা সংস্কৃত চাহি। অপর ভাষা সে দিকে না গিয়া, যাহা সকলের বোধগম্য, তাহাই ব্যবহার করে।

গদ্য গ্রন্থাদিতে সাধুভাষা ভিন্ন আর কিছু ব্যবহার হইত না। তখন পুস্তকপ্রণয়ন সংস্কৃত ব্যবসায়ীদিগের হাতে ছিল । অন্যের বোধ ছিল যে, যে সংস্কৃত না জানে, বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রণয়নে তাঁহার কোন অধিকার নাই, সে বাঙ্গালা লিখিতে পারেই না। যাঁহারা ইংরেজিতে পণ্ডিত, তাহারা বাঙ্গালা লিখিতে পড়িতে না জানা গৌরবের মধ্যে গণ্য করিতেন। সুতরাং বাঙ্গালায় রচনা ফোঁটা-কাটা অনুস্বারবাদীদিগের একচেটিয়া মহল ছিল। সংস্কৃতেই তাঁহাদিগের গৌরব। তাঁহারা ভাবিতেন, সংস্কৃতেই তবে বুঝি বাঙ্গালা ভাষার গৌরব; যেমন গ্রাম্য বাঙ্গালী স্ত্রীলোক মনে করে যে, শোভা বাড়ুক না বাড়ুক, ওজনে ভারি সোনা অঙ্গে পরিলেই অলঙ্কার পরার গৌরব হইল, এই গ্রন্থকর্ত্তারা তেমনি জানিতেন, ভাষা সুন্দর হউক বা না হউক, দুর্ব্বোধ্য সংস্কৃতবাহুল্য থাকিলেই রচনার গৌরব হইল।

এইরূপ সংস্কৃতপ্রিয়তা এবং সংস্কৃতানুকারিতা হেতু বাঙ্গালা সাহিত্য অত্যন্ত নীরস, শ্রীহীন, দুর্ব্বল, এবং বাঙ্গালা সমাজে অপরিচিত হইয়া রহিল। টেকচাঁদ ঠাকুর প্রথমে এই বিষবৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত করিলেন। তিনি ইংরেজিতে সুশিক্ষিত। ইংরেজিতে প্রচলিত ভাষার মহিমা দেখিয়াছিলেন এবং বুঝিয়াছিলেন। তিনি ভাবিলেন, বাঙ্গালার প্রচলিত ভাষাতেই বা কেন গদ্যগ্রন্থ রচিত হইবে না? যে ভাষায় সকলে কথোপকথন করে, তিনি সেই ভাষায় 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রণয়ন করিলেন। সেই দিন হইতে বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি। সেই দিন হইতে শুষ্ক তরুর মূলে জীবনবারি নিষিক্ত হইল।

সেই দিন হইতে সাধুভাষা, এবং অপর ভাষা, দুই প্রকার ভাষাতেই বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রণয়ন হইতে

লাগিল, ইহা দেখিয়া সংস্কৃতব্যবসায়ীরা জ্বালাতন হইয়া উঠিলেন; অপর ভাষা, তাঁহাদিগের বড় ঘৃণ্য। মদ্য, মুরগী এবং টেকচাঁদি বাঙ্গালা এককালে প্রচলিত হইয়া ভট্টাচার্য্যগোষ্ঠীকে আকুল করিয়া তুলিল। এক্ষণে বাঙ্গালা ভাষার সমালোচকেরা দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছেন। এক দল খাঁটি সংস্কৃতবাদী—যে গ্রন্থে সংস্কৃতমূলক শব্দ ভিন্ন অন্য শব্দ ব্যবহার হয়, তাহা তাঁহাদের বিবেচনায় ঘৃণার যোগ্য। অপর সম্প্রদায় বলেন, তোমাদের ও কচকচি বাঙ্গালা নহে। উহা আমরা কোন গ্রন্থে ব্যবহার করিতে দিব না। যে ভাষা বাঙ্গালা সমাজে প্রচলিত, যাহাতে বাঙ্গালার নিত্য কার্য্য সকল সম্পাদিত হয়, যাহা সকল বাঙ্গালীতে বুঝে, তাহাই বাঙ্গালা ভাষা—তাহাই গ্রন্থাদির ব্যবহারের যোগ্য। অধিকাংশ সুশিক্ষিত ব্যক্তি এক্ষণে এই সম্প্রদায়ভুক্ত। আমরা উভয় সম্প্রদায়ের এক এক মুখপাত্রের উক্তি এই প্রবন্ধে সমালোচিত করিয়া স্থূল বিষয়ের মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিব।

সংস্কৃতবাদী সম্প্রদায়ের মুখপাত্রস্বরূপ আমরা রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়কে গ্রহণ করিতেছি। বিদ্যাসাগর প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত থাকিতে আমরা ন্যায়রত্ন মহাশয়কে এই সম্প্রদায়ের মুখপাত্রস্বরূপ গ্রহণ করিলাম, ইহাতে সংস্কৃতবাদীদিগের প্রতি কিছু অবিচার হয়, ইহা আমরা স্বীকার করি। ন্যায়রত্ন মহাশয় সংস্কৃতে সুশিক্ষিত, কিন্তু ইংরেজি জানেন না—পাশ্চাত্য সাহিত্য তাঁহার নিকট পরিচিত নহে। তাঁহার প্রণীত বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাবে ইংরেজি বিদ্যার একটু পরিচয় দিতে গিয়া ন্যায়রত্ন মহাশয় কিছু লোক হাসাইয়াছেন। আমরা সেই গ্রন্থ হইতে সিদ্ধ করিতেছি যে, পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুশীলনে যে সুফল জন্মে, ন্যায়রত্ন মহাশয় তাহাতে বঞ্চিত। যিনি এই সুফলে বঞ্চিত, বিচার্য্য বিষয়ে তাঁহার মত তাঁহার নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যেই যে অধিক গৌরব প্রাপ্ত হইবে, এমত বোধ হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ যে সকল সংস্কৃতবাদী পণ্ডিতদিগের মত, অধিকতর আদরণীয়, তাঁহারা কেহই সেই মত স্বপ্রণীত কোন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই। সুতরাং তাঁহাদের কাহারও নাম উল্লেখ করিতে আমরা সক্ষম হইলাম না। ন্যায়রত্ন মহাশয় স্বপ্রণীত উক্ত সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাবে আপনার মতগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। এই জন্যই তাঁহাকে এ সম্প্রদায়ের মুখপাত্রস্বরূপ ধরিতে হইল। তিনি 'আলালের ঘরের দুলাল' হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন যে, "এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, সর্ব্ববিধ গ্রন্থ রচনায় এইরূপ ভাষা আদর্শস্বরূপ হইতে পারে কি-না?—আমাদের বিবেচনায় কখনই না। আলালের ঘরের দুলাল বল, হুতোমপেচা বল, মৃণালিনী বল—পত্নী বা পাঁচ জন বয়স্যের সহিত পাঠ করিয়া আমোদ করিতে পারি—কিন্তু পিতাপুত্রে একত্র বসিয়া অসঙ্কুচিতমুখে কখনই ও সকল পড়িতে পারি না। বর্ণনীয় বিষয়ের লজ্জাজনকতা উহা পড়িতে না পারিবার কারণ নহে, ঐ ভাষারই কেমন একরূপ ভঙ্গী আছে, যাহা গুরুজনসমক্ষে উচ্চরণ করিতে লজ্জা বোধ হয়। পাঠকগণ! যদি আপনাদের উপর বিদ্যালয়ের পুস্তকনির্ব্বাচনের ভার হয়, আপনারা আলালী ভাষায় লিখিত কোন পুস্তককে পাঠ্যরূপে নির্দেশ করিতে পারিবেন কি?—বোধ হয়, পারিবেন না। কেন পারিবেন না?—ইহার উত্তরে অবশ্য এই কথা বলিবেন যে, ওরূপ ভাষা বিশেষ শিক্ষাপ্রদ নয় এবং উহা সর্ব্বসমক্ষে পাঠ করিতে লজ্জা বোধ হয়। অতএব বলিতে হইবে যে, আলালী ভাষা সম্প্রদায়বিশেষের বিশেষ মনোরঞ্জিকা হইলেও, উহা সর্ব্ববিধ পাঠকের পক্ষে উপযুক্ত নহে। যদি তাহা না হইল, তবে আবার জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, ঐরূপ ভাষায় গ্রন্থরচনা করা উচিত কি-না? আমাদের বোধে অবশ্য উচিত। যেমন ফলারে বসিয়া অনবরত মিঠাই মণ্ডা খাইলে জিহ্বা একরূপ বিকৃত হইয়া যায়—মধ্যে মধ্যে আদার কুচি ও কুমড়ার খাট্টা মুখে না দিলে

সে বিকৃতির নিবারণ হয় না, সেইরূপ কেবল বিদ্যাসাগরী রচনা শ্রবণে কর্ণের যে একরূপ জ্বর জন্মে, তাহার পরিবর্ত্তন করণার্থ মধ্যে মধ্যে অপরবিধ রচনা শ্রবণ করা পাঠকদিগের আবশ্যক।

আমরা ইহাতে বুঝিতেছি যে, প্রচলিত ভাষা ব্যবহারের পক্ষে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের প্রধান আপত্তি যে, পিতা পুত্রে একত্রে বসিয়া এরূপ ভাষা ব্যবহার করিতে পারে না। বুঝিলাম যে, ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বিবেচনায় পিতা পুত্রে বড় বড় সংস্কৃত শব্দে কথোপকথন করা কর্ত্তব্য; প্রচলিত ভাষায় কথাবার্ত্তা হইতে পারে না। এই আইন চলিলে বোধ হয়, ইহার পর শুনিব যে, শিশু মাতার কাছে খাবার চাহিবার সময় বলিবে, "হে মাতঃ, খাদ্যং দেহি মে" এবং ছেলে বাপের কাছে জুতার আবদার করিবার সময় বলিবে, "ছিন্নেয়ং পাদুকা মদীয়া"। ন্যায়রত্ন মহাশয় সকলের সম্মুখে সরল ভাষা ব্যবহার করিতে লজ্জা বোধ করেন, এবং সেই ভাষাকে শিক্ষাপ্রদ বিবেচনা করেন না, ইহা শুনিয়া তাঁহার ছাত্রদিগের জন্য আমরা বড় দুঃখিত হইলাম। বোধ হয়, তিনি স্বীয় ছাত্রগণকে উপদেশ দিবার সময়ে লজ্জাবশতঃ দেড়গজী সমাসপরম্পরা বিন্যাসে তাহাদিগের মাথা ঘুরাইয়া দেন। তাহারা যে এবংবিধ শিক্ষায় অধিক বিদ্যা উপার্জন করে, এমত বোধ হয় না। কেন না, আমাদের স্থূল বুদ্ধিতে ইহাই উপলব্ধি হয় যে, যাহা বুঝিতে না পারা যায়, তাহা হইতে কিছু শিক্ষালাভ হয় না। আমাদের এইরূপ বোধ আছে যে, সরল ভাষাই শিক্ষাপ্রদ। ন্যায়রত্ন মহাশয় কেন সরল ভাষাকে শিক্ষাপ্রদ নহে বিবেচনা করিয়াছেন, তাহা আমরা অনেক ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না। বোধ হয়, বাল্যসংস্কার ভিন্ন আর কিছুই সরল ভাষার প্রতি তাঁহার বীতরাগের কারণ নহে। আমরা আরও বিস্মিত হইয়া দেখিলাম যে, তিনি স্বয়ং যে ভাষায়বাঙ্গালাসাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব লিখিয়াছেন, তাহাও সরল প্রচলিত ভাষা। টেকচাঁদী ভাষার সঙ্গে এবং তাঁহার ভাষার সঙ্গে কোন প্রভেদ নাই, প্রভেদ কেবল এই যে, টেকচাঁদে রঙ্গরস আছে, ন্যায়রত্নে কোন রঙ্গরস নাই। তিনি যে বলিয়াছেন যে, পিতা পুত্রে একত্র বসিয়া অসঙ্কুচিত মুখে টেকচাঁদী ভাষা পড়িতে পারা যায় না, তাহার প্রকৃত কারণ টেকচাঁদে রঙ্গরস আছে। বাঙ্গালাদেশে পিতা পুত্রে একত্র বসিয়া রঙ্গরস পড়িতে পারে না। সরলচিত্ত অধ্যাপক অতটুকু বুঝিতে না পারিয়াই বিদ্যাসাগরী ভাষার মহিমা কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ভাষা হইতে রঙ্গরস উঠাইয়া দেওয়া যদি ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের মত হয়, তবে তাঁহারা সেই বিষয়ে যত্নবান্ হউন। কিন্তু তাহা বলিয়া অপ্রচলিত ভাষাকে সাহিত্যের ভাষা করিতে চেষ্টা করিবেন না।

ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মত সমালোচনায় আর অধিক কাল হরণ করিবার আমাদিগের ইচ্ছা নাই। আমরা এক্ষণে সুশিক্ষিত অথবা নব্য সম্প্রদায়ের মত সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব। এই সম্প্রদায়ের সকলের মত একরূপ নহে। ইহার মধ্যে এক দল এমন আছেন যে, তাঁহারা কিছু বাড়াবাড়ি করিতে প্রস্তুত। তন্মধ্যে বাবু শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় গত বৎসর কলিকাতা রিভিউতে বাঙ্গালা ভাষার বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। প্রবন্ধটি উৎকৃষ্ট। তাঁহার মতগুলি অনেক স্থলে সুসঙ্গত এবং আদরণীয়। অনেক স্থলে তিনি কিছু বেশী গিয়াছেন। বহুবচন জ্ঞাপনে গণ শব্দ ব্যবহার করার প্রতি তাঁহার কোপদৃষ্টি। বাঙ্গালায় লিঙ্গভেদ তিনি মানেন না। পৃথিবী যে বাঙ্গালায় স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দ, ইহা তাঁহার অসহ্য। বাঙ্গালায় সন্ধি তাঁহার চক্ষুঃশূল। বাঙ্গালায় তিনি 'জনৈক' লিখিতে দিবেন না। ত্ব প্রত্যয়ান্ত এবং য প্রত্যয়ান্ত শব্দ ব্যবহার করিতে দিবেন না। সংস্কৃত সংখ্যাবাচক শব্দ, যথা–একাদশ বা চত্বারিংশৎ বা দুই শত ইত্যাদি বাঙ্গালায় ব্যবহার করিতে দিবেন না। ভ্রাতা, কল্য, কর্ণ, স্বর্ণ, তাম্র, পত্র, মস্তক, অশ্ব ইত্যাদি

শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহার করিতে দিবেন না। ভাই, কাল, কন, সোণা, কেবল এই সকল শব্দ ব্যবহার হইবে। এইরূপ তিনি বাঙ্গালাভাষার উপর অনেক দৌরাত্ম্য করিয়াছেন। তথাপি তিনি এই প্রবন্ধে বাঙ্গালাভাষা সম্বন্ধে অনেকগুলিন সারগর্ভ কথা বলিয়াছেন। বাঙ্গালা লেখকেরা তাহা স্মরণ রাখেন, ইহা আমাদের ইচ্ছা।

শ্যামাচরণ বাবু বলিয়াছেন এবং সকলেই জানেন যে, বাঙ্গালা শব্দ ত্রিবিধ। প্রথম, সংস্কৃতমূলক শব্দ, যাহার বাঙ্গালায় রূপান্তর হইয়াছে, যথা–গৃহ হইতে ঘর, ভ্রাতা হইতে ভাই। দ্বিতীয়, সংস্কৃতমূলক শব্দ, যাহার রূপান্তর হয় নাই। যথা–জল, মেঘ, সূর্য্য। তৃতীয়, যে সকল শব্দের সংস্কৃতের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই।

প্রথম শ্রেণীর শব্দ সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, রূপান্তরিত প্রচলিত সংস্কৃতমূলক শব্দের পরিবর্ত্তে কোন স্থানেই অরূপান্তরিত মূল সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে, যথা–মাথার পরিবর্ত্তে মস্তক, বামনের পরিবর্ত্তে ব্রাহ্মণ ইত্যাদি করা কর্ত্তব্য নহে। আমরা বলি যে, এক্ষণে বামনও যেমন প্রচলিত ব্রাহ্মণও সেইরূপ প্রচলিত; পাতাও যেরূপ প্রচলিত, পত্র ততদূর না হউক, প্রায় সেইরূপ প্রচলিত, ভাই যেরূপ প্রচলিত। ভ্রাতা ততদূর না হউক, প্রায় সেইরূপ প্রচলিত। যাহা প্রচলিত হইয়াছে, তাহার উচ্ছেদে কোন ফল নাই এবং উচ্ছেদ সম্ভবও নহে। কেহ যত্ন করিয়া মাতা, পিতা, ভ্রাতা, গৃহ, তাম্র বা মস্তক ইত্যাদি শব্দকে বাঙ্গালা ভাষা হইতে বহিষ্কৃত করিতে পারিবেন না। আর বহিষ্কৃত করিয়াই বা ফল কি? এ বাঙ্গালা দেশে কোন্ চাষা আছে যে, ধান্য, পুষ্করিণী, গৃহ বা মস্তক ইত্যাদি শব্দের অর্থ বুঝে না। যদি সকলে বুঝে, তবে কি দোষে এই শ্রেণীর শব্দগুলি বধার্হ? বরং ইহাদের পরিত্যাগে ভাষা কিয়দংশে ধনশূন্য হইবে মাত্র। নিষ্কারণ ভাষাকে ধনশূন্যা করা কোন ক্রমে বাঞ্ছনীয় নহে। আর কতকগুলি এমত শব্দ আছে যে, তাহাদের রূপান্তর ঘটিয়াছে আপাতত বোধ হয়, কিন্তু বাস্তবিক রূপান্তর ঘটে নাই, কেবল সাধারণের উচ্চারণের বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে। সকলেই উচ্চরণ করে 'খেউরি' কিন্তু ক্ষৌরী লিখিলে সকলে বুঝে যে, এই সেই 'খেউরি' শব্দ। এ স্থলে ক্ষৌরীকে পরিত্যাগ করিয়া খেউরি প্রচলিত করায় কোন লাভ নাই। বরং এমত স্থলে আদিম সংস্কৃত রূপটি বজায় রাখিলে ভাষার স্থায়িত্ব জন্মে। কিন্তু এমন অনেকগুলি শব্দ আছে, যে তাহার আদিম রূপ সাধারণের প্রচলিত বা সাধারণের বোধগম্য নহে–তাহার অপভ্রংশই প্রচলিত এবং সকলের বোধগম্য। এমত স্থলেই আদিম রূপ কদাচ ব্যবহার্য্য নহে।

যদিও আমরা এমন বলি না যে, 'ঘর' প্রচলিত আছে বলিয়া গৃহশব্দের উচ্ছেদ করিতে হইবে, অথবা মাথা শব্দ প্রচলিত আছে বলিয়া মস্তক শব্দের উচ্ছেদ করিতে হইবে; কিন্তু আমরা এমত বলি যে, অকারণে ঘর শব্দের পরিবর্ত্তে গৃহ, অকারণে মাথার পরিবর্ত্তে মস্তক, অকারণে পাতার পরিবর্ত্তে পত্র এবং তামার পরিবর্ত্তে তাম্র ব্যবহার করা উচিত নহে। কেন না, ঘর, মাথা, পাতা, তামা বাঙ্গালা, আর গৃহ, মস্তক, পত্র, তাম্র সংস্কৃত। বাঙ্গালা লিখিতে গিয়া অকারণে বাঙ্গালা ছাড়িয়া সংস্কৃত কেন লিখিব? আর দেখা যায় যে, সংস্কৃত ছাড়িয়া বাঙ্গালা শব্দ ব্যবহার করিলে রচনা অধিকতর মধুর, সুস্পষ্ট ও তেজস্বী হয়। 'হে ভ্রাতাঃ' বলিয়া যে ডাকে, বোধ হয় যেন সে যাত্রা করিতেছে; 'ভাই রে' বলিয়া যে ডাকে, তাহার ডাকে মন উছলিয়া উঠে। এতএব আমরা ভ্রাতা শব্দ উঠাইয়া দিতে চাই না বটে, কিন্তু সচরাচর আমরা ভাই শব্দটি ব্যবহার করিতে চাই। ভ্রাতা শব্দ রাখিতে চাই, তাহার কারণ এই যে, সময়ে সময়ে তদ্ব্যবহারে বড়

উপকার হয়। 'ভ্রাতৃভাব' এবং 'ভাইভাব', 'ভ্রাতৃত্ব' এবং 'ভাইগিরি' এতদুভয়ের তুলনায় বুঝা যাইবে যে, কেন ভ্রাতৃ শব্দ বাঙ্গালায় বজায় রাখা উচিত। এই স্থলে বলিতে হয় যে, আজিও অকারণে প্রচলিত বাঙ্গালা ছাড়িয়া সংস্কৃত ব্যবহারে, ভাই ছাড়িয়া অকারণে ভ্রাতৃ শব্দের ব্যবহারে অনেক লেখকের বিশেষ অনুরক্তি আছে। অনেক বাঙ্গালা রচনা যে নীরস, নিস্তেজ এবং অস্পষ্ট, ইহাই তাহার কারণ।

দ্বিতীয় শ্রেণীর শব্দ, অর্থাৎ যে সকল সংস্কৃত শব্দ রূপান্তর না হইয়াই বাঙ্গালায় প্রচলিত আছে, তৎসম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। তৃতীয় শ্রেণী অর্থাৎ যে সকল শব্দ সংস্কৃতের সহিত সম্বন্ধশূন্য, তৎসম্বন্ধে শ্যামাচরণবাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত সারগর্ভ এবং আমরা তাহার সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। সংস্কৃতপ্রিয় লেখকদিগের অভ্যাস যে, এই শ্রেণীর শব্দ সকল তাঁহারা রচনা হইতে একেবারে বাহির করিয়া দেন। অন্যের রচনায় যে সকল শব্দের ব্যবহার শেলের ন্যায় তাঁহাদিগকে বিদ্ধ করে। ইহার পর মূর্খতা আমরা আর দেখি না। যদি কোন ধনবান্ ইংরেজের অর্থভাণ্ডারে হালি এবং বাদশাহী দুই প্রকার মোহর থাকে, এবং সেই ইংরেজ যদি জাত্যাভিমানের বশ হইয়া বিবির মাথাওয়ালা মোহর রাখিয়া, ফার্সি লেখা মোহরগুলি ফেলিয়া দেয়, তবে সকলেই সেই ইংরেজকে ঘোরতর মূর্খ বলিবে। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে, এই পণ্ডিতেরা সেই মত মূর্খ।

তাহার পরে অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দকে বাঙ্গালা ভাষায় নূতন সন্নিবেশিত করার ঔচিত্য বিচার্য্য। দেখা যায়, লেখকেরা ভূরি ভূরি অপ্রচলিত নূতন সংস্কৃত শব্দ প্রয়োজনে বা নিষ্প্রয়োজনে ব্যবহার করিয়া থাকেন। বাঙ্গালা আজিও অসম্পূর্ণ ভাষা, তাহার অভাব পূরণ জন্য অন্য অন্য ভাষা হইতে সময়ে সময়ে শব্দ কর্জ্জ করিতে হইবে। কর্জ্জ করিতে হইলে, চিরকেলে মহাজন সংস্কৃতের কাছেই ধার করা কর্ত্তব্য। প্রথমতঃ, সংস্কৃত মহাজনই পরম ধনী; ইহার রত্নময় শব্দভাণ্ডার হইতে যাহা চাও, তাহাই পাওয়া যায়; দ্বিতীয়তঃ, সংস্কৃত হইতে শব্দ লইলে, বাঙ্গালার সঙ্গে ভাল মিশে। বাঙ্গালার অস্থি, মজ্জা, শোণিত, মাংস সংস্কৃতেই গঠিত। তৃতীয়তঃ, সংস্কৃত হইতে নূতন শব্দ লইলে, অনেক বুঝিতে পারে; ইংরেজি বা আরবী হইতে লইলে কে বুঝিবে? 'মাধ্যাকর্ষণ' বলিলে কতক অর্থ অনভিজ্ঞ লোকেও বুঝে। 'গ্রাবিটেশ্যন্' বলিলে ইংরেজি যাহারা না বুঝে, তাহারা কেহই বুঝিবে না। অতএব যেখানে বাঙ্গালা শব্দ নাই, সেখানে অবশ্য সংস্কৃত হইতে অপ্রচলিত শব্দ গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু নিষ্প্রয়োজনে অর্থাৎ বাঙ্গালা শব্দ থাকিতে তদ্বাচক অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার যাঁহারা করেন, তাঁহাদের কিরূপ রুচি, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

মূল কথা, সাহিত্য কি জন্য? গ্রন্থ কি জন্য? যে পড়িবে, তাহার বুঝিবার জন্য। না বুঝিয়া, বহি বন্ধ করিয়া, পাঠক ত্রাহি ত্রাহি করিয়া ডাকিবে, বোধ হয় এ উদ্দেশ্যে কেহ গ্রন্থ লিখে না। যদি এ কথা সত্য হয়, তবে যে ভাষা সকলের বোধগম্য–অথবা যদি সকলের বোধগম্য কোন ভাষা না থাকে, তবে যে ভাষা অধিকাংশ লোকের বোধগম্য–তাহাতেই গ্রন্থ প্রণীত হওয়া উচিত। যদি কোন লেখকের এমন উদ্দেশ্য থাকে যে, আমার গ্রন্থ দুই চারি জন শব্দপণ্ডিতে বুঝুক, আর কাহারও বুঝিবার প্রয়োজন নাই, তবে তিনি গিয়া দুরূহ ভাষায় গ্রন্থপ্রণয়নে প্রবৃত্ত হউন।

যে তাঁহার যশ করে করুক, আমরা কখন যশ করিব না। তিনি দুই একজনের উপকার করিলে করিতে পারেন, কিন্তু আমরা তাঁহাকে পরোপকারকাতর খলস্বভাব পাষণ্ড বলিব।

তিনি জ্ঞানবিতরণে প্রবৃত্ত হইয়া, চেষ্টা করিয়া অধিকাংশ পাঠককে আপনার জ্ঞানভাণ্ডার হইতে দূরে রাখেন। যিনি যথার্থ গ্রন্থকার, তিনি জানেন যে, পরোপকার ভিন্ন গ্রন্থপ্রণয়নের উদ্দেশ্য নাই; জনসাধারণের জ্ঞানবৃদ্ধি বা চিত্তোন্নতি ভিন্ন রচনার অন্য উদ্দেশ্য নাই; অতএব যত অধিক ব্যক্তি গ্রন্থের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে, ততই অধিক ব্যক্তি উপকৃত–ততই গ্রন্থের সফলতা। জ্ঞানে মনুষ্যমাত্রেরই তুল্যাধিকার যদি সে সর্ব্বজনের প্রাপ্য ধনকে, তুমি এমত দুরূহ ভাষায় নিবদ্ধ রাখ যে, কেবল যে কয়জন পরিশ্রম করিয়া সেই ভাষা শিখিয়াছে, তাহারা ভিন্ন আর কেহ তাহা পাইতে পারিবে না, তবে তুমি অধিকাংশ মনুষ্যকে তাহাদিগের স্বত্ব হইতে বঞ্চিত করিলে। তুমি সেখানে বঞ্চক মাত্র।

তাই বলিয়া আমরা এমত বলিতেছি না যে, বাঙ্গালার লিখন পঠন হুতোমি ভাষায় হওয়া উচিত। তাহা কখন হইতে পারে না। যিনি যত চেষ্টা করুন, লিখনের ভাষা এবং কথনের ভাষা চিরকাল স্বতন্ত্র থাকিবে। কারণ, কথনের একং লিখনের উদ্দেশ্য ভিন্ন। কথনের উদ্দেশ্য কেবল সামান্য জ্ঞাপন, লিখনের উদ্দেশ্য শিক্ষাদান, চিত্তসঞ্চালন। এই মহৎ উদ্দেশ্য হুতোমি ভাষায় কখনও সিদ্ধ হইতে পারে না। হুতোমি ভাষা দরিদ্র, ইহার তত শব্দধন নাই; হুতোমি ভাষা নিস্তেজ, ইহার তেমন বাঁধন নাই; হুতোমি ভাষা অসুন্দর এবং যেখানে অশ্লীল নয়, সেখানে পবিত্রতাশূন্য। হুতোমি ভাষায় কখন গ্রন্থ প্রণীত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। যিনি হুতোম পেঁচা লিখিয়াছিলেন, তাঁহার রুচি বা বিবেচনার আমরা প্রশংসা করি না।

টেকচাঁদি ভাষা, হুতোমি ভাষার এক পৈঠা উপর। হাস্য ও করুণরসের ইহা বিশেষ উপযোগী। স্কচ্ কবি বর্ণস্ হাস্য ও করুণরসাত্মিকা কবিতায় স্কচ্ ভাষা ব্যবহার করিতেন, গম্ভীর এবং উন্নত বিষয়ে ইংরেজি ব্যবহার করিতেন। গম্ভীর এবং উন্নত বা চিন্তাময় বিষয়ে টেকচাঁদি ভাষায় কুলায় না। কেন না, এ ভাষাও অপেক্ষাকৃত দরিদ্র, দুর্ব্বল এবং অপরিমার্জ্জিত।

অতএব ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হইতেছে যে, বিষয় অনুসারেই রচনার ভাষার উচ্চতা বা সামান্যতা নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত। রচনার প্রধান গুণ এবং প্রথম প্রয়োজন, সরলতা এবং স্পষ্টতা। যে রচনা সকলেই বুঝিতে পারে, এবং পড়িবামাত্র যাহার অর্থ বুঝা যায়, অর্থগৌরব থাকিলে তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনা। তাহার পর ভাষার সৌন্দর্য, সরলতা এবং স্পষ্টতার সহিত সৌন্দর্য্য মিশাইতে হইবে। অনেক রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্য–সে স্থলে সৌন্দর্য্যের অনুরোধে শব্দের একটু অসাধারণতা সহ্য করিতে হয়। প্রথমে দেখিবে, তুমি যাহা বলিতে চাও, কোন্ ভাষায় তাহা সর্বাপেক্ষা পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত হয়। যদি সরল প্রচলিত কথাবার্ত্তার ভাষায় তাহা সর্ব্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট এবং সুন্দর হয়, তবে কেন উচ্চভাষার আশ্রয় লইবে? যদি সে পক্ষে টেকচাঁদি বা হুতোমি ভাষায় সকলের অপেক্ষা কার্য্য সুসিদ্ধ হয়, তবে তাহাই ব্যবহার করিবে। যদি তদপেক্ষা বিদ্যাসাগর বা ভূদেববাবুপ্রদর্শিত সংস্কৃতবহুল ভাষায় ভাবের অধিক স্পষ্টতা এবং সৌন্দর্য্য হয়, তবে সামান্য ভাষা ছাড়িয়া সেই ভাষার আশ্রয় লইবে। যদি তাহাতেও কার্য্য সিদ্ধ না হয়, আরও উপরে উঠিবে; প্রয়োজন হইলে তাহাতেও আপত্তি নাই–নিষ্প্রয়োজনেই আপত্তি। বলিবার কথাগুলি পরিস্ফুট করিয়া বলিতে হইবে–যতটুকু বলিবার আছে, সবটুকু বলিবে–তজ্জন্য ইংরেজি, ফার্সি, আরবি, সংস্কৃত, গ্রাম্য, বন্য, যে ভাষার শব্দ প্রয়োজন, তাহা গ্রহণ করিবে, অশ্লীল ভিন্ন কাহাকেও ছাড়িবে না। তার পর সেই রচনাকে সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট করিবে–কেন না, যাহা অসুন্দর, মনুষ্যচিত্তের উপরে তাহার শক্তি অল্প। এই উদ্দেশ্যগুলি যাহাতে সরল প্রচলিত ভাষায় সিদ্ধ হয়, সেই চেষ্টা দেখিবে–লেখক যদি লিখিতে

জানেন, তবে সে চেষ্টা প্রায় সফল হইবে। আমরা দেখিয়াছি, সরল প্রচলিত ভাষা অনেক বিষয়ে সংস্কৃতবহুল ভাষার অপেক্ষা শক্তিমতী। কিন্তু যদি যে সরল প্রচলিত ভাষায় সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হয়, তবে কাজে কাজেই সংস্কৃতবহুল ভাষার আশ্রয় লইতে হইবে। প্রয়োজন হইলে নিঃসঙ্কোচে সে আশ্রয় লইবে।

ইহাই আমাদের বিবেচনায় বাঙ্গালা রচনার উৎকৃষ্ট রীতি। নব্য ও প্রাচীন উভয় সম্প্রদায়ের পরামর্শ ত্যাগ করিয়া, এই রীতি অবলম্বন করিলে, আমাদিগের বিবেচনায় ভাষা শক্তিশালিনী, শব্দৈশ্বর্য্যে পুষ্টা এবং সাহিত্যালঙ্কারে বিভূষিতা হইবে।

লেখক-পরিচিতি

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৩৮ সালের ২৭শে জুন চব্বিশ পরগনা জেলার কাঁঠালপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৫৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ব্যাচের যে দুজন ছাত্র বি.এ. পাস করেন, বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন তাঁদের একজন। কর্মজীবনে তিনি ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, পরে ডেপুটি কালেক্টর হন। চব্বিশ পরগনা জেলার বারুইপুরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট থাকা অবস্থায় বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রথম দুটি বিখ্যাত উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫) ও 'কপালকুণ্ডলা' (১৮৬৬) রচনা করেন। উপন্যাস দুটি দ্রুত প্রচার লাভ করে। পরবর্তীকালে ১৮৮৭ সালের মধ্যে তাঁর অন্যান্য গদ্যরচনাসহ মোট চৌদ্দটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়। বাংলা উপন্যাস ও বাংলা গদ্যসাহিত্যের অন্যান্য শাখায় উৎকর্ষ সাধনে বঙ্কিমচন্দ্রের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ কারণে তাঁকে বাংলা আধুনিক উপন্যাসের জনক বলা হয়। তাঁর পূর্বে বাংলা উপন্যাস বলতে যা বোঝাত তা ছিল কতিপয় সংস্কৃত নাটক ও গল্প এবং কিছু ফারসি ও আরবি গল্পের অনুবাদ আর সেগুলি ছিল প্রধানত শিক্ষামূলক ও নীতিমূলক। এসব অতিক্রম করে বাংলা গদ্যের উৎকর্ষ সাধনে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর পূর্বসুরি ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নববাবু বিলাস' (১৮২৩) এবং প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮) থেকে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছিলেন এবং বাংলা সাহিত্যকে এমন একটি ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন যার প্রত্যক্ষ প্রভাবে বিকশিত হয়েছে বিশ শতকের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য। তিনি সমাজচিন্তার সাথে মনোচিন্তনের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে উপন্যাসে দিয়েছেন ভিন্নমাত্রা। মীর মশাররফ হোসেনসহ বহু লেখকের ওপর তাঁর অনিবার্য প্রভাব দেখা যায়। বাংলা সাময়িকী সাহিত্যের প্রসারেও বঙ্কিমচন্দ্রের অবদান অসামান্য। তাঁর সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' (১৮৭২) পত্রিকার মাধ্যমে একটি নতুন লেখকগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটে। ১৮৯৪ সালের ৮ই এপ্রিল এই কৃতী মনীষী মৃত্যুবরণ করেন।

মূল-বক্তব্য

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধে বাংলাগদ্য লেখার রীতি কী হবে সে বিষয়ে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিজের মত প্রদান করেছেন। উনিশ শতকের সূচনাতে বাংলাগদ্যের উদ্ভব হলেও দীর্ঘ অর্ধ শতাব্দী পেরিয়ে যাবার পরও যখন গদ্য লেখার রীতিনীতি বিষয়ে লেখকগণ সহমতে পৌঁছতে পারেন নি, তখন তিনি স্বমত উল্লেখ করেন। সংস্কৃতবাদীদের মত পর্যালোচনার পর তিনি প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' ও কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম পেঁচার নকশা'র গদ্যভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করে একটি মধ্যপন্থা গদ্যভঙ্গির পক্ষে মত দেন। এই গদ্যভঙ্গি সংস্কৃতের মতো শব্দকাঠিন্যে জর্জর নয়, আবার আলালী বা হুতোমী বাংলার মতো সরাসরি মুখেরও কথা নয়। এ দুয়ের সমন্বয়ে একটি গদ্যভঙ্গি তিনি প্রস্তাব করেন, যেখানে প্রয়োজনানুসারে সব ধরনের শব্দই আদরণীয় হবে।

সভ্যতার সংকট

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আজ আমার বয়স আশি বৎসর পূর্ণ হল, আমার জীবনক্ষেত্রের বিস্তীর্ণতা আজ আমার সম্মুখে প্রসারিত। পূর্বতম দিগন্তে যে জীবন আরম্ভ হয়েছিল তার দৃশ্য অপর প্রান্ত থেকে নিঃসক্ত দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি এবং অনুভব করতে পারছি যে, আমার জীবনের এবং সমস্ত দেশের মনোবৃত্তির পরিণতি দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেছে। সেই বিচ্ছিন্নতার মধ্যে গভীর দুঃখের কারণ আছে।

বৃহৎ মানববিশ্বের সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় আরম্ভ হয়েছে সেদিনকার ইংরেজ জাতির ইতিহাসে। আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে উদ্‌ঘাটিত হল একটি মহৎ সাহিত্যের উচ্চশিখর থেকে ভারতের এই আগন্তুকের চরিত্রপরিচয়। তখন আমাদের বিদ্যালাভের পথ্য-পরিবেশনে প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্য ছিল না। এখনকার যে বিদ্যা জ্ঞানের নানা কেন্দ্র থেকে বিশ্বপ্রকৃতির পরিচয় ও তার শক্তির রহস্য নতুন নতুন করে দেখাচ্ছে তার অধিকাংশ ছিল তখন নেপথ্যে অগোচরে। প্রকৃতিতত্ত্বে বিশেষজ্ঞদের সংখ্যা ছিল অল্পই। তখন ইংরেজি ভাষার ভিতর দিয়ে ইংরেজি সাহিত্যকে জানা ও উপভোগ করা ছিল মার্জিতমনা বৈদগ্ধ্যের পরিচয়। দিনরাত্রি মুখরিত ছিল বার্কের বাগ্মিতায়, মেকলের ভাষাপ্রবাহের তরঙ্গভঙ্গে; নিয়তই আলোচনা চলত শেক্সপিয়ারের নাটক নিয়ে, বায়রনের কাব্য নিয়ে এবং তখনকার পলিটিক্সে সর্বমানবের বিজয়ঘোষণায়। তখন আমরা স্বজাতির স্বাধীনতার সাধনা আরম্ভ করেছিলুম, কিন্তু অন্তরে অন্তরে ছিল ইংরেজ জাতির ঔদার্যের প্রতি বিশ্বাস। সে বিশ্বাস এত গভীর ছিল যে একসময় আমাদের সাধকেরা স্থির করেছিলেন যে, এই বিজিত জাতির স্বাধীনতার পথ বিজয়ী জাতির দাক্ষিণ্যের দ্বারাই প্রশস্ত হবে। কেননা, একসময় অত্যাচারপ্রপীড়িত জাতির আশ্রয়স্থল ছিল ইংলন্ডে। যারা স্বজাতির সম্মান রক্ষার জন্য প্রাণপণ করছিল তাদের অকুণ্ঠিত আসন ছিল ইংলন্ডে। মানবমৈত্রীর বিশুদ্ধ পরিচয় দেখেছি ইংরেজ-চরিত্রে, তাই আন্তরিক শ্রদ্ধা নিয়ে ইংরেজকে হৃদয়ের উচ্চাসনে বসিয়েছিলেম। তখনো সাম্রাজ্যমদমত্ততায় তাদের স্বভাবের দাক্ষিণ্য কলুষিত হয় নি।

আমার যখন বয়স অল্প ছিল ইংলন্ডে গিয়েছিলেম, সেইসময় জন্ ব্রাইটের মুখ থেকে পার্লামেন্টে এবং বাহিরে কোনো কোনো সভায় যে বক্তৃতা শুনেছিলেম তাতে শুনেছি চিরকালের ইংরেজের বাণী। সেই বক্তৃতায় হৃদয়ের ব্যাপ্তি জাতিগত সকল সংকীর্ণ সীমাকে অতিক্রম করে যে প্রভাব বিস্তার করেছিল সে আমার আজ পর্যন্ত মনে আছে এবং আজকের এই শ্রীভ্রষ্ট দিনেও আমার পূর্বস্মৃতিকে রক্ষা করছে। এই পরনির্ভরতা নিশ্চয়ই আমাদের শ্লাঘার বিষয় ছিল না। কিন্তু এর মধ্যে এইটুকু প্রশংসার বিষয় ছিল যে, আমাদের আবহমান কালের অনভিজ্ঞতার মধ্যেও মনুষ্যত্বের যে-একটি মহৎ রূপ সেদিন দেখেছি, তা বিদেশীয়কে আশ্রয় করে প্রকাশ পেলেও, তাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করবার শক্তি আমাদের ছিল ও কুণ্ঠা আমাদের মধ্যে ছিল না। কারণ, মানুষের মধ্যে যা-কিছু শ্রেষ্ঠ তা সংকীর্ণভাবে কোনো জাতির মধ্যে বদ্ধ হতে পারে না, তা

কৃপণের অবরুদ্ধ ভাণ্ডারের সম্পদ নয়। তাই ইংরেজের যে সাহিত্যে আমাদের মন পুষ্টিলাভ করেছিল আজ পর্যন্ত তার বিজয়শঙ্খ আবার মনে মন্দ্রিত হয়েছে।

'সিভিলিজেশন', যাকে আমরা সভ্যতা নাম দিয়ে তর্জমা করেছি, তার যথার্থ প্রতিশব্দ আমাদের ভাষার পাওয়া সহজ নয়। এই সভ্যতার যে রূপ আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল মনু তাকে বলেছেন সদাচার। অর্থাৎ, তা কতকগুলি সামাজিক নিয়মের বন্ধন। সেই নিয়মগুলির সম্বন্ধে প্রাচীনকালে যে ধারণা ছিল সেও একটি সংকীর্ণ ভূগোলখণ্ডের মধ্যে বদ্ধ। সরস্বতী ও দৃশ্যদ্বতী নদীর মধ্যবর্তী যে দেশ ব্রহ্মাবর্ত নামে বিখ্যাত ছিল সেই দেশে যে আচার পারম্পর্যক্রমে চলে এসেছে তাকেই বলে সদাচার। অর্থাৎ, এই আচারের ভিত্তি প্রথার উপরেই প্রতিষ্ঠিত—তার মধ্যে যত নিষ্ঠুরতা, যত অবিচারই থাক্। এই কারণে প্রচলিত সদাচার আমাদের আচার-ব্যবহারাকেই প্রাধান্য দিয়ে চিত্তের স্বাধীনতা নির্বিচারে অপহরণ করেছিল। সদাচারের যে আদর্শ একদা মনু ব্রহ্মাবর্তে প্রতিষ্ঠিত দেখেছিলেন সেই আদর্শ ক্রমশ লোকাচারকে আশ্রয় করলে। আমি যখন জীবন আরম্ভ করেছিলুম তখন ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে এই বাহ্য আচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেশের শিক্ষিত মনে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। রাজনারায়ণবাবু কর্তৃক বর্ণিত তখনকার কালের শিক্ষিতসম্প্রদায়ের ব্যবহারের বিবরণ পড়লে সে কথা স্পষ্ট বোঝা যাবে। এই সদাচারের স্থলে সভ্যতার আদর্শকে আমরা ইংরেজ জাতির চরিত্রের সঙ্গে মিলিত করে গ্রহণ করেছিলেম। আমাদের পরিবারে এই পরিবর্তন, কী ধর্মমতে কী লোকব্যবহারে, ন্যায়বুদ্ধির অনুশাসনে পূর্ণভাবে গৃহীত হয়েছিল। আমি সেই ভাবের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলুম এবং সেইসঙ্গে আমাদের স্বভাবিক সাহিত্যানুরাগ ইংরেজকে উচ্চাসনে বসিয়েছিল। এই গেল জীবনের প্রথম ভাগ। তার পর থেকে ছেদ আরম্ভ হল কঠিন দুঃখে। প্রত্যহ দেখতে পেলুম—সভ্যতাকে যারা চরিত্র-উৎস থেকে উৎসারিতরূপে স্বীকার করেছে, রিপুর প্রবর্তনায় তারা তাকে কী অনায়াসে লঙ্ঘন করতে পারে।

নিভৃতে সাহিত্যের রসসম্ভোগের উপকরণের বেষ্টন হতে একদিন আমাকে বেরিয়ে আসতে হয়েছিল। সেদিন ভারতবর্ষের জনসাধারণের যে নিদারুণ দারিদ্র্য আমার সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হল তা হৃদয়বিদারক। অন্ন বস্ত্র পানীয় শিক্ষা আরোগ্য প্রভৃতি মানুষের শরীরমনের পক্ষে যা-কিছু অত্যাবশ্যক তার এমন নিরতিশয় অভাব বোধ হয় পৃথিবীর আধুনিক শাসনচালিত কোনো দেশেই ঘটে নি। অথচ এই দেশ ইংরেজকে দীর্ঘকাল ধরে তার ঐশ্বর্য জুগিয়ে এসেছে। যখন সভ্যজগতের মহিমাধ্যানে একান্তমনে নিবিষ্ট ছিলেম তখন কোনোদিন সভ্যনামধারী মানব আদর্শের এতবড়ো নিষ্ঠুর বিকৃত রূপ কল্পনা করতেই পারি নি; অবশেষে দেখছি, একদিন এই বিকারের ভিতর দিয়ে বহুকোটি জনসাধারণের প্রতি সভ্যজাতির অপরিসীম অবজ্ঞাপূর্ণ ঔদাসীন্য।

যে যন্ত্রশক্তির সাহায্যে ইংরেজ আপনার বিশ্বকর্তৃত্ব রক্ষা করে এসেছে তার যথোচিত চর্চা থেকে এই নিঃসহায় দেশ বঞ্চিত। অথচ চক্ষের সামনের দেখলুম জাপান যন্ত্রচালনার যোগে দেখতে দেখতে সর্বতোভাবে কিরকম সম্পদ্‌বান হয়ে উঠল।

সেই জাপানের সমৃদ্ধি আমি স্বচক্ষে দেখে এসেছি, দেখেছি সেখানে স্বজাতির মধ্যে তার সভ্য শাসনের রূপ। আর দেখেছি রাশিয়ার মস্কাও নগরীতে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের

আরোগ্যবিস্তারের কী অসামান্য অকৃপণ অধ্যবসায়—সেই অধ্যবসায়ের প্রভাবে এই বৃহৎ সাম্রাজ্যের মূর্খতা ও দৈন্য ও আত্মাবমাননা অপসারিত হয়ে যাচ্ছে। এই সভ্যতা জাতিবিচার করে নি, বিশুদ্ধ মানবসম্বন্ধের প্রভাব সর্বত্র বিস্তার করেছে। তার দ্রুত এবং আশ্চর্য পরিণতি দেখে একই কালে ঈর্ষা এবং আনন্দ অনুভব করেছি। মস্কাও শহরে গিয়ে রাশিয়ার শাসনকার্যের একটি অসাধারণতা আমার অন্তরকে স্পর্শ করেছিল—দেখেছিলেম, সেখানকার মুসলমানদের সঙ্গে রাষ্ট্র-অধিকারের ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে অমুসলমানদের কোনো বিরোধ ঘটে না; তাদের উভয়ের মিলিত স্বার্থসম্বন্ধের ভিতরে রয়েছে শাসনব্যবস্থার যথার্থ সত্য ভূমিকা। বহুসংখ্যক পরজাতির উপর প্রভাব চালনা করে এমন রাষ্ট্রশক্তি আজ প্রধানত দুটি জাতির। হাতে আছে—এক ইংরেজ, আর-এক সোভিয়েট রাশিয়া। ইংরেজ এই পরজাতীয়ের পৌরুষ দলিত করে দিয়ে তাকে চিরকালের মতো নির্জীব করে রেখেছে। সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে রাষ্ট্রিক সম্বন্ধ আছে বহুসংখ্যক মরুচর মুসলমান জাতির—আমি নিজে সাক্ষ্য দিতে পারি, এই জাতিকে সকল দিকে শক্তিমান করে তোলবার জন্য তাদের অধ্যবসায় নিরন্তর। সকল বিষয়ে তাদের সহযোগী করে রাখবার জন্য সোভিয়েট গভর্নমেন্টের চেষ্টার প্রমাণ আমি দেখেছি এবং সে সম্বন্ধে কিছু পড়েছি। এইরকম গভর্নমেন্টের প্রভাব কোনো অংশে অসম্মানকর নয় এবং তাতে মনুষ্যত্বের হানি করে না। সেখানকার শাসন বিদেশীয় শক্তির নিদারুণ নিষ্পেষণী যন্ত্রের শাসন নয়। দেখে এসেছি, পারস্যদেশ একদিন দুই য়ুরোপীয় জাতির জাঁতার চাপে যখন পিষ্ট হচ্ছিল তখন সেই নির্মম আক্রমণের য়ুরোপীয় দ্রংষ্ট্রাঘাত থেকে আপনাকে মুক্ত করে কেমন করে এই নবজাগ্রত জাতি আত্মশক্তির পূর্ণতাসাধনে প্রবৃত্ত হয়েছে। দেখে এলেম, জরথুস্ট্রিয়ানদের সঙ্গে মুসলমানদের এক কালে যে সাংঘাতিক প্রতিযোগিতা ছিল বর্তমান সভ্যশাসনে তার সম্পূর্ণ উপশম হয়ে গিয়েছে। তার সৌভাগ্যের প্রধান কারণ এই যে, সে য়ুরোপীয় জাতির চক্রান্তজাল থেকে মুক্ত হতে পেরেছিল। সর্বান্তঃকরণে আজ আমি এই পারস্যের কল্যাণ কামনা করি। আমাদের প্রতিবেশী আফগানিস্থানের মধ্যে শিক্ষা এবং সমাজনীতির সেই সার্বজনীন উৎকর্ষ যদিচ এখনো ঘটে নি কিন্তু তার সম্ভাবনা অক্ষুণ্ন রয়েছে, তার একমাত্র কারণ—সভ্যতাগর্বিত কোনো য়ুরোপীয় জাতি তাকে আজও অভিভূত করতে পারে নি। এরা দেখতে দেখতে চার দিকে উন্নতির পথে, মুক্তির পথে, অগ্রসর হতে চলল।

ভারতবর্ষ ইংরেজের সভ্যশাসনের জগদ্দল পাথর বুকে নিয়ে তলিয়ে পড়ে রইল নিরুপায় নিশ্চলতার মধ্যে। চৈনিকদের মতন এতবড়ো প্রাচীন সভ্য জাতিকে ইংরেজ স্বজাতির স্বার্থসাধনের জন্য বলপূর্বক অহিফেনবিষে জর্জরিত করে দিলে এবং তার পরিবর্তে চীনের এক অংশ আত্মসাৎ করলে। এই অতীতের কথা যখন ক্রমশ ভুলে এসেছি তখন দেখলুম উত্তর-চীনকে জাপান গলাধঃকরণ করতে প্রবৃত্ত; ইংলণ্ডের রাষ্ট্রনীতিপ্রবীণেরা কী অবজ্ঞাপূর্ণ ঔদ্ধত্যের সঙ্গে সেই দস্যুবৃত্তিকে তুচ্ছ বলে গণ্য করেছিল। পরে এক সময়ে স্পেনের প্রজাতন্ত্র-গভর্নমেন্টের তলায় ইংলন্ড কি রকম কৌশলে ছিদ্র করে দিলে, তাও দেখলাম এই দূর থেকে। সেই সময়েই এও দেখেছি, একদল ইংরেজ সেই বিপদগ্রস্ত স্পেনের জন্য আত্মসমর্পণ করেছিলেন। যদিও ইংরেজের এই ঔদার্য প্রাচ্য চীনের সংকটে যথোচিত জাগ্রত হয় নি, তবু য়ুরোপীয় জাতির প্রজাস্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য যখন তাদের কোনো বীরকে প্রাণপাত করতে দেখলুম তখন আবার একবার মনে পড়ল, ইংরেজকে একদা মানবহিতৈষীরূপে দেখেছি এবং কী বিশ্বাসের সঙ্গে ভক্তি করেছি। য়ুরোপীয় জাতির স্বভাবগত সভ্যতার প্রতি বিশ্বাস ক্রমে কী করে

হারানো গেল তারই এই শোচনীয় ইতিহাস আজ আমাকে জানতে হল। সভ্যশাসনের চালনায় ভারতবর্ষের সকলের চেয়ে যে দুর্গতি আজ মাথা তুলে উঠেছে সে কেবল অন্ন বস্ত্র শিক্ষা এবং আরোগ্যের শোকাবহ অভাব মাত্র নয়; সে হচ্ছে ভারতবাসীর মধ্যে অতি নৃশংস আত্মবিচ্ছেদ, যার কোনো তুলনা দেখতে পাই নি ভারতবর্ষের বাইরে মুসলমান স্বায়ত্তশাসন-চালিত দেশে। আমাদের বিপদ এই যে, এই দুর্গতির জন্যে আমাদেরই সমাজকে একমাত্র দায়ী করা হবে। কিন্তু এই দুর্গতির রূপ যে প্রত্যহই ক্রমশ উৎকট হয়ে উঠেছে, সে যদি ভারতশাসনযন্ত্রের উর্ধ্বস্তরে কোনো-এক গোপন কেন্দ্রে প্রশ্রয়ের দ্বারা পোষিত না হত তা হলে কখনোই ভারত-ইতিহাসের এতবড়ো অপমানকর অসভ্য পরিণাম ঘটতে পারত না। ভারতবাসী যে বুদ্ধিসামর্থ্যে কোনো অংশে জাপানের চেয়ে ন্যূন, এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। এই দুই প্রাচ্যদেশের সর্বপ্রধান প্রভেদ এই, ইংরেজশাসনের দ্বারা সর্বতোভাবে অধিকৃত ও অভিভূত ভারত, আর জাপান এইরূপ কোনো পাশ্চাত্য জাতির পক্ষচ্ছায়ার আবরণ থেকে মুক্ত। এই বিদেশীয় সভ্যতা, যদি একে সভ্যতা বলো, আমাদের কী অপহরণ করেছে তা জানি; সে তার পরিবর্তে দণ্ড হাতে স্থাপন করেছে যাকে নাম দিয়েছে Law and order, বিধি এবং ব্যবস্থা, যা সম্পূর্ণ বাইরের জিনিস, যা দারোয়ানি মাত্র। পাশ্চাত্য জাতির সভ্যতা-অভিযানের প্রতি শ্রদ্ধা রাখা অসাধ্য হয়েছে। সে তার শক্তিরূপ আমাদের দেখিয়েছে, মুক্তিরূপ দেখাতে পারে নি। অর্থাৎ, মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধ সবচেয়ে মূল্যবান এবং যাকে যথার্থ সভ্যতা বলা যেতে পারে তার কৃপণতা এই ভারতীদের উন্নতির পথ সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ করে দিয়েছে। অথচ, আমার ব্যক্তিগত সৌভাগ্যক্রমে মাঝে মাঝে মহদাশয় ইংরেজের সঙ্গে আমার মিলন ঘটেছে। এই মহত্ত্ব আমি অন্য কোনো জাতির কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখতে পাই নি। এঁরা আমার বিশ্বাসকে ইংরেজ জাতির প্রতি আজও বেঁধে রেখেছেন। দৃষ্টান্তস্থলে এণ্ড্রুজের নাম করতে পারি; তাঁর মধ্যে যথার্থ ইংরেজকে, যথার্থ খ্রীস্টানকে, যথার্থ মানবকে বন্ধুভাবে অত্যন্ত নিকটে দেখবার সৌভাগ্য আমার ঘটেছিল। আজ মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষীতে স্বার্থসম্পর্কহীন তাঁর নির্ভীক মহত্ত্ব আরো জ্যোতির্ময় হয়ে দেখা দিয়েছে। তাঁর কাছে আমার এবং আমাদের সমস্ত জাতির কৃতজ্ঞতার নানা কারণ আছে, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে একটি কারণে আমি তাঁর কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞ। তরুণ বয়সে ইংরেজি সাহিত্যের পরিবেশের মধ্যে যে ইংরেজ জাতিকে আমি নির্মল শ্রদ্ধা একদা সম্পূর্ণচিত্তে নিবেদন করেছিলেম, আমার শেষবয়সে তিনি তারই জীর্ণতা ও কলঙ্ক-মোচনে সহায়তা করে গেলেন। তাঁর স্মৃতির সঙ্গে এই জাতির মর্মগত মাহাত্ম্য আমার মনে ধ্রুব হয়ে থাকবে। আমি এঁদের নিকটতম বন্ধু বলে গণ্য করেছি এবং সমস্ত মানবজাতির বন্ধু বলে মান্য করি। এঁদের পরিচয় আমার জীবনে একটি শ্রেষ্ঠ সম্পদ্‌রূপে সঞ্চিত হয়ে রইল। আমার মনে হয়েছে, ইংরেজের মহত্ত্বকে এঁরা সকলপ্রকার নৌকোডুবি থেকে উদ্ধার করতে পারবেন। এঁদের যদি না দেখতুম এবং না জানতুম তাহলে পাশ্চাত্য জাতির সম্বন্ধে আমার নৈরাশ্য কোথাও প্রতিবাদ পেত না।

এমন সময় দেখা গেল, সমস্ত য়ুরোপে বর্বরতা কী রকম নখদন্ত বিকাশ করে বিভীষিকা বিস্তার করতে উদ্যত। এই মানবপীড়নের মহামারী পাশ্চাত্য সভ্যতার মজ্জার ভিতর থেকে জাগ্রত হয়ে উঠে আজ মানবাত্মার অপমানে দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্যন্ত বাতাস কলুষিত করে দিয়েছে। আমাদের হতভাগ্য নিঃসহায় নীরন্ধ্র অকিঞ্চনতার মধ্যে আমরা কি তার কোনো আভাস পাই নি?

ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা একদিন না একদিন ইংরেজকে এই ভারতসাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে। কিন্তু কোন্ ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ করে যাবে? কী লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনাকে? একাধিক শতাব্দীর শাসনধারা যখন শুষ্ক হয়ে যাবে, তখন এ কী বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা দুর্বিষহ নিষ্ফলতাকে বহন করতে থাকবে? জীবনের প্রথম আরম্ভে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম য়ুরোপের অন্তরের সম্পদ এই সভ্যতার দানকে। আর আজ আমার বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল। আজ আশা করে আছি, পরিত্রাণকর্তার জন্মদিন আসছে আমাদের এই দারিদ্র্যলাঞ্ছিত কুটিরের মধ্যে; অপেক্ষা করে থাকব, সভ্যতার দৈববাণী সে নিয়ে আসবে, মানুষের চরম আশ্বাসের কথা মানুষকে এসে শোনাবে এই পূর্বদিগন্ত থেকেই। আজ পারের দিকে যাত্রা করেছি–পিছনের ঘাটে কী দেখে এলুম, কী রেখে এলুম, ইতিহাসের কী অকিঞ্চিৎকর উচ্ছিষ্ট সভ্যতাভিমানের পরিকীর্ণ ভগ্নস্তূপ! কিন্তু, মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব। আশা করব, মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। আর-একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে। মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি।

এই কথা আজ বলে যাব, প্রবলপ্রতাপশালীরও ক্ষমতা মদমত্ততা আত্মম্ভরিতা যে নিরাপদ নয় তারই প্রমাণ হবার দিন আজ সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে: নিশ্চিত এ সত্য প্রমাণিত হবে যে–

অধর্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি।
ওই মহামানব আসে,
দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে
মর্তধূলির ঘাসে ঘাসে।
সুরলোকে বেজে ওঠে শঙ্খ,
নরলোকে বাজে জয়ডঙ্ক,
এল মহাজন্মের লগ্ন।
আজি অমারাত্রির দুর্গতোরণ যত
ধূলিতলে হয়ে গেল ভগ্ন।
উদয়শিখরে জাগে মাভৈঃ মাভৈঃ রব
নবজীবনের আশ্বাসে।
'জয় জয় জয় রে মানব-অভ্যুদয়'
মন্দ্রি উঠিল মহাকাশে।

লেখক-পরিচিতি

১২৬৮ বঙ্গাব্দের ২৫শে বৈশাখ (১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই মে) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলকাতার সম্ভ্রান্ত ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আর মাতার নাম সারদা দেবী। রবীন্দ্রনাথ মা-বাবার চতুর্দশ সন্তান ও অষ্টম পুত্র। স্কুলজীবনে তিনি মনোযোগী ছিলেন না কিন্তু শিক্ষাজীবন তিনি যাপন করেন উন্মুক্তভাবে। তাই বাংলা মাধ্যম, ইংরেজি

মাধ্যম, বিদেশের স্কুল সর্বত্রই তিনি কমবেশি পড়েছেন। কিন্তু কোথাও কোর্স সমাপ্ত করেননি। ১৮৭৮ খ্রিষ্টাব্দের আগেই 'জ্ঞানাঙ্কুর' ও 'প্রতিবিম্ব' পত্রিকায় 'বনফুল' নামের কাজ এবং 'ভারতী' পত্রিকায় 'কবি-কাহিনী' নামের কাব্য রচনা করেন। সেই থেকে সাহিত্যরচনার প্রতি রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ দেখা যায়। তাই পরবর্তীকালে তিনি বাংলাসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, ছোটগল্পকার, প্রাবন্ধিক, সঙ্গীতরচয়িতা এবং সেরা দার্শনিক, সুরস্রষ্টা, চিত্রশিল্পী ইত্যাদি হিসেবে অভিহিত হন।

প্রবন্ধরচনায় রবীন্দ্রনাথ বিশেষ ভূমিকা রাখেন। প্রত্যক্ষ বক্তব্য প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে তিনি প্রবন্ধে নানা রূপ প্রদান করেন। তাই লঘু প্রবন্ধ যেমন তিনি লেখেন, তেমনি অতিগুরু প্রবন্ধ রচনাও তিনি করেছেন। এ প্রসঙ্গে 'বিচিত্র প্রবন্ধ' (১৯০৭), 'শিক্ষা' (১৯০৮), 'শব্দতত্ত্ব' (১৯০৯), 'কালান্তর' (১৯৩৭) গ্রন্থের নাম করা যায়। 'সভ্যতার সংকট' তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ, যেখানে তিনি নিজের সারাজীবনের কথাকে এক গণ্ডুষে তুলে ধরেছেন।

১৮৮৩ সালের ৯ই ডিসেম্বর যশোরের (বর্তমান খুলনা) কন্যা ভবতারিণী দেবীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিয়ে হয়। ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ২২শে শ্রাবণ (১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই আগস্ট) তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

মূল বক্তব্য

'সভ্যতার সংকট' রবীন্দ্রজীবনের শেষপর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ। এটি পরে তাঁর 'কালান্তর' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রবন্ধের শুরুতেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, তাঁর আশি বছর পূর্ণ হয়েছে এবং তিনি যে বিশ্বাস নিয়ে জীবন শুরু করেছিলেন, তা দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেছে। এই প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের আত্মসমালোচনার অপূর্ব উদাহরণ, একই সাথে পাঠকেরও জীবনজিজ্ঞাসার পথনির্দেশ। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, প্রথম দিকে 'সভ্যজগতের মহিমাধ্যানে একান্ত মনে নিবিষ্ট ছিলেন তিনি। এই মহিমার বোধ তাঁর মধ্যে জাগিয়ে তুলেছিল ইংরেজি সাহিত্য ও ভাবুকদের নানান ভাবাদর্শ। এমনকি তিনি এও মনে করেছিলেন যে 'বিজিত জাতির স্বাধীনতার পথ বিজয়ী জাতির দাক্ষিণ্যের দ্বারাই প্রশস্ত হবে।' কিন্তু পরে স্বাভাবিকভাবেই ইংরেজি রসসম্ভোগের জগৎ থেকে রবীন্দ্রনাথ বেরিয়ে এসেছিলেন। এ প্রসঙ্গ তিনি নিজেই জানাচ্ছেন, 'সেদিন ভারতবর্ষের জনসাধারণের যে নিদারুণ দারিদ্র্য আমার সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হল তা হৃদয়বিদারক। অন্ন, বস্ত্র, পানীয়, শিক্ষা, আরোগ্য প্রভৃতি মানুষের শরীরমনের পক্ষে যা কিছু অত্যাবশ্যক তার এমন নিরতিশয় অভাব বোধ হয় পৃথিবীর আধুনিক শাসনচালিত কোনো দেশেই ঘটেনি।' তথাকথিত সভ্যতাকে এভাবেই এই শাসকরা 'রিপুর প্রবর্তনায়' অনায়াসে লঙ্ঘন করে গেছেন। রবীন্দ্রনাথ লক্ষ করেছেন, 'বহুকোটি জনসাধারণের প্রতি সভ্যজাতির' কী 'অপরিসীম অবজ্ঞাপূর্ণ ঔদাসীন্য।' এভাবেই তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। এখানেই তাঁর আত্মচেতনার জাগরণ এবং পাঠকের নিদ্রাভঙ্গ। রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন, একদা ইংরেজ জাতির প্রতি তিনি আকর্ষণ বোধ করেছিলেন এবং তার কারণসমূহ। তবে তিনি যে সেই আকর্ষণজাল ছিন্ন করেছেন এবং কেন করেছেন তারও কারণসমূহ তিনি উল্লেখ করেছেন। ইংরেজদের সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র রবীন্দ্রনাথকে ক্ষুব্ধ করেছিল। ইংরেজরা যা করেছে সভ্যনামধারী মানব আদর্শের এতবড় নিষ্ঠুর বিকৃত রূপ কল্পনা করতেই পারেননি রবীন্দ্রনাথ। অথচ এরই পাশাপাশি দেখেছেন জাপান, রাশিয়া, ইরান, এমনটি আফগানিস্তানে 'সর্বজনীন

উৎকর্ষে'র সম্ভাবনা। রবীন্দ্রনাথের সমীক্ষণ হলো, 'সভ্যতাগর্বিত কোনো ইউরোপীয় জাতি' তাদের 'অভির্ভূত করতে পারেনি' বলেই ওই দেশগুলোর পক্ষে সম্ভব হয়েছে এই উৎকর্ষের পথে এগিয়ে আসা। এভাবেই 'ইউরোপীয় জাতির স্বভাবগত সভ্যতার প্রতি' তিনি হারিয়েছেন তাঁর বিশ্বাস। জীবনান্তিকে দাঁড়িয়ে পাশ্চাত্য সভ্যতাকে 'সভ্যতা' বলা যায় কি-না, জেগেছে সেই সংশয়। প্রথম মহাযুদ্ধের সমাপ্তি এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রায় সূচনায় দাঁড়িয়ে কথিত সভ্যতার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যে কতটা বিচলিত হয়েছিলেন, এই লেখাটি পড়লেই তা বোঝা যাবে। এই প্রবন্ধের বিশেষ তাৎপর্য হচ্ছে, সারাজীবন ধরে পর্বে-পর্বে রবীন্দ্রনাথ যা ভেবেছেন তা এই একটি লেখাতেই পেয়েছে সংহত গভীর নির্মোহ বাণীরূপ। পাশ্চাত্য মূল্যবোধের প্রতি প্রবল আগ্রহ পাশ্চাত্যের সাহিত্য, দর্শন ও ধর্ম বিষয়ে গভীর অধ্যয়নে রবীন্দ্রনাথকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। জ্ঞানের প্রসারতার ফলে বিবেচনাশক্তি গভীরতর হওয়ায় সব কিছুরই শক্তি ও ত্রুটি বোঝা সম্ভবপর হয়েছিল তাঁর। সেই সঙ্গে প্রাচ্য মূল্যবোধের প্রতি ক্রমবর্ধিত জ্ঞান ও শ্রদ্ধাও দেখা দিয়েছিল। তাই রবীন্দ্রনাথ ভারত তথা এশিয়ার দেশসমূহের মধ্যে লক্ষ্য করেছেন আত্মমুক্তির পরম সম্ভাবনা।

তৈল

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

তৈল যে কি পদার্থ তাহা সংস্কৃত কবিরা কতক বুঝিয়াছিলেন, তাঁহাদের মতে তৈলের অপর নাম স্নেহ বাস্তবিকও স্নেহ ও তৈল একই পদার্থ। আমি তোমায় স্নেহ করি, তুমি আমায় স্নেহ কর অর্থাৎ আমরা পরস্পরকে তৈল দিয়া থাকি। স্নেহ কি ? যাহা স্নিগ্ধ বা ঠাণ্ডা করে তাহার নাম স্নেহ। তৈলের ন্যায় ঠাণ্ডা করিতে আর-কিসে পারে?

সংস্কৃত কবিরা ঠিক বুঝিয়াছিলেন। যেহেতু তাঁহারা সকল মনুষ্যকেই সমান রূপ স্নেহ করিতে বা তৈল প্রদান করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

বাস্তবিকই তৈল সর্বশক্তিমান্, যাহা বলের অসাধ্য, যাহা বিদ্যার অসাধ্য, যাহা ধনের অসাধ্য, যাহা কৌশলের অসাধ্য, তাহা কেবল একমাত্র তৈল দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে।

যে সর্বশক্তিময় তৈল ব্যবহার করিতে জানে সে সর্বশক্তিমান্। তাহার কাছে জগতের সকল কাজই সোজা, তাহার চাকরির জন্য ভাবিতে হয় না–উকিলিতে পসার করিবার জন্য সময় নষ্ট করিতে হয় না-বিনা কাজে বসিয়া থাকিতে হয় না, কোনো কাজেই শিক্ষানবিশ থাকিতে হয় না।

যে তৈল দিতে পারিবে তাহার বিদ্যা না থাকিলেও সে প্রফেসার হইতে পারে, আহাম্মুক হইলেও ম্যাজিস্ট্রেট হইতে পারে, সাহস না থাকিলেও সেনাপতি হইতে পারে এবং দুর্লভরাম হইয়াও উড়িষ্যার গবর্নর হইতে পারে।

তৈলের মহিমা অতি অপরূপ, তৈল নহিলে জগতের কোনো কার্য সিদ্ধ হয় না। তৈল নহিলে কল চলে না, প্রদীপ জ্বলে না, ব্যঞ্জন সুস্বাদু হয় না, চেহারা খোলে না, হাজার গুণ থাকুক তাহার পরিচয় পাওয়া যায় না। তৈল থাকিলে তাহার কিছুরই অভাব থাকে না।

সর্বশক্তিময় তৈল নানা রূপে সমস্ত পৃথিবী ব্যাপ্ত করিয়া আছেন। তৈলের যে মূর্তিতে আমরা গুরুজনকে স্নিগ্ধ করি তাহার নাম ভক্তি, যাহাতে গৃহিণীকে স্নিগ্ধ করি তাহার নাম প্রণয়, যাহাতে প্রতিবেশীকে স্নিগ্ধ করি, তাহার নাম মৈত্রী, যাহা দ্বারা সমস্ত জগৎকে স্নিগ্ধ করি তাহার নাম শিষ্টাচার ও সৌজন্য "ফিলন্থ্রপি।" যাহা দ্বারা সাহেবকে স্নিগ্ধ করি তাহার নাম লয়েলটি, যাহা দ্বারা বড়োলোককে স্নিগ্ধ করি তাহার নাম নম্রতা বা মডেস্টি। চাকর বাকর প্রভৃতিকেও আমরা তৈল দিয়া থাকি, তাহার পরিবর্তে ভক্তি বা যত্ন পাই। অনেকের নিকট তৈল দিয়া তৈল বাহির করি।

পরস্পর ঘর্ষিত হইলে সকল বস্তুতেই অগ্ন্যুদ্গম হয়, সেই অগ্ন্যুদ্গম নিবারণের এক মাত্র উপায় তৈল। এইজন্যই রেলের চাকায় তৈলের অনুকল্প চর্বি দিয়া থাকে। এইজন্যই যখন দুই জনে ঘোরতর বিবাদে লঙ্কাকাণ্ড উপস্থিত হয়, তখন রফা নামক তৈল আসিয়া উভয়কে ঠাণ্ডা

করিয়া দেয়। তৈলের যদি অগ্নিনিবারণী শক্তি না থাকিত তবে গৃহে গৃহে গ্রামে গ্রামে পিতা পুত্রে স্বামী স্ত্রীতে রাজার প্রজায় বিবাদ বিসংবাদে নিরন্তর অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইত।

পূর্বেই বলা গিয়োছে যে তৈল দিতে পারে সে সর্বশক্তিমান্ কিন্তু তৈল দিলেই হয় না। দিবার পাত্র আছে সময় আছে কৌশল আছে।

তৈল দ্বারা অগ্নি পর্যন্ত বশতাপন্ন হয়। অগ্নিতে অল্প তৈল দিয়া সমস্ত রাত্রি ঘরে আবদ্ধ রাখা যায়। কিন্তু সে তৈল মূর্তিয়ান্।

কে যে তৈল দিবার পাত্র নয়, তাহা বলা যায় না। পুটে তেলি হইতে লাট সাহেব পর্যন্ত সকলেই তৈল দিবার পাত্র। তৈল এমন জিনিস নয় যে, নষ্ট হয়। একবার দিয়া রাখিলে নিশ্চয়ই কোনো-না কোনো ফল ফলিবে। কিন্তু তথাপি যাহার নিকট উপস্থিত কাজ আদায় করিতে হইবে সেই তৈলনিষেকের প্রধান পাত্র।

সময়–যে সময়েই হউক তৈল দিয়া রাখিলেই কাজ হইবে। কিন্তু উপযুক্ত সময়ে অল্প তৈলে অধিক কাজ হয়।

কৌশল–পূর্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে যে যেরূপেই হউক তৈল দিলে কিছু-না-কিছু উপকার হইবে। যেহেতু তৈল নষ্ট হয় না তথাপি দিবার কৌশল আছে। তাহার প্রমাণ ভট্টাচার্যেরা সমস্ত দিন বাকিয়াও যাহার নিকট ১/০ পাঁচ সিকা বৈ আদায় করিতে পারিল না–একজন ইংরেজিওয়ালা তাহার নিকট আনায়াসে ৫০ টাকা বাহির করিয়া লইয়া গেল। কৌশল করিয়া একবিন্দু দিলে যত কার্য হয়, বিনা কৌশলে কলস কলস ঢালিলেও তত হয় না।

ব্যক্তিবিশেষে তৈলের গুণতারতম্য অনেক আছে। নিষ্কৃত্রিম তৈল পাওয়া অতি দুর্লভ। কিন্তু তৈলের এমন একটি আশ্চর্য সম্মিলনী শক্তি আছে যে তাহাতে উহা অন্য সকল পদার্থের গুণই আত্মসাৎ করিতে পারে। যাহার বিদ্যা আছে, তাহার তৈল আমার তৈল অপেক্ষা মূলবান্। বিদ্যার উপর যাহার বুদ্ধি আছে তাহার আরো মূল্যবান্। তাহার উপর যদি ধন থাকে তবে তাহার প্রতি বিন্দুর মূল্য লক্ষ টাকা। কিন্তু তৈল না থাকিলে তাহার বুদ্ধি থাকুক, হাজার বিদ্যা থাকুক, হাজার ধন থাকুক কেহই টের পায় না।

তৈল দিবার প্রবৃত্তি স্বাভাবিক। এ প্রবৃত্তি সকলেরই আছে এবং সুবিধামতে আপন গৃহে ও আপন দলে সকলেই ইহা প্রয়োগ করিয়া থাকে, কিন্তু অনেকে এত অধিক স্বার্থপর যে বাহিরের লোককে তৈল দিতে পারে না। তৈলদান প্রবৃত্তি স্বাভাবিক হইলেও ইহাতে কৃতকার্য হওয়া অদৃষ্টসাপেক্ষ।

আজকাল বিজ্ঞান, শিল্প প্রভৃতি শিখাইবার জন্য নানাবিধ চেষ্টা চলিতেছে। যাহাতে বঙ্গের লোক প্র্যাক্টিক্যাল অর্থাৎ কাজের লোক হইতে পারে; তজ্জন্য সকলেই সচেষ্ট, কিন্তু কাজের লোক হইতে হইলে তৈলদান সকলেই আগে দরকার–অতএব তৈলদানের একটি স্কুলের নিতান্ত প্রয়োজন। অতএব আমরা প্রস্তাব করি বাছিয়া বাছিয়া কোনো রায়বাহাদুর অথবা খাঁ বাহাদুরকে প্রিন্সিপাল করিয়া শীঘ্র একটি স্নেহনিষেকের কালেজ খোলা হয়। অতন্তঃ উকিলি শিক্ষার নিমিত্ত ল'

কালেজে একজন তৈল অধ্যাপক নিযুক্ত করা আবশ্যক। কালেজ খুলিতে পারিলে ভালোই হয়।

কিন্তু এরূপ কালেজ খুলিতে হইলে প্রথমতই গোলযোগ উপস্থিত হয়। তৈল সবাই দিয়া থাকেন–কিন্তু কেহই স্বীকার করেন না যে আমি দিই। সুতরাং এ বিদ্যার অধ্যাপক জোটা ভার, এ বিদ্যা শিখিতে হইলো দেখিয়া শুনিয়া শিখিতে হয়। রীতিমতো লেক্‌চার পাওয়া যায় না। যদিও কোনো রীতিমতো কালেজ নাই তথাপি যাঁহার নিকট চাকরির বা প্রোমোশনের সুপারিশ মিলে তাদৃশ লোকের বাড়ি সদাসর্বদাই গেলে উত্তমরূপ শিক্ষালাভ করা যাইতে পারে। বাঙালির বল নাই, বিক্রম নাই বিদ্যাও নাই, বুদ্ধিও নাই। সুতরাং বাঙালীর একমাত্রা ভরসা তৈল–বাংলায় যে-কেহ কিছু করিয়াছেন সকলই তৈলের জোরে। বাঙালিদিগের তৈলের মূল্য অধিক নয়। এবং কি কৌশলে সেই তৈল বিধাতৃপুরুষদিগের সুখসেব্য হয়, তাহাও অতি অল্প লোক জানে। যাঁহারা জানেন তাঁহাদিগকে আমরা ধন্যবাদ দিই। তাঁহারাই আমাদের দেশের বড়ো লোক, তাঁহারাই আমাদের দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়া আছেন।

তৈল বিধাতৃপুরুষদিগের সুখসেব্য হইবে ইচ্ছা করিলে সে শিক্ষা এদেশে হওয়া কঠিন। তজ্জন্য বিলাত যাওয়া আবশ্যক। তত্রত্য রমণীরা এ বিষয়ের প্রধান অধ্যাপক, তাহাদের থ্রু হইলে তৈল শীঘ্র কাজে আইসে।

শেষে মনে রাখা উচিত এক তৈলে চাকা ঘোরে আর-তৈলে মন ফেরে।

লেখক-পরিচিতি

প্রাচ্যবিদ্যা বিশারদ ও সংস্কৃতের পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর পদবি ভট্টাচার্য। তার জন্ম ৬ই ডিসেম্বর ১৮৫৩। তিনি এম.এ. ডিগ্রি ও 'শাস্ত্রী' উপাধি অর্জন করেন। পারিপারিক ধারা অনুসরণ করে ১৮৭৮ সালে হরপ্রসাদ হেয়ার স্কুলে ট্রানস্লেশন শিক্ষক হিসেবে চাকরি জীবন শুরু করে। তবে ১৯২১ সালের ১৮ জুন তিনি নব প্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা প্রধান অধ্যাপক পদে যোগদান করেন এবং এখান থেকেই অবসর নেন ১৯২৪ সালের ৩০ জন। তাঁর ছাত্রবয়সের গবেষণা নিবন্ধ 'ভারত মহিলা' ১২৮২ বঙ্গাব্দের বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার মাঘ-ফাল্গুন-চৈত্র তিন সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। 'বঙ্গদর্শন'-এর 'মজলিস' বিভাগের কনিষ্ঠ সদস্য হরপ্রসাদ এরপরে এই পত্রিকার অন্যতম প্রধান লেখক হয়ে ওঠেন। উপন্যাস ও বিচিত্র বিষয় প্রবন্ধ মিলিয়ে তাঁর প্রায় ৩০টি রচনা 'বঙ্গদর্শন'-এ প্রকাশিত হয় এবং বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা পায়। প্রাচ্যবিদ্যার প্রতি আগ্রহী হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এশিয়াটিক সোসাইটির জন্য পুঁথি সন্ধানের কাজ করতে ১৮৯৭, ১৮৯৮, ১৯০৭ ও ১৯২২ সালে চারবার নেপাল যান। ১৯০৭ সালে তাঁর হাতে আসে বাংলার প্রাচীনতম কবিতা-সংগ্রহ চর্যাগীতির পুঁথি। দীর্ঘ ৭/৮ বৎসর পুঁথির রচনাগুলি গবেষণা করে তিনি আবিষ্কার করেন যে, গানগুলির ভাষা প্রাচীন বাংলা। ১৯১৬ সালে 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা' গ্রন্থে দুটি দোহা কোষ ও ডাকর্ণব পুঁথির সঙ্গে চর্যাপদের পুঁথি হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সম্পাদনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত হয়। এই চর্যাগানের সংকলনটি আবিষ্কার ও সম্পাদনা বাংলাভাষা ও সাহিত্যের গবেষণায় তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি। হরপ্রসাদের লেখক- জীবনের বিস্তার প্রায় ৫৫ বছর। তাঁর সাহিত্য-জীবন বঙ্কিমযুগ থেকে রবীন্দ্রযুগ অবধি প্রসারিত। সংস্কৃতসাহিত্য, বিশেষ করে

কালিদাসের কাব্য-নাটকের মূল্যায়নে তাঁর আধুনিক সাহিত্যরুচির যথার্থ পরিচয় মেলে। তাঁর বিখ্যাত বইগুলি হলো: 'বেণের মেয়ে' (উপন্যাস), 'কাঞ্চনমালা' (উপন্যাস),'সচিত্র রামায়ণ', 'প্রাচীন বাংলার গৌরব' ও 'বৌদ্ধধর্ম'। ১৯৩১ সালের ১৭ নভেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়।

মূল-বক্তব্য

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মূলত সংস্কৃত-পণ্ডিত। তাই বলে সর্বদা তিনি গুরুগম্ভীর রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন এমন নয়। অনেক লঘুরচনা তিনি লিখেছেন, 'তৈল' তার প্রমাণ। তাঁর 'তৈল' প্রবন্ধটি সমকালে মোসাহেবিপনায় বিশ্বাসী মানুষের প্রতি যেমন তীব্র ব্যঙ্গপ্রকাশক, তেমনি সাধারণের জন্য চেতনা-জাগানিয়া রচনা হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। উত্তরকালেও বিস্তৃত হয়েছে এর পরিপ্রেক্ষিত ও প্রাসঙ্গিকতা। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর চিন্তা-জানালা দিয়ে পাঠক দেখতে পান সুন্দর আগামী। এই প্রবন্ধের বিষয়ভার ও প্রকাশদক্ষতা পাঠককে সামান্য হলেও নতুন করে ভাবতে অনুপ্রাণিত করে। কেবল নিজে চিন্তাবিদের ভূমিকায় অবতীর্ণ থেকে নয়, আরও অনেককে চিন্তার ভুবনে আমন্ত্রণ জানিয়ে, বোধহয় মনোজগতের পরিবর্তনের ডাক দিতে চেয়েছেন পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। তিনি তেল-এর শক্তি সম্পর্কে ধীরে ধীরে বক্তব্যজাল পেতেছেন। প্রবন্ধের মাঝামাঝি এসে পাঠক বোঝেন, এই তেল তরল নয়, আসলে এই তেল সর্বরূপধারী বা রূপহীন। কথাতেও যে তেল থাকে, অতি-প্রশংসাতেও কাজ হয়, এসবই তিনি উল্লেখ করেছেন। আসলে, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সমকালে কথাকথিত 'সভ্য' সমাজের একদল লোক শাসক ইংরেজদের এবং তাদের প্রশাসকদের অতি মোসাহেবিপনা করে কার্য উদ্ধার করে নিচ্ছিল এবং এতে প্রকৃত গুণীরা পাচ্ছিলেন না সমাদর। এই সামাজিক অবস্থায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'তৈল' প্রবন্ধটি লেখেন। উল্লেখ্য, বঙ্কিমচন্দ্রও এসময় এধারার বেশ কিছু প্রবন্ধ রচনা করেন: 'কমলাকান্তের দপ্তর' তার প্রমাণ। 'তৈল' প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশ পায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় চৈত্র ১২৮৫ সংখ্যায়। প্রবন্ধের শেষে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যে বলেছেন, 'মনে রাখা উচিত এক তৈলে চাকা ঘোরে আর তৈলে-মন ফেরে।'–এর, তৈল চেয়ে বড় টিপ্পনী আর নেই!

যৌবনে দাও রাজটিকা

প্রমথ চৌধুরী

গতমাসের সবুজপত্রে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত যৌবনকে রাজটিকা দেবার প্রস্তাব করেছেন। আমার কোনো টীকাকার বন্ধু এই প্রস্তাবের বক্ষ্যমাণ-রূপ ব্যাখ্যা করেছেন–

যৌবনকে টিকা দেওয়া অবশ্যকর্তব্য, তাহাকে বসন্তের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য। এস্থলে রাজটিকা অর্থ–রাজা অর্থাৎ যৌবনের শাসনকর্তা কর্তৃক তাহার উপকারার্থে দত্ত যে টিকা, সেই টিকা। উক্তপদ তৃতীয়াতৎপুরুষ সমাসে সিদ্ধ হইয়াছে।'

উল্লিখিত ভাষ্য আমি রহস্য বলে মনে করতুম যদি-না আমরা জানা থাকত যে, এ দেশে জ্ঞানীব্যক্তিদিগের মতে মনের বসন্তঋতু ও প্রকৃতির যৌবনকাল–দুই অশায়েস্তা, অতএব শাসনযোগ্য। এ উভয়কে জুড়িতে জুতলে আর বাগ মানানো যায় না; অতএব এদের প্রথমে পৃথক্ ক'রে পরে পরাজিত করতে হয়।

বসন্তের স্পর্শে ধরণীর সর্বাঙ্গ শিউরে ওঠে; অবশ্য তাই বলে পৃথিবী তার আলিঙ্গন হতে মুক্তিলাভ করবার চেষ্টা করে না, এবং পোষ-মাসকেও বারোমাস পুষে রাখে না। শীতকে অতিক্রম করে বসন্তের কাছে আত্মসমর্পণ করায় প্রকৃতি যে অর্বাচীনতার পরিচয় দেয় না, তার পরিচয় ফলে।

প্রকৃতির যৌবন শাসনযোগ্য হলেও তাকে শাসন করবার ক্ষমতা মানুষের হাতে নেই; কেননা, প্রকৃতির ধর্ম মানবধর্মশাস্ত্রবহির্ভূত। সেই কারণে জ্ঞানীব্যক্তিরা আমাদের প্রকৃতির দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে বারণ করেন, এবং নিত্যই আমাদের প্রকৃতির উলটো টান টানতে পরামর্শ দেন। এই কারণেই মানুষের যৌবনকে বসন্তের প্রভাব হতে দূরে রাখা আবশ্যক। অন্যথা, যৌবন ও বসন্ত এ দুয়ের আবির্ভাব যে একই দৈবশক্তির লীলা–এইরূপ একটি বিশ্বাস আমাদের মনে স্থানলাভ করতে পারে।

এ দেশে লোকে যে যৌবনের কপালে রাজটিকার পরিবর্তে তার পৃষ্ঠে রাজদণ্ড প্রয়োগ করতে সদাই প্রস্তুত, সে বিষয়ে আর-কোনো সন্দেহ নেই। এর কারণ হচ্ছে যে, আমাদের বিশ্বাস মানবজীবনে যৌবন একটা মস্ত ফাঁড়া–কোনোরকমে সেটি কাটিয়ে উঠতে পারলেই বাঁচা যায়। এ অবস্থায় কি জ্ঞানী, কি অজ্ঞানী সকলেই চান যে, একলম্ফে বাল্য হতে বার্ধক্যে উত্তীর্ণ হন। যৌবনের নামে আমরা ভয় পাই, কেননা তার অন্তরে শক্তি আছে। অপরপক্ষে বালকের মনে শক্তি নেই, বৃদ্ধের দেহে শক্তি নেই, বালকের জ্ঞান সেই, বৃদ্ধের প্রাণ নেই। তাই আমাদের নিয়ত চেষ্টা হচ্ছে দেহের জড়তার সঙ্গে মনের জড়তার মিলন করা, অজ্ঞতার সঙ্গে বিজ্ঞতার সন্ধিস্থাপন করা। তাই আমাদের শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য হচ্ছে ইঁচড়ে পাকানো, আর আমাদের সমাজনীতির উদ্দেশ্য হচ্ছে জাগ দিয়ে পাকানো।

আমাদের উপরোক্ত চেষ্টা যে ব্যর্থ হয় নি তার প্রমাণ আমাদের সামাজিক জীবন। আজকের দিনে এ দেশে রাজনীতির ক্ষেত্রে একদিকে বালক, অপরদিকে বৃদ্ধ; সাহিত্যক্ষেত্রে একদিকে স্কুলবয়, অপরদিকে স্কুলমাস্টার; সমাজে একদিকে বাল্যবিবাহ, অপরদিকে অকালমৃত্যু; ধর্মক্ষেত্রে একদিকে শুধু ইতি ইতি, অপরদিকে শুধু নেতি নেতি; অর্থাৎ একদিকে লোষ্ট্রকাষ্ঠও দেবতা, অপরদিকে ঈশ্বরও ব্রহ্ম নন। অর্থাৎ আমাদের জীবনগ্রন্থে প্রথমে ভূমিকা আছে, শেষে উপসংহার আছে; ভিতরে কিছু নেই। এ বিশ্বের জীবনের আদি নেই, অন্ত নেই, শুধু মধ্য আছে; কিন্তু তারই অংশীভূত আমাদের জীবনের আদি আছে, অন্ত আছে; শুধু মধ্য নেই।

বার্ধক্যকে বাল্যের পাশে এনে ফেললেও আমরা তার মিলনসাধন করতে পারি নি : কারণ ক্রিয়া বাদ দিয়ে দুটি পদকে জুড়ে এক করা যায় না। তা ছাড়া যা আছে তা নেই বললেও তার অস্তিত্ব লোপ হয়ে যায় না। এ বিশ্বকে মায়া বললেও তা অস্পৃশ্য হয়ে যায় না, এবং আত্মাকে ছায়া বললেও তা অদৃশ্য হযে যায় না। বরং কোনো-কোনো সত্যের দিকে পিঠ ফেরালে তা অনেক সময়ে আমাদের ঘাড়ে চড়ে বসে। যে যৌবনকে আমরা সমাজে স্থান দিই নি, তা এখন নানা বিকৃতরূপে নানা ব্যক্তির দেহ অবলম্বন করে রয়েছে। যাঁরা সমাজের সুমুখে জীবনের শুধু নান্দী ও ভরতবচন পাঠ করেন, তাঁদের জীবনের অভিনয়টা যবনিকার অন্তরালেই হয়ে থাকে। রুদ্ধ ও বদ্ধ করে রাখলে পদার্থমাত্রই আলোর ও বায়ুর সম্পর্ক হারায়, এবং সেইজন্য তার গায়ে কলঙ্ক ধরাও অনিবার্য। গুপ্ত জিনিসের পক্ষে দুষ্ট হওয়া স্বাভাবিক।

আমরা যে যৌবনকে গোপন করে রাখতে চাই, তার জন্য আমাদের প্রাচীন সাহিত্য অনেক পরিমাণে দায়ী। কোনো বিখ্যাত ইংরেজ লেখক বলেন যে, literature হচ্ছে criticism of life; ইংরেজি সাহিত্য জীবনের সমালোচনা হতে পারে, কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্য হচ্ছে যৌবনের আলোচনা।

সংস্কৃত সাহিত্যে যুবকযুবতী ব্যতীত আর কারও স্থান নেই। আমাদের কাব্যরাজ্য হচ্ছে সূর্যবংশের শেষ নৃপতি অগ্নিবর্ণের রাজ্য, এবং সে দেশ হচ্ছে অষ্টাদশবর্ষদেশীয়াদের স্বদেশ। যৌবনের যে ছবি সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যে ফুটে উঠেছে, সে হচ্ছে ভোগবিলাসের চিত্র। সংস্কৃত কাব্যজগৎ মাল্যচন্দনবনিতা দিয়ে গঠিত এবং সে জগতের বনিতাই হচ্ছে স্বর্গ, ও মাল্যচন্দন তার উপসর্গ। এ কাব্যজগতের স্রষ্টা কিংবা দ্রষ্টা-কবিদের মতে প্রকৃতির কাজ হচ্ছে শুধু রমণীদেহের উপমা জোগানো, পুরুষের কাজ শুধু রমণীর মন জোগানো। হিন্দুযুগের শেষকবি জয়দেব নিজের কাব্যসম্বন্ধে স্পষ্টাক্ষরে যে কথা বলেছেন, তার পূর্ববর্তী কবিরাও ইঙ্গিতে সেই একই কথা বলেছেন। সে কথা এই যে, 'যদি বিলাস-কলায় কুতূহলী হও তো আমার কোমলকান্ত পদাবলী শ্রবণ করো।' এককথায় যে-যৌবন যযাতি নিজের পুত্রদের কাছে ভিক্ষা করেছিলেন, সংস্কৃত কবিরা সেই যৌবনেরই রূপগুণ বর্ণনা করেছেন।

এ কথা যে কত সত্য, তা একটি উদাহরণের সাহায্যে প্রমাণ করা যেতে পারে। কৌশাম্বির যুবরাজ উদয়ন এবং কপিলাবস্তুর যুবরাজ সিদ্ধার্থ উভয়ে সমসাময়িক ছিলেন। উভয়েই পরম রূপবান্ এবং দিব্য শক্তিশালী যুবাপুরুষ: কিন্তু উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এইটুকু যে, একজন হচ্ছেন ভোগের আর একজন হচ্ছেন ত্যাগের পূর্ণ অবতার । ভগবান গৌতমবুদ্ধের জীবনের ব্রত ছিল মানবের মোহনাশ করে তাকে সংসারের সকল শৃঙ্খল হতে মুক্ত করা; আর বৎসরাজ

উদয়নের জীবনের ব্রত ছিল ঘোষবতী বীণার সাহায্যে অরণ্যের গজকামিনী এবং অন্তঃপুরের গজগামিনীদের প্রথমে মুগ্ধ ক'রে পরে নিজের ভোগের জন্য তাদের অবরুদ্ধ করা। অথচ সংস্কৃত কাব্যে বুদ্ধচরিতের স্থান নেই, কিন্তু উদয়নকথায় তা পরিপূর্ণ।

সংস্কৃত ভাষায় যে বুদ্ধের জীবনচরিত লেখা হয় নি, তা নয়; তবে ললিতবিস্তরকে আর-কেউ কাব্য বলে স্বীকার করবেন না, এবং অশ্বঘোষের নাম পর্যন্তও লুপ্ত হয়ে গেছে। অপরদিকে উদয়ন-বাসবদত্তার কথা অবলম্বন করে যাঁরা কাব্যরচনা করেছেন, যথা ভাস গুণাঢ্য সুবন্ধু ও শ্রীহর্ষ ইত্যাদি, তাঁদের বাদ দিলে সংস্কৃত সাহিত্যের অর্ধেক বাদ পড়ে যায়। কালিদাস বলেছেন যে, কৌশাম্বির গ্রামবৃদ্ধেরা উদয়নকথা শুনতে ও বলতে ভালোবাসতেন; কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, কেবল কৌশাম্বির গ্রামবৃদ্ধ কেন, সমগ্র ভারতবর্ষের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই ঐ কথা-রসের রসিক। সংস্কৃত সাহিত্য এ সত্যের পরিচয় দেয় না যে, বুদ্ধের উপদেশের বলে জাতীয় জীবনে যৌবন এনে দিয়েছিল, এবং উদয়নের দৃষ্টান্তের ফলে অনেকের যৌবনে অকালবার্ধক্য এনে দিয়েছিল। বৌদ্ধধর্মের অনুশীলনের ফলে রাজা অশোক লাভ করেছিলেন সাম্রাজ্য; আর উদয়নধর্মের অনুশীলন করে রাজা অগ্নিবর্ণ লাভ করেছিলেন রাজযক্ষ্মা। সংস্কৃত কবিরা এ সত্যটি উপেক্ষা করেছিলেন যে, ভোগের ন্যায় ত্যাগও যৌবনেরই ধর্ম। বার্ধক্য কিছু অর্জন করতে পারে না ব'লে কিছু বর্জনও করতে পারে না। বার্ধক্য কিছু কাড়তে পারে না ব'লে কিছু ছাড়তেও পারে না–দুটি কালো চোখের জন্যও নয়, বিশ কোটি কালো লোকের জন্য নয়।

পাছে লোকে ভুল বোঝেন বলে এখানে আমি একটি কথা বলে রাখতে চাই। কেউ মনে করবেন না যে, আমি কাউকে সংস্কৃত কাব্য বয়কট করতে বলছি কিংবা নীতি ও রুচির দোহাই দিয়ে সে কাব্যের সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশ করবার পরামর্শ দিচ্ছি। আমার মতে যা সত্য তা গোপন করা সুনীতি নয় এবং তা প্রকাশ করাও দুর্নীতি নয়। সংস্কৃত কাব্যে যে যৌবনধর্মের বর্ণনা আছে তা যে সামান্য মানবধর্ম, এ হচ্ছে অতি স্পষ্ট সত্য; এবং মানবজীবনের উপর তার প্রভাব যে অতি প্রবল, তাও অস্বীকার করবার জো নেই।

তবে এই একদেশদর্শিতা ও অত্যুক্তি–ভাষায় যাকে বলে একরোখামি ও বাড়াবাড়ি, তাই–হচ্ছে সংস্কৃত কাব্যের প্রধান দোষ। যৌবনের স্থূল শরীরকে অত আশকারা দিলে তা উত্তরোত্তর স্থূল হতে স্থূলতর হয়ে ওঠে, এবং সেইসঙ্গে তার সূক্ষ্ম শরীরটি সূক্ষ্ম হতে এত সূক্ষ্মতম হয়ে ওঠে যে, তা খুঁজে পাওয়াই ভার হয়। সংস্কৃত সাহিত্যের অবনতির সময় কাব্যে রক্তমাংসের পরিমাণ এত বেড়ে গিয়েছিল যে, তার ভিতর আত্মার পরিচয় দিতে হলে সেই রক্তমাংসের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করা ছাড়া আর আমাদের উপায় নেই। দেহকে অতটা প্রাধান্য দিলে মন-পদার্থটি বিগড়ে যায়; তার ফলে দেহ ও মন পৃথক্ হয়ে যায় এবং উভয়ের মধ্যে আত্মীয়তার পরিবর্তে জ্ঞাতিশত্রুতা জন্মায়। সম্ভবতঃ বৌদ্ধধর্মের নিরামিষের প্রতিবাদস্বরূপ হিন্দু কবিরা তাঁদের কাব্যে এতটা আমিষের আমদানি করেছিলেন। কিন্তু যে কারণেই হোক প্রাচীন ভারতবর্ষের চিন্তার রাজ্যে দেহমনের পরস্পরের যে বিচ্ছেদ ঘটেছিল, তার প্রমাণ–প্রাচীন সমাজের একদিকে বিলাসী অপরদিকে সন্ন্যাসী, একদিকে পত্তন অপরদিকে বন, একদিকে রঙ্গালয় অপরদিকে হিমালয়: এককথায় একদিকে কামশাস্ত্র অপরদিকে মোক্ষশাস্ত্র। মাঝামাঝি আর-কিছু জীবনে থাকতে পারত, কিন্তু সাহিত্যে নেই। এবং এ দুই বিরুদ্ধ-মনোভাবের পরস্পর-মিলনের যে কোনো পন্থা ছিল না, সে কথা ভর্তৃহরি স্পষ্টাক্ষরে বলেছেন–

একা ভার্যা সুন্দরী বা দরী বা

এই হচ্ছে প্রাচীনযুগের শেষ কথা। যারা দরী-প্রাণ তাঁদের পক্ষে যৌবনের নিন্দা করা যেমন স্বাভাবিক, যারা সুন্দরী-প্রাণ তাঁদের পক্ষেও তেমনি স্বাভাবিক। যতির মুখের যৌবন নিন্দা অপেক্ষা কবির মুখের যৌবন-নিন্দায়, আমার বিশ্বাস, অধিক ঝাঁজ আছে। তার কারণ, ত্যাগীর অপেক্ষা ভোগীরা অভ্যাসবশতঃ কথায় ও কাজে বেশি অসংযত।

যারা স্ত্রীজাতিকে কেবলমাত্র ভোগের সামগ্রী মনে করেন তাঁরাই যে স্ত্রী-নিন্দার ওস্তাদ, এর প্রমাণ জীবন ও সাহিত্যে নিত্য পাওয়া যায়। স্ত্রী-নিন্দুকের রাজা হচ্ছেন রাজকবি ভর্তৃহরি ও রাজকবি সোলোমন। চরম ভোগবিলাসে পরম চরিতার্থতা লাভ করতে না পেরে এঁরা শেষবয়সে স্ত্রীজাতির উপর গায়ের ঝাল ঝেড়েছেন। যাঁরা বনিতাকে মাল্যচন্দন হিসাবে ব্যবহার করেন তাঁরা শুকিয়ে গেলে সেই বণিতাকে মাল্যচন্দনের মতই ভূতলে নিক্ষেপ করেন, এবং তাকে পদদলিত করতেও সংকুচিত হন না। প্রথমবয়সে মধুর রস অতিমাত্রায় চর্চা করলে শেষবয়সে জীবন তিতো হয়ে ওঠে। এ শ্রেণীর লোকের হাতে শৃঙ্গার-শতকের পরেই বৈরাগ্য-শতক রচিত হয়।

একই কারণে, যাঁরা যৌবনকে কেবলমাত্র ভোগের উপকরণ মনে করেন তাঁদের মুখে যৌবন-নিন্দা লেগে থাকবারই কথা। যাঁরা যৌবন-জোয়ারে গা ভাসিয়ে দেন, তাঁরা ভাটার সময় পাঁকে পড়ে গত জোয়ারের প্রতি কটুকাটব্য প্রয়োগ করেন। যৌবনের উপর তাঁদের রাগ এই যে, তা পালিয়ে যায় এবং একবার চলে গেলে আর ফেরে না। যযাতি যদি পুরুর কাছে ভিক্ষা করে যৌবন ফিরে না পেতেন তা হলে তিনি যে কাব্য কিংবা ধর্মশাস্ত্র রচনা করতেন, তাতে যে কি সুতীব্র যৌবন-নিন্দা থাকত তা আমরা কল্পনাও করতে পারি নে। পুরু যে পিতৃভক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন, তার ভিতর পিতার প্রতি কতটা ভক্তি ছিল এবং তাতে পিতারই যে উপকার করা হয়েছিল তা বলতে পারি নে, কিন্তু তাতে দেশের মহা অপকার হয়েছে; কারণ নীতির একখানা বড় গ্রন্থ মারা গেছে।

যযাতি-কাঙ্ক্ষিত যৌবনের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ এই যে, তা অনিত্য। এ বিষয়ে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ, নগ্নক্ষপণক ও নাগরিক, সকলেই একমত।

'যৌবন ক্ষণস্থায়ী,' এই আক্ষেপে এ দেশের কাব্য ও সংগীত পরিপূর্ণ–
ফাগুন গয়ী হয়, বহুরা ফিরি আয়ী হয়
গয়ে রে যোবন, ফিরি আওত নাহি

এই গান আজও হিন্দুস্থানের পথে-ঘাটে অতি করুণ সুরে গাওয়া হয়ে থাকে। যৌবন যে চিরদিন থাকে না, এ আপসোস রাখবার স্থান ভারতবর্ষে নেই।

যা অতি প্রিয় এবং অতি ক্ষণস্থায়ী, তার স্থায়িত্ব বাড়াবার চেষ্টা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। সম্ভবতঃ নিজের অধিকার বিস্তার করবার উদ্দেশ্যেই এ দেশে যৌবন শৈশবের উপর আক্রমণ করেছিল। বাল্যবিবাহের মূলে হয়তো এই যৌবনের মেয়াদ বাড়াবার ইচ্ছাটাই বর্তমান। জীবনের গতিটি উলটো দিকে ফেরাবার ভিতরও একটা মহা আর্ট আছে। পৃথিবীর অপর-সব

দেশে লোকে গাছকে কি করে বড় করতে হয় তারই সন্ধান জানে, কিন্তু গাছকে কি করে ছোট করতে হয় সে কৌশল শুধু জাপানিরাই জানে। একটি বটগাছকে তারা চিরজীবন একটি টবের ভিতর পুরে রেখে দিতে পারে। শুনতে পাই, এইসব বামন-বট হচ্ছে অক্ষয়বট। জাপানিদের বিশ্বাস যে, গাছকে হ্রস্ব করলে তা আর বৃদ্ধ হয় না। সম্ভবতঃ আমাদেরও মনুষ্যত্বের চর্চা সম্বন্ধে এই জাপানি আর্ট জানা আছে, এবং বাল্যবিবাহ হচ্ছে সেই আর্টের একটি প্রধান অঙ্গ। এবং উক্ত কারণেই, অপর-সকল প্রাচীন সমাজ উৎসন্নে গেলেও আমাদের সমাজ আজও টিকে আছে। মানুষ্যত্ব খর্ব করে মানবসমাজকে টবে জিইয়ে রাখায় যে বিশেষ কিছু অহংকার করবার আছে, তা আমার মনে হয় না। সে যাই হোক, এ যুগে যখন কেউ যৌবনকে রাজটিকা দেবার প্রস্তাব করেন তখন তিনি সমাজের কথা ভাবেন, ব্যক্তিবিশেষের কথা নয়।

ব্যক্তিগত হিসেবে জীবন ও যৌবন অনিত্য হলেও মানবসমাজের হিসেবে ও-দুই পদার্থ নিত্য বললেও অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং সামাজিক জীবনে যৌবনের প্রতিষ্ঠা করা মানুষের ক্ষমতার বহির্ভূত না হলেও না হতে পারে।

কি উপায়ে যৌবনকে সমাজের যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করা যেতে পারে তাই হচ্ছে বিবেচ্য ও বিচার্য।

এ বিচার করবার সময় এ কথাটি মনে রাখা আবশ্যক যে, মানবজীবনের পূর্ণ অভিব্যক্তি–যৌবন।

যৌবনে মানুষের বাহ্যেন্দ্রিয় কর্মেন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয় সব সজাগ ও সবল হয়ে ওঠে, এবং সৃষ্টির মূলে যে প্রেরণা আছে মানুষে সেই প্রেরণা তার সকল অঙ্গে সকল মনে অনুভব করে।

দেহ ও মনের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধের উপর মানবজীবন প্রতিষ্ঠিত হলেও দেহমনের পার্থক্যের উপরেই আমাদের চিন্তারাজ্য প্রতিষ্ঠিত। দেহের যৌবনের সঙ্গে মনের যৌবনের একটা যোগযোগ থাকলেও দৈহিক যৌবন ও মানসিক যৌবন স্বতন্ত্র। এই মানসিক যৌবন লাভ করতে পারলেই আমরা তা সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে পারব। দেহ সংকীর্ণ ও পরিচ্ছিন্ন; মন উদার ও ব্যাপক। একের দেহের যৌবন অপরের দেহে প্রবেশ করিয়ে দেবার জো নেই; কিন্তু একের মনের যৌবন লক্ষ লোকের মনে সংক্রমণ করে দেওয়া যেতে পারে।

পূর্বে বলেছি যে, দেহ ও মনের সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য। একমাত্র প্রাণশক্তিই জড় ও চৈতন্যের যোগ সাধন করে। যেখানে প্রাণ নেই সেখানে জড়ে ও চৈতন্যে মিলনও দেখা যায় না। প্রাণই আমাদের দেহ ও মনের মধ্যে মধ্যস্থতা করছে। প্রাণের পায়ের নীচে হচ্ছে জড়জগৎ আর তার মাথার উপরে মনোজগৎ। প্রাণের ধর্ম যে জীবনপ্রবাহ রক্ষা করা, নবনব সৃষ্টির দ্বারা সৃষ্টি রক্ষা করা–এটি সর্বলোকবিদিত। কিন্তু প্রাণের আর-একটি বিশেষ ধর্ম আছে, যা সকলের কাছে সমান প্রত্যক্ষ নয়। সেটি হচ্ছে এই যে, প্রাণ প্রতি মুহূর্তে রূপান্তরিত হয়। হিন্দুদর্শনের মতে জীবের প্রাণময় কোষ, অন্নময় কোষ ও মনোময় কোষের মধ্যে অবস্থিত। প্রাণের গতি উভয়মুখী। প্রাণের পক্ষে মনোময় কোষে ওঠা এবং অন্নময় কোষে নামা দুই সম্ভব। প্রাণ অধোগতি প্রাপ্ত হয়ে জড়জগতের অন্তর্ভূত হয়ে যায়; আর উন্নত হয়ে মনোজগতের অন্তর্ভূত হয়। মনকে প্রাণের পরিণতি এবং জড়কে প্রাণের বিকৃতি বললেও অত্যুক্তি হয় না। প্রাণের

স্বাভাবিক গতি হচ্ছে মনোজগতের দিকে; প্রাণের স্বাধীন স্ফূর্তিতে বাধা দিলেই তা জড়তাপ্রাপ্ত হয়। প্রাণ নিজের অভিব্যক্তির নিয়ম নিজে গড়ে নেয়: বাইরের নিয়মে তাকে বদ্ধ করাতেই সে জড়জগতের অধীন হয়ে পড়ে। যেমন প্রাণীজগতের রক্ষার জন্য নিত্যনূতন প্রাণের সৃষ্টি আবশ্যক, এবং সে সৃষ্টির জন্য দেহের যৌবন চাই, তেমনি মনোজগতের এবং তদধীন কর্মজগতের রক্ষার জন্য সেখানেও নিত্য নব সৃষ্টির আবশ্যক, এবং সে সৃষ্টির জন্য মনের যৌবন চাই। পুরাতনকে আঁকড়ে থাকাই বার্ধক্য অর্থাৎ জড়তা। মানসিক যৌবন লাভের জন্য প্রথম আবশ্যক–প্রাণশক্তি যে দৈবী শক্তি–এই বিশ্বাস।

এই মানসিক যৌবনই সমাজে প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে আমাদের উদ্দেশ্য। এবং কি উপায়ে তা সাধিত হতে পারে, তাই হচ্ছে আলোচ্য।

আমরা সমগ্র সমাজকে একটি ব্যক্তিহিসেবে দেখলেও আসলে মানবসমাজ হচ্ছে বহুব্যক্তির সমষ্টি। যে সমাজে বহু ব্যক্তির মানসিক যৌবন আছে, সেই সমাজেরই যৌবন আছে। দেহের যৌবনের সঙ্গেসঙ্গেই মনের যৌবনের আবির্ভাব হয়। সেই মানসিক যৌবনকে স্থায়ী করতে হলে শৈশব নয়, বার্ধক্যের দেশ আক্রমণ এবং অধিকার করতে হয়। দেহের যৌবনের অন্তে বার্ধক্যের রাজ্যে যৌবনের অধিকার বিস্তার করবার শক্তি আমরা সমাজ হতেই সংগ্রহ করতে পারি। ব্যক্তিগত জীবনে ফাল্গুন একবার চলে গেলে আবার ফিরে আসে না ; কিন্তু সমগ্র সমাজে ফাল্গুন চিরদিন বিরাজ করছে। সমাজে নূতন প্রাণ, নূতন মন, নিত্য জন্মলাভ করেছে। অর্থাৎ নূতন সুখদুঃখ, নূতন আশা, নূতন ভালোবাসা, নূতন কর্তব্য ও নূতন চিন্তা নিত্য উদয় হচ্ছে। সমগ্র সমাজের এই জীবনপ্রবাহ যিনি নিজের অন্তরে টেনে নিতে পারবেন, তাঁর মনের যৌবনের আর ক্ষয়ের আশঙ্কা নেই। এবং তিনিই আবার কথায় ও কাজে সেই যৌবন সমাজকে ফিরিয়ে দিতে পারবেন।

এ যৌবনের কপালে রাজটিকা দিতে আপত্তি করবেন, এক জড়বাদী আর-এক মায়াবাদী; কারণ এঁরা উভয়েই একমন। এঁরা উভয়েই বিশ্ব হতে অস্তির প্রাণটুকু বার করে দিয়ে যে এক স্থিরতত্ত্ব লাভ করেন, তাকে জড়ই বল আর চৈতন্যই বল, সে বস্তু হচ্ছে এক, প্রভেদ যা তা নামে।

লেখক-পরিচিতি

প্রমথ চৌধুরী ১৮৬৮ ৭ই আগস্ট যশোরে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা দুর্গাদাস চৌধুরী ছিলেন জমিদার। তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ (এখন বিশ্ববিদ্যালয়) থেকে দর্শনে অনার্সসহ বি.এ.(১৮৮৯) এবং ইংরেজিতে এম.এ. (১৮৯০) পাস করেন। ১৮৯৩ সালে প্রমথ চৌধুরী লন্ডনে যান এবং ব্যারিস্টারি পাস করে দেশে ফিরে কলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় যোগদান করেন। অবশ্য এ ব্যবসায় তিনি বেশি দিন যুক্ত থাকেননি। সাহিত্য, শিল্পকলা, রুচিবোধের বিস্তারে তাঁর আগ্রহ ছিল। এ দিক থেকে তিনি ফরাসিরুচির অনুসারী ছিলেন। ১৯১৪ সালে মাসিক 'সবুজপত্র' পত্রিকা প্রকাশ করে তার মাধ্যমে বাংলা চলিত গদ্যরীতির প্রবর্তন করেন। তাই তাকে বাংলা চলিত গদ্যরীতির প্রবর্তক বরা হয়। প্রমথ চৌধুরী 'বীরবল' ছদ্মনামে পত্রিকায় ব্যঙ্গরসাত্মক প্রবন্ধ ও নানা গল্প প্রকাশ করেন। তার এ ছদ্মনাম থেকে তখন বাংলা সাহিত্যে বীরবলী ধারা প্রবর্তিত হয়। সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রমথ চৌধুরীর প্রধান খ্যাতি মননশীল প্রবন্ধলেখক হিসেবে। তবে তিনি উচ্চমানের গল্প ও কবিতাও রচনা করেছেন। বাংলা

সাহিত্যে তিনিই প্রথম বিদ্রুপাত্মক প্রবন্ধ রচনা করেন। বুদ্ধিদীপ্ত তির্যকভঙ্গি তার গদ্য-পদ্য সব রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য। শাণিত যুক্তি ও আলঙ্কারিক ভাষা প্রয়োগেও তিনি দক্ষ ছিলেন।

তিনি ইংরেজি ও ফরাসি সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন। ফরাসি সনেটরীতি বাংলা কাব্যে তিনিই প্রবর্তন করেন। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'তেল-নুন লকড়ি' (১৯০৬), 'সনেট পঞ্চাশৎ' (১৯১৩), 'চার-ইয়ারি কথা' (১৯১৬), 'বীরবলের হালখাতা' (১৯১৬), 'The Story of Bengali Literature' (১৯১৭), 'পদাচরণ' (১৯১৯), 'রায়তের কথা' (১৯২৬) 'নীললোহিত (১৯৩২) ও 'আত্মকথা' (১৯৪৬)। ১৯৪৬ সালের ২রা ডিসেম্বর শান্তিনিকেতনে তার মৃত্যু হয়।

মূল-বক্তব্য

'যৌবনে দাও রাজটিকা' প্রমথ চৌধুরীর একটি প্রতর্কমূলক প্রবন্ধ। এটি তার সম্পাদিত 'সবুজপত্র' সাময়িকপত্রের ১৩২১ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশ পায়। এই প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরী যৌবনের সমাদর করেছেন অর্থাৎ তরুণদের সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে সাহিত্য-সমাজবিকাশের কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, পায়ের নিচে হচ্ছে জড়জগৎ আর তার মাথার উপরে মনোজগৎ। প্রাণের ধর্ম জীবনপ্রবাহ রক্ষা করা আর তা সবার কাছে সমভাবে প্রকাশযোগ্যও নয়। এই প্রকাশযোগ্য নয় বলে তরুণদের কাজ সবাই সমভাবে গ্রহণ করে না। কেউ আবার তাদের প্রশংসা করার বদলে তিরস্কার করে থাকেন। আসলে জীবের প্রাণময় কোষ, অন্নময় কোষ ও মনোময় কোষের মধ্যে অবস্থিত তার চাঞ্চল্য নিহিত। প্রাণের গতি উভয়মুখী। তাঁর মতে, মনকে প্রাণের পরিণতি এবং জড়কে প্রাণের বিকৃত বললেও অত্যুক্তি হয় না। প্রাণের স্বাভাবিক গতি হচ্ছে মনোজগতের দিকে, প্রাণের স্বাধীন স্ফীতিতে বাধা দিলেই তা জড়তাপ্রাপ্ত হয়। প্রাণ নিজের অভিব্যক্তির নিয়ম নিজে গড়ে নেয়, বাইরের নিয়েমে তাকে বন্ধ করাতেই সে জড়োজগতের অধীন হয়ে পড়ে। তাই প্রমথ চৌধুরী বলেছেন, দেহেরে যৌবন চাই, তেমনি মনোজগতের যৌবনও আবশ্যক। এই মনের যৌবনের জন্য কী প্রয়োজন? প্রমথ চৌধুরী বলেছেন, মানসিক যৌবন লাভের জন্য প্রথম আবশ্যক–প্রাণশক্তি যে দৈবী শক্তি–এই বিশ্বাস। এই মানসিক যৌবনই সমাজে প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে আমাদের উদ্দেশ্য। কী করে বা কোন পথে তা প্রতিষ্ঠা করা যায়, সে বিষয়টিই আলোচনা করেছেন প্রমথ চৌধুরী। তাঁর বক্তব্য হলো, যে সমাজে বহু ব্যক্তির মানসিক যৌবন আছে, সেই সমাজেরই যৌবন আছে। দেহের যৌবনের সঙ্গে মনের যৌবনের খুব প্রয়োজন। সেই মানসিক যৌবনকে সঞ্চয় করতে হলে শৈশব নয়, বুড়ো বয়সকে লক্ষ্য করতে হবে এবং তা যেন অপচিন্তায় বাধাপ্রাপ্ত না হয় তা লক্ষ্য করতে হবে। যারা মানসিক যৌবনকে সমাদর না করে তাদের সমালোচনা করেছেন প্রমথ চৌধুরী। প্রমথ চৌধুরীর বক্তব্য হলো, 'সমগ্রসমাজের এই জীবনপ্রবাহ যিনি নিজের অন্তরে টেনে নিতে পারবেন, তাঁর মনের যৌবনের আর ক্ষয়ের আশঙ্কা নেই।' এইটিই প্রবন্ধের সারকথা। ক্ষুদ্রতা পরিহার করে বৃহতের প্রাণাবেগকে নিজের মধ্যে ধারণ করতে পারলে মনের যৌবন প্রতিষ্ঠা পায়।

বর্তমান বিশ্ব-সাহিত্য

কাজী নজরুল ইসলাম

বর্তমান বিশ্ব-সাহিত্যের দিকে একটু ভাল করে দেখলে সর্বাগ্রে চোখে পড়ে তার দুটি রূপ। এক রূপে সে শেলীর skylark-এর মত, মিল্টনের Bird of Paradise-এর মত এই ধূলি-মলিন পৃথিবীর উর্ধ্বে উঠে স্বর্গের সন্ধান করে, তার চরণ কখনো ধরার মাটি স্পর্শ করে না; কেবলি উর্ধ্বে–আরো উর্ধ্বে উঠে স্বপনলোকের গান শোনায়। এইখানে সে স্বপন-বিহারী।

আর এক রূপে সে এই মাটির পৃথিবীকে অপার মমতায় আঁকড়ে ধরে থাকে–অন্ধকার নিশীথে, ভয়ের রাতে বিহ্বল শিশু যেমন করে তার মাকে জড়িয়ে থাকে–তরুলতা যেমন করে সহস্র শিকড় দিয়ে ধরণী-মাতাকে ধরে থাকে–তেমনি করে। এইখানে সে মাটির দুলাল।

ধূলি-মলিন পৃথিবীর এই কর্দমাক্ত শিশু যে সুন্দরকে অস্বীকার করে, স্বর্গকে চায় না, তা নয়। তবে সে এই দুঃখের ধরণীকে ফেলে সুন্দরের স্বর্গলোকে যেতে চায় না। সে বলে: স্বর্গ যদি থাকেই তবে তাকে আমাদের সাধনা দিয়ে এই ধূলির ধরাতে নামিয়ে আনব। আমাদের পৃথিবীই চিরদিন তার দাসীপনা করেছে, আজ তাকেই এনে আমাদের মাটির মায়ের দাসী করব। এর এ-ঔদ্ধত্যে সুর-লোকের দেবতারা হাসেন। বলেন: অসুরের অহঙ্কার, কুৎসিতের মাতলামি এরাও চোখ পাকিয়ে বলে: আভিজাত্যের আস্ফালন, লোভীর নীচতা!

গত মহাযুদ্ধের পরের মহাযুদ্ধের আরম্ভ এইখান থেকেই।

উর্ধ্বলোকের দেবতারা ভ্রূকুটি হেনে বলেন: দৈত্যের এ-ঔদ্ধত্য কোনোকালেই টেকেনি।

নীচের দৈত্য-শিশু ঘুষি পাকিয়ে বলে: কেন যে টেকেনি তার কৈফিয়তই ত চাই, দেবতা! আমরা ত তারই আজ একটা হেস্তনেস্ত করতে চাই।

দুই দিকেই বড় বড় রথী, মহারথী। একদিকে নোগুচি, ইয়েট্‌স্, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি dreamers স্বপ্নচারী; আর-একদিকে গোর্কি, যোহান বোয়ার, বার্নার্ড শ', বেনাভাতে প্রভৃতি।

আজকের বিশ্ব-সাহিত্যে এই দুটো রূপই বড় হয়ে উঠেছে।

এর অন্যরূপও যে নেই, তা নয়। এই দুই extreme-এর মাঝে যে, সে এই মটির মায়ের কোলে শুয়ে স্বর্গের কাহিনী শোনে। রূপকথার বন্দিনী রাজকুমারীর দুঃখে সে অশ্রু বিসর্জন করে, পঙ্খীরাজে চড়ে তাকে মুক্তি দেবার ব্যাকুলতায় সে পাগল হয়ে ওঠে। সে তার মাটির মাকে ভালবাসে, তাই বলে স্বর্গের বিরুদ্ধে অভিযানও করে না। এই শিশু মনে করে–স্বর্গ এই পৃথিবীর সতীন নয়, সে তার মাসি-মা। তবে সে তার মায়ের মত দুঃখিনী নয়, সে রাজরানী, বিপুল ঐশ্বর্যশালিনী। সে জানে, তারই আত্মীয় স্বর্গের দেবতাদের কোন দুঃখ নেই, তারা সর্বপ্রকারে সুখী–কিন্তু তাই বলে তার উপর তার আক্রোশও নেই। সে তার বেদনার গানখানি একলা ঘরে

বসে বসে গায়–তার দুঃখিনী মাকে শোনায়। তার আর ভাইদের মত, তার অশ্রুজলে কর্দমাক্ত হয় যে মাটি, সেই মাটিকে তাল পাকিয়ে উদ্ধত রোষে স্বর্গের দিকে ছোঁড়ে না।

এঁদের দলে–লিওনিদ আঁদ্রিভ, হুট হামসুন, ওয়াদিশ্‌ল রেমঁদ প্রভৃতি।

বানার্ড শ', আনাতোল ফ্রাঁস, বেনাভাঁতের মত হলাহল এঁরাও পান করেছেন, এঁরাও নীলকণ্ঠ, তবে সে হলাহল পান ক'রে এঁরা শিবত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন, সে হলাহল উদ্‌গার করেননি।

যাঁরা ধ্বংসব্রতী–তাঁরা ভৃগুর মত বিদ্রোহী। তাঁরা বলেন: এ দুঃখ, এ বেদনার একটা কিনারা হোক। এর রিফর্ম হবে ইভোলিউশন দিয়ে নয়, একেবারে রক্ত-মাখা রিভোলিউশন দিয়ে। এর খোল-নলচে দুই বদ্‌লে একেবারে নতুন করে সৃষ্টি করব। আমাদের সাধনা দিয়ে নতুন সৃষ্টি নতুন স্রষ্টা সৃজন করব।

স্বপ্নচারীদের Keats বলেন:
A thing of beauty is a joy for ever: (ENDYMION).
Beauty is truth, truth beauty.
প্রত্যুত্তরে মাটির মানুষ Whitman বলেন:
Not physiognomy alone–
Of physiology from top to toe I sing.
The modern man I sing.

গত Great War-এর ঢেউ আরব-সাগরের তীর অতিক্রম করেনি, কিন্তু এবারকার এই idea-জগতের Great War বিশ্বের সকল দেশের সবখানে শুরু হয়ে গেছে।

দশ মুণ্ড দিয়ে খেয়ে বিশ হাত দিয়ে লুণ্ঠন করেও যার প্রবৃত্তির আর নিবৃত্তি হল না, সেই capitalist বারণ ও তার বুর্জোয়া রক্ষ-সেনারা এদের বলে হনুমান। এই লোভ-রাবণ বলে, ধরণীর কন্যা সীতা ধরণীর শ্রেষ্ঠ সন্তানের ভোগ্যা, ধরার মেয়ে প্রজারপাইন যমরাজ প্লুটোরই হবে সেবিকা। সীতার উদ্ধারে যায় যে তথাকথিত হনুমান, রক্ষ-সেনা দেয় তার লেজে আগুন লাগিয়ে। তথাকথিত হনুমানও বলে, ল্যাজে যদি আগুনই লাগালি, আমার হাতমুখ যদি পোড়েই–তবে তোর স্বর্ণলঙ্কাও পোড়াব– বলেই দেয় লম্ফ।

আজকের বিশ্ব-সাহিত্যে এই হনুমানও লাফাচ্ছে, এবং সাথে সাথে স্বর্ণলঙ্কাও পুড়ছে–এ আপনারা যে-কেউ দিব্যচক্ষে দেখছেন বোধ হয়। না দেখতে পেলে চশমাটা একটু পরিষ্কার করে নিলেই দেখতে পাবেন। দূরবীনের দরকার হবে না।

রামায়ণে উল্লেখ আছে, সীতাকে উদ্ধার করায় পুণ্যবালে মুখপোড়া হনুমান অমর হয়ে গেছে। সে আজো পূজা পাচ্ছে ভারতের ঘরে ঘরে। আজকের লাঞ্ছনার আগুনে যে দুঃসাহসীদের মুখ পুড়ছে– তারাও ভবিষ্যতে অমর হবে না, পুজো পাবে না–এ কথা কে বলবে?

এইবার কিন্তু আপনাদের সকলেরই আমার সাথে লঙ্কা ডিঙাতে হবে। অবশ্য, বড় বড় পেট যাঁদের, তাঁদের বলছিনে, হয়ত তাতে করে তাঁদের মাথা হেঁটই হবে।

এই সাগর ডিঙাবার পরই আমাদের চোখে সর্বপ্রথম পড়ে–14th December–১৮২৫ খ্রিষ্টাব্দের 14th December–এইখানে দাঁড়িয়ে শুনি Merezhkovsky-র বেদনা-চিৎকার–"14th December"! এই খানে দাঁড়িয়ে শুনি বর্বর রুশ-সম্রাট নিকোলাসের দণ্ডাজ্ঞায় সাইবিরিয়ায় নির্বাসিত শতাধিক প্রতিভাদীপ্ত কবির ও সাহিত্যিকের মর্মন্তুদ দীর্ঘশ্বাস! এইখানে দাঁড়িয়ে দেখি জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি পুশ্‌কিনের ফাঁসির রজ্জুতে লট্‌কানো মৃত্যুপাণ্ডুর মূর্তি।

এই দিনই নির্যাতনের কংস-কারায় জন্ম নেয় অনাগত বিপ্লবী শিশু। বীণাবাদিনী সরস্বতী এইদিন বীণা ফেলে খড়্গ হাতে চামুণ্ডা-রূপ পরিগ্রহ করে। এর পরেই পাতাল ফুঁড়ে আসতে লাগল দলে দলে অগ্নিনাগ-নাগিনীর দল। কেতকী-বিতানের শাখায় শাখায় দুলে উঠল বিষধর ভুজঙ্গের ফণা।

এই নির্বাসনের সাইবেরিয়ায় জন্ম নিল দস্তয়ভস্কির Crime and Punishment। রাস্কলনিকভ্ যেন দস্তয়ভস্কিরই দুঃখের উন্মাদ মূর্তি, সোনিয়া যেন ধর্ষিতা রাশিয়ারই প্রতিমূর্তি। যেদিন রাস্কলনিকভ এই বহু-পরিচর্যারতা সোনিয়ার পায়ের তলায় তলায় পড়ে বলল,–"I bow down not to thee, but to suffering humanity in you!" সেদিন সমস্ত ধরণী বিস্ময়ে-ব্যথায় শিউরে উঠল। নিখিল-মানবের মনে উৎপীড়িতের বেদনা পুঞ্জীভূত হয়ে ফেনিয়ে উঠল। টলস্টয়ের God এবং Religion কোথায় ভেসে গেল এই বেদনার মহাপ্লাবনে সে মহাপ্লাবনে Noah-র তরণীর মত ভাসতে লাগল সৃষ্টি–প্লাবন-শেষ নতুন দিনের প্রতীক্ষায়।

তারপর এল এই মহাপ্লাবনের ওপর তুফানের মত–ভয়াবহ সাইক্লোনের মত বেগে ম্যাক্সিম গোর্কি। চেকভের নাট্যমঞ্চ ভেঙে পড়ল, সে বিস্ময়ে বেরিয়ে এসে এই ঝড়ের বন্ধুকে অভিবাদন করলে। বেদনার ঋষি দস্তয়ভস্কি বললে: তোমার সৃষ্টির জন্যই আমার এ তপস্যা। চালাও পরশু, হানো ত্রিশূল। বৃদ্ধ ঋষি টলস্টয় কেঁপে উঠলেন। ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে বলে উঠলেন: That man has only one God and that is Satan! কিন্তু এই তথাকথিত শয়তান অমর হয়ে গেল, ঋষির অভিশাপ তাকে স্পর্শও করতে পারল না।

গোর্কি বললেন: দুঃখ-বেদনার জয়গান গেয়েই আমরা নিরস্ত হব না–আমরা এর প্রতিশোধ নেব। রক্তে নাইয়ে অশুচি পৃথিবীকে শুচি করব।

'লক্ষ কণ্ঠে গুরুজির জয়' আরাবে বাসুকীর ফণা দোল খেয়ে উঠল।

নির্হতের বিশুদ্ধ, অভিযানের দীড়নে পাপের তলার পৃথিবী ঢাকার নীচের ফনিনীর মত মোচড় খেয়ে উঠল।

দূর সিন্ধুতীরে বসে ঋষি কার্ল মার্কস্ যে মারণ-মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন, তা এতদিনে তক্ষকের বেশে এসে প্রাসাদে-লুক্কায়িত শত্রুকে দংশন করলে। জার গেল–জারের রাজ্য গেল–গণতান্ত্রিকের প্রাসাদ হাতুড়ি-শাবলের ঘায়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। ধ্বংস-ক্লান্ত পরশুরামের মত গোর্কি আজ ক্লান্ত শ্রান্ত–হয়ত বা নব-রামের আবির্ভাবে বিতাড়িতও। কিন্তু তাঁর প্রভাব আজ রাশিয়ার আকাশে বাতাসে।

কার্ল-মার্কসের ইকনমিক্‌স-এর অঙ্ক এই যাদুকরের হাতে পড়ে আজ বিশ্বের অঙ্কলক্ষ্মী হয়ে

উঠেছে। পাথরের স্তূপ সুন্দর তাজমহলে পরিণত হয়েছে। ভোরের পাণ্ডুর জ্যোৎস্নালোকের মত এর করুণ মাধুরী বিশ্বকে পরিব্যাপ্ত করে ফেলেছে।

গোর্কির পরে যে সব কবি-লেখক এসেছেন, তাঁদের নিয়ে বিশ্বের গৌরব করবার কিছু আছে কি-না, তা আজও বলা দুষ্কর।

রাশিয়ার পরেই আসে স্ক্যান্ডিনেভিয়া।–আইডিয়ার জগতে বিপ্লবের অগ্রদূত বলে দাবি রাশিয়া যেমন করে–তেমনি নরওয়েও করে। ফ্রান্স-জার্মানিও এ অধিকারের সবটুকুই পেতে দাবি করে।

আজকের নরওয়ের ক্লুট হামসুন, যোহান বোয়ার–শুধু নরওয়ের কথাই বা কেন বলি, আজকের বিশ্বের জীবিত ছোট বড় সব Realistic লেখকই বুঝি বা ইব্‌সেনের মানস-পুত্র। হামসুন বোয়ারের প্রত্যেকেই অর্ধেক Dreamer, অর্ধেক ঔপন্যাসিক। বোয়ারের Great Hunger-এর Swan যেন ভারতের উপনিষদের আনন্দ। তাঁর The Prisoner Who Sang-এর নায়ক যেন পাপেপুণ্যে অবিশ্বাসী নির্বিকার উপনিষদের সচ্চিদানন্দ। হামসুনের Growth of the Soil-এর Pan-এর ছত্রে ছত্রে যেন বেদের ঋষিদের মত স্তবের আকুতি। যে করুণ-সুন্দর দুঃখের, যে পীড়িত মানবাত্মার বেদনা এঁদের লেখায় সিন্ধুতীরের উইলো তরুর মত দীর্ঘশ্বাস ফেলছে–তার তুলনা কোন কালের কোন সাহিত্যেই নেই।

এই দুঃসহ বেদনা আমরা লাঘব করি লেগারলফের রূপকথা পড়ে–মাতৃহারা শিশু যেমন করে তার দিদিমার কোলে শুয়ে রূপকথার আড়ালে নিজের দুঃখকে লুকাতে চায়, তেমনি।

রাশিয়া দিয়েছে Revolution-এর মর্মান্তিক বেদনার অসহ্য জ্বালা, স্ক্যান্ডিনেভিয়া দিয়েছে অরুন্তুদ বেদনার অসহায় দীর্ঘশ্বাস। রাশিয়া দিয়েছে হাতে রক্ত তরবারি, নরওয়ে দিয়েছে দু'চোখে চোখভরা জল। রাশিয়া বলে এ-বেদনাকে পুরুষ-শক্তিতে অতিক্রম করব ভুজবলে ভাঙব এ-দুঃখের অন্ধ কারা। নরওয়ে বলে, প্রার্থনা কর! উর্ধ্বে আঁখি তোলো! সেথায় সুন্দর দেবতা চিরজাগ্রত–তিনি কখনো তাঁর এ অপমান সহ্য করবেন না।

এই প্রার্থনার সব স্নিগ্ধ প্রশান্তিটুকু উবে যায় হঠাৎ কোন্ অবিশ্বাসীর নির্মম অট্টহাস্যে। সে যেন কেবলি বিদ্রূপ করে! চোখের জলকে তারা মুখের বিদ্রূপ-হাসিতে পরিণত করেছে। মেঘের জল শিলাবৃষ্টিতে পরিণত হয়েছে। পিছন ফিরে দেখি, চার্বাকের মত, জাবালির মত, দুর্বাসার মত দাঁড়িয়ে ভ্রুকুটি-কুটিল বার্নার্ড শ', আনাতোল ফ্রাঁস, জেসিতো বেনাভাঁতে। তাঁদের পেছন থেকে উঁকি দেয় ফ্রয়েড। শ' বলেন: Love টাভ কিছু নয়–ও হচ্ছে মা হবার instinct মাত্র, ওর মূলে Sex, আনাতোল ফ্রাঁস বলেন: কি হে ছোকরারা, খুব ত লিখছ আজকাল। বলি, ব্যালজ্যাক-জোলা পড়েছ?

বেনাভাঁতেও হাসেন, কিন্তু এ বেচারা ওঁদের মধ্যেই একটু ভীরু। হাসি লুকাতে গিয়ে কেঁদে ফেলে Leonardo-র মুখ দিয়ে বলে: "বন্ধু। যে জীবন মরে ভূত হয়ে গেল–তাকে ভুলতে হলে ভাল করে কবরের মাটি চাপা দিতে হয়। মানুষের যতক্ষণ আশা-আকাঙ্ক্ষা থাকে ততক্ষণ সে কাঁদে, কিন্তু সব আশা যখন ফুরিয়ে যায়–সে যদি প্রাণ খুলে হেসে আকাশ ফাটিয়ে না দিতে পারে তবে তার মরাই মঙ্গল!"

তাঁর মতে হয়ত আমাদের তাজমহল–শাহজাহানের মোমতাজকে ভাল করে কবর দিয়ে, ভাল করে ভুলবারই চেষ্টা।

বেনাভাঁতে হাসে, সে নির্মম, কিন্তু সে বার্নার্ড শ'র মত অবিশ্বাসী নয়।

এরি মাঝে আবার দুটি শান্ত লোক চুপ ক'রে কৃষাণ-জীবনের সহজ সুখ-দুঃখের কথা বলে যাচ্ছে–তাদের একজন ওয়াদিশ্‌ল্ রেমন্ট–পোলিশ, আর একজন গ্রাৎসিয়া দেলেদ্দা–ইতালিয়ান।

কিন্তু গল্প শোনা হয় না। হঠাৎ চম্‌কে উঠে শুনি–আবার যুদ্ধ-বাজনা বাজছে–এ যুদ্ধ-বাদ্য বহু শতাব্দীর পশ্চাতের। দেখি–তালে তালে পা ফেলে আসছে–সাম্রাজ্যবাদী ও ফ্যাসিস্ত সেনা। তাদের অগ্নে ইতালির দ্যু-অননৎসিও, কিপ্‌লিং প্রভৃতি। পতাকা ধরে মুসোলিনি এবং তার কৃষ্ণ-সেনা।

ক্লান্ত হয়ে নিশীথের অন্ধকারে ঢুলে পড়ি। হঠাৎ শুনি দূরাগত বাঁশির ধ্বনির মত শ্রেষ্ঠ স্বপনচারী নোগুচির গভীর অতলতার বাণী–"The sound of the bell that leaves the bell itself" তারপরেই সে বলে: "আমি গান শোনার জন্য তোমার গান শুনি না। ওগো বন্ধু, তোমার গান সমাপ্তির যে বিরাট স্তব্ধতা আনে তারি অতলতায় ডুব দেওয়ার জন্য আমার এ গান শোনা"। শুনতে শুনতে চোখের পাতা জড়িয়ে আসে। ধুলার পৃথিবীতে সুন্দরের স্তব-গান শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ি নতুন প্রভাতের নতুন রবির আশায়! স্বপ্নে শুনি–পারস্যের বুলবুলের গান, আরবের উষ্ট্র চালকের বাঁশি–তুরস্কের নেকাব-পরা মেয়ের মোমের মত দেহ।

তখনো চারপাশে কাদা-ছোঁড়াছুঁড়ির হোলি-খেলা চলে। আমি স্বপ্নের ঘোরেই বলে উঠি–"Thou wast not born for death, immortal bird।"

লেখক-পরিচিতি

বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম ১৩০৬ বঙ্গাব্দের ১১ই জ্যৈষ্ঠ (২৪শে মে, ১৮৯৯) পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম কাজী ফকির আহমদ আর মায়ের নাম জাহেদা খাতুন। রবীন্দ্র-সমকালে কবিতা লিখে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ এবং রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থ-উৎসর্গ প্রাপ্তি কাব্যজগতে তাঁর প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করে। 'বিদ্রোহী' কবিতা রচনা করে নজরুল বাংলাকাব্যের প্রথাগত তছনছ করে দেন। নিজের কবিতায় তিনি ব্যতিক্রমী এমন সব বিষয় ও শব্দ ব্যবহার করেন, যা আগে কখনও ব্যবহৃত হয়নি। 'অগ্নি-বীণা' (১৯২২) তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ। কিন্তু 'ব্যথার দান' (১৯২২) নজরুলের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। এটি একটি গল্পগ্রন্থ। 'অগ্নি-বীণা'র কয়েক মাস আগে এই গল্পগ্রন্থটি বের হয়। অর্থাৎ গদ্যলেখক হিসেবেই বাংলা সাহিত্যে নজরুলের আবির্ভাব। এ প্রসঙ্গে নজরুল রচিত গদ্যগ্রন্থের একটি তালিকা স্মরণ করা যাক: ছোটগল্পগ্রন্থ: ব্যথার দান (১৯২২), রিক্তের বেদন (১৯২৫), শিউলিমালা (১৯৩১); উপন্যাস: বাঁধন-হারা (১৯২৭), মৃত্যুক্ষুধা (১৯৩০), কুহেলিকা (১৯৩১); প্রবন্ধ: রাজবন্দীর জবানবন্দী (১৯২৩), যুগবাণী (১৯২৬), ঝিঙেফুল (১৯২৬), দুর্দিনের যাত্রী (১৯২৬), রুদ্র-মঙ্গল (১৯২৭), ধূমকেতু (১৯৬১) ইত্যাদি। যদি কাউকে হঠাৎ করেই প্রশ্ন করেন, কাজী নজরুল ইসলামের সৃষ্টিকর্মের কোন দিকটি আপনাকে বেশি উদ্দীপ্ত করে? তা জলে চটজলদিই কারো পক্ষে বলে দেয়া সম্ভব

নয় যে, এ বিষয়টা বা ঐ বিষয়টা আমাকে উদ্দীপ্ত করে। কেননা নজরুলের বিশাল সৃষ্টিভাণ্ডারের যেকোনো উপাদানই এখানে স্মরণযোগ্য। তাঁর 'বিদ্রোহী' কবিতা যেমন আমাদের শাসক-শোষকদের অত্যাচার নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার প্রেরণা, তেমনি প্রেরণা পাই তাঁর রচিত প্রবন্ধেও। গানেও একই কথা আছে। সম্প্রীতির অন্বেষণ ছিল নজরুলের জীবনের মূলপাঠ। নজরুল বলেছেন, 'আমি হিন্দু-মুসলমানের মিলনে পরিপূর্ণ বিশ্বাসী। তাই তাদের কুসংস্কারে আঘাত হানার জন্যই মুসলমানী শব্দ ব্যবহার করি, বা হিন্দু দেব-দেবীর নাম নিই। অবশ্য এর জন্য অনেক জায়গায় আমার সৌন্দর্যের হানি হয়েছে। তবু আমি জেনে শুনেই তা করেছি।' অর্থাৎ উপযোগিতা বিচারে নজরুলসাহিত্য সর্বোৎকৃষ্ট। ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর রবিবার কলিকাতা এলবার্ট হলে বাংলার হিন্দু-মুসলমানের পক্ষ থেকে কাজী নরুজল ইসলামকে বিপুল সমারোহ ও আন্তরিকতা সহকারে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সেখানে তিনি বলেন, 'কেউ বলেন, আমার বাণী যবন, কেউ বলেন, কাফের। আমি বলি ও দুটোর কিছুই নয়। আমি শুধুমাত্র হিন্দু-মুসলমানকে এক জায়গায় ধরে এনে হ্যান্ডশেক করাবার চেষ্টা করেছি, গালাগালিকে গলাগলিতে পরিণত করার চেষ্টা করেছি।' শুধু সমকালীন রাজনীতি নয়, বিশ্বসাহিত্যের দিক থেকে নজরুলের পাঠের পরিধি ছিল ব্যাপক। তিনি ফারসিসাহিত্যে প্রাজ্ঞতো ছিলেনই, পাশ্চাত্যসাহিত্য সম্পর্কেও তাঁর জ্ঞান ছিল অবারিত। 'অগ্নি-বীণা' (১৯২২) ছাড়াও 'দোলন-চাঁপা' (১৯২৩), 'বিষের বাঁশি' (১৯২৪), 'ভাঙার গান' (১৯২৪), 'চিত্তনামা' (১৯২৫), 'সাম্যবাদী' (১৯২৫) ইত্যাদি বহু কাব্যগ্রন্থ তিনি লেখেন। একাধিক পত্রিকার তিনি সম্পাদক ছিলেন। এই বহুমাত্রিক মানুষটি ১২ই ভাদ্র, ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ২৯শে আগস্ট ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকায় পরলোকগমন করেন।

মূল-বক্তব্য

কবিতার মতো প্রবন্ধ সাহিত্যেও নজরুলের মৌলিকত্ব রয়েছে। তাঁর প্রবন্ধের বক্তব্যে এবং যৌক্তিক যুক্তির পারম্পর্যে অভিভূত হতে হয়। নজরুলের প্রবন্ধসাহিত্য সংখ্যাধিক্যের মাপে বিচার করা যাবে না। তাছাড়া তাঁর প্রবন্ধ রচিত হয়েছে তাৎক্ষণিকতার প্রয়োজনে, জবাবি আক্রমণ প্রতিহত করার কারণে; জীবন ও জগতের বোধ ও ব্যাখ্যায়। 'বর্তমান বিশ্ব-সাহিত্য'-এর মতো প্রবন্ধ এই প্রমাণ করে যে নজরুলের পাঠ অভিজ্ঞতা ও দেখার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ব্যতিক্রম। শিল্প কার জন্য–এই তর্ক ব্যাপকভাবে উঠেছিল গত শতকের তিরিশের দশকের শেষ দিকে আর চল্লিশের দশকের প্রথমে। কিন্তু কী আশ্চর্যভাবে নজরুল বিশের দশকেই 'শিল্পের জন্য শিল্প' না 'জীবনের জন্য শিল্প' এই দুই মতকে পাঠকের সামনে তুলে ধরেন এবং তিনি যে 'জীবনের জন্য শিল্প' এই মতের পক্ষে, বিশ্বসাহিত্যিকদের অবস্থান ও উদাহরণ দিয়ে তা ব্যক্ত করেন। এখানে অবশ্য রবীন্দ্রনাথের অবস্থানও তিনি চিহ্নিত করেছেন। তাঁর বিবেচনায় রবীন্দ্রনাথ 'স্বপ্নচারী' লেখক, মাটির সঙ্গে তাঁর যোগ সামান্যই। এই 'স্বপ্নচারী' লেখকদের সারিতে নোগুচি, ইয়েটস আছেন; আর মাটির কাছাকাছি লেখকদের দলে আছেন গোর্কি, বার্নার্ড শ প্রমুখ। তিনি সাহিত্যশিল্পে জীবন, যৌনতা, লজ্জা, রাজনীতি–সব কিছুই বিশ্বপরিপ্রেক্ষিতে আলোচনায় তুলে এনেছেন এবং পাঠকের সামনে চিন্তার দুয়ার খুলে দিয়েছেন। এক প্রবন্ধে এতো বিশ্ব-সাহিত্যিকদের নাম আর কোথাও হয়তো পাওয়া যাবে না। এখানে কোনো নামই অপ্রয়োজনে যোজিত হয়নি, প্রাসঙ্গিকভাবে এসেছে সবার নাম। এতেই বোঝা যায়, নজরুলের পঠনপাঠনের পরিধি কতোটা ছিল।

আমাদের বাংলা উচ্চারণ

মুহম্মদ আবদুল হাই

একটি দেশের সমগ্র অঞ্চল জুড়ে নিতান্ত স্বাভাবিক কারণেই সে দেশের ভাষার এক রকম উচ্চারণ হয় না। এক একটি অঞ্চল বিশেষের উচ্চারণ এক এক রকম। অঞ্চল বিশেষের উচ্চারণ উপভাষাগত বা dialectal উচ্চারণ নামে পরিচিত।

এক উপভাষাভাষী অঞ্চলের লোক পরস্পরের মধ্যে কিংবা তাদের পার্শ্ববর্তী উপভাষা অঞ্চলের লোকদের সঙ্গে হয়তো নিজেদের উপভাষায় কথাবার্তা বলতে পারে, কিন্তু একটি প্রান্তবর্তী উপভাষা অঞ্চলের অধিবাসীরা সুদূরস্থ কিংবা অন্য প্রান্তে অবস্থিত অঞ্চলের অধিবাসীদের সঙ্গে নিজেদের উপভাষায় হয় কথাবার্তা বলতে পারে না নয়তো কথা বলতে গিয়ে অসুবিধে বোধ করে। এজন্য একটি দেশের কোন এক বিশেষ অঞ্চলের উপভাষা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সংস্কৃতিগত কারণে প্রাধান্য লাভ করে এবং সমগ্র দেশের মধ্যে ভাব আদান-প্রদানের বাহন রূপে চালু হয়ে যায়। এমনি ভাবে গত দুশো বছরে কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ ও শান্তিপুর অঞ্চলের উপভাষাই সমগ্র বাংলা দেশের শিক্ষা-সংস্কৃতির একটি সর্বজন বোধগম্য বাহন হিসেবে গড়ে ওঠে এবং সকলের কাছেই তা মোটামুটি সাধারণ ভাষা রূপে গৃহীত হয়। এর উচ্চারণকে standard বা আদর্শ না বললেও শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলের কাছেই তা আদর্শ উচ্চারণ রূপে স্বীকৃতি পেয়েছে। তার কারণ এর উচ্চারণ সুস্পষ্ট; ধ্বনির পরিবর্তনশীলতা এর অগ্রগতির পরিচায়ক এবং ব্যঞ্জনা আজ পর্যন্ত মধুর শ্রুতিব্যঞ্জক।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর আমাদের সংস্কৃতির কেন্দ্র কলকাতা থেকে ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়েছে; কিন্তু যে পরিবেশে কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের উপভাষা আমাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিকশিত হয়েছিল, আজ আর তা নেই। কলকাতা কেন্দ্রিক উপভাষা যে সময় আদর্শ ভাষা হিসেবে গড়ে উঠেছিল সে সময় অন্য কোন আদর্শ ভাষা দেশে ছিল না। তা ছাড়া এ ভাষা সমগ্র দেশে একদিনে প্রতিষ্ঠা পায় নি–পেয়েছে এবং পেয়ে আসছে বিগত দুশো বছর ধরেই।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর আমাদের কলকাতা-কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী ঢাকা-মুখো হয়েছে। এতে আমাদের সাংস্কৃতিক জীবন স্বতন্ত্র ভাবে বিকশিত হবার সুযোগ পাবে তা সত্য, কিন্তু ঢাকা বা ঢাকার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের উপভাষা কি আমাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির বাহন হিসেবে একটি আদর্শ ভাষার রূপ নেবে? আমাদের শিক্ষিত লোকেরা যদি প্রচলিত ও গৃহীন-ভাষার উত্তরাধিকারী না হতেন, স্কুল-কলেজে কি কোর্ট-কাছারিতে যদি সে ভাষার প্রচলন না থাকতো এবং আমাদের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক জীবনের যদি এখানেই সূচনা হতো, তাহলে অবশ্য এখানকার কোন একটি উপভাষা ধীরে ধীরে সর্বসাধারণের গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠতো।

আজাদী-উত্তর যুগে আমাদের বুদ্ধিজীবী মহলে এ সম্পর্কে নানা দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে। এ দ্বিধা এসেছে এক দিকে নিজেদের উপভাষাগত উচ্চারণ ব্যবহার করার তাগিদে আর অন্য

দিকে এতকালের প্রচলিত আদর্শ উচ্চারণ সম্পূর্ণরূপে বর্জন করার ক্ষমতায়। এর ফলে স্কুল-কলেজে, কোর্ট-কাছারিতে, বিভিন্ন বক্তৃতামঞ্চে এবং খবরের কাগজগুলোর আঙিনে আমাদের উচ্চারণে এক জগাখিচুড়ি অবস্থা দেখা দিয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের প্রত্যেকটি অঞ্চলের লোকই এ প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে জীবিকার্জনের জন্য নানা ভাবে জড়িত। এক অঞ্চলের লোক একই কর্মক্ষেত্রে অন্য অঞ্চলের লোকের সঙ্গে কথা বলার জন্য সম্পূর্ণভাবে তার নিজস্ব উপভাষার ওপরে নির্ভর না করলেও তার উপভাষার নিজস্ব ধ্বনি-পদ্ধতির দ্বারা প্রভাবান্বিত হচ্ছে। প্রাক-আজাদী যুগে এ রকম ক্ষেত্রে নিজস্ব উচ্চারণ করলে হাস্যাস্পদ হবার ভয় ছিল; ফলে চলিত উচ্চারণ আয়ত্ত করার জন্য তার দিক থেকে একটা সযত্ন প্রয়াসও ছিল। আজকে উপহাসের ভয় নেই বরং আছে তার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ স্বকীয় বৈশিষ্ট্যকে প্রতিষ্ঠিত করার সজোর প্রয়াস।

এর ফলে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও আমরা বাংলা স্বর ও ব্যঞ্জন ধ্বনিগুলোর আঞ্চলিক উচ্চারণ হুবহু শুনতে পাচ্ছি। গৃহীত উপভাষা অনুসারে বাংলার 'এ' স্বরধ্বনিটির উচ্চারণ অর্ধ সংবৃত, কিন্তু শ্রীহট্ট, ও চট্টগ্রামে 'এ' স্বরধ্বনিটির উচ্চারণ উন্মুক্ততর। প্রচলিত 'লেন দেন' শব্দ দুটো এ অঞ্চলের অনেকের মুখেই উচ্চারিত হয় 'ল্যান দ্যান' রূপে। তাঁরা 'বেল', 'তেল', 'ফেল' প্রভৃতি শব্দের 'এ' ধ্বনিটিকেও অপেক্ষাকৃত উন্মুক্তভাবে উচ্চারণ করেন। তাঁদের 'head', 'bed', 'sell', 'bell' প্রভৃতি ইংরেজী শব্দের 'e' স্বরধ্বনি উচ্চারণ থেকে এ কথার সত্যতা উপলব্ধি করা যাবে। এ শব্দগুলোকে তাঁদের অনেক শিক্ষিত লোকও 'হ্যাড্', 'ব্যাড্', 'স্যাল্', 'ব্যাল্' রূপে উচ্চারণ করে থাকেন।

চট্টগ্রাম ও শ্রীহট্ট অঞ্চলে 'খ' ধ্বনিটি স্পর্শধ্বনি নয়, আরবী 'خ' এর মতো শিস্ বা ঘর্ষণজাত। 'খাও', 'খাওয়া' প্রভৃতি শব্দ তাঁদের মুখে হয় যায় (خ-াও), (خ-াওয়া)। চট্টগ্রামে 'কাপড়' শব্দের উচ্চারণ আমি '(خ)-াওড়' শুনেছি। 'কাপড়' যে 'খাওড়' হয়েছে তাতে কিছু যায় আসে না কিন্তু 'কাপড়ে'র উচ্চারণ যখন (خ)-াপড় শুনি তখনই কানে লাগে।

পূর্ব পাকিস্তানের অধিকাংশ জায়গায় 'ড়' ধ্বনি নেই; এর পরিবর্তে 'র' ধ্বনি ব্যবহৃত হয়। আমরা 'গাছ থেকে পড়া', 'পড়া তৈরি করা' আর 'কাপড় পরা' প্রভৃতি স্থানে ড় ও র-এর মধ্যে কোন তফাৎ দেখিনে, সর্বত্রই শুধু 'র' হয়ে যেতে দেখি; ফলে শুধু 'গাছ' থেকে 'পরা', 'পরা তৈরি করা', 'কাপর পরা'ই শোনা যায় এমন নয়, বানানেও 'ড়' ও 'র'-এর গোলযোগ দেখা দেয়। এঁদের উচ্চারণে 'ড়' প্রায়ই 'র' হয়ে যায় দেখে অনেকে দৈন্য ঢাকবার জন্য 'র' স্থানে 'ড়' ব্যবহার করেই ক্ষান্ত হয় না, বরঞ্চ 'র' ও 'ড়' এর গোলযোগ সৃষ্টি করেন। তাই 'নিবিড়' হয় 'নিবির', 'তিমির' হয় 'তিমিড়', 'ওরে' হয় 'ওড়ে', 'অম্বর' হয় 'অম্বড়', হার>হাড়, হাড়>হার, বারি>বাড়ি, গাড়ি>গারি। আর সব চেয়ে বড় বিড়ম্বনার সৃষ্টি হয় 'নারী'কে 'নাড়ি' আর 'নাড়ি'কে 'নারী' উচ্চারণে।

বাংলা দন্তমূলীয় শিসজাত ধ্বনি 'শ' ঢাকা ও পূর্ব বাংলার অন্যত্র 'হ' হয়ে গেছে। সেজন্য 'এসো', 'বসো', 'শালা' প্রভৃতি স্থানে আমরা 'আহো', 'বহো', হালা' শুনি। 'শ' স্থানে 'হ' এঁরা যদিও চলিত উচ্চারণে সর্বত্র ব্যবহার করেন না তবু অসর্ত মুহূর্তে কোন কোন সময়ে অনেকের মুখ দিয়ে বের হয়ে যায়। তা ছাড়া পূর্ব বাংলার গ্রামঞ্চলে 'হ'-এর বিশুদ্ধ উচ্চারণও করা হয়

না। স্বরযন্ত্রের মধ্যস্থিত শ্বাসপথ হঠাৎ রুদ্ধ করার পরক্ষণেই মুক্ত করে দিয়ে আরবী হামযার (ء) মতো glottal stop জাতীয় এক রকম স্পর্শধ্বনি পাওয়া যায়। 'হাত' সেখানে হয় 'আত', হয়>'অয়', হিন্দু>'ইন্দু' ইত্যাদি।

পূর্ব বাংলার বহু স্থানে 'ঘ', 'ঝ', 'ঢ', 'ধ', 'ভ' প্রভৃতি মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলোর মহাপ্রাণতা লোপ পেয়ে গেছে। এর ফলে এ সব অঞ্চলে সংশ্লিষ্ট শব্দের শুধু যে মহাপ্রাণহীন বানান দেখি, তা নয়, তাঁদের মুখে 'ঘোড়া'র উচ্চারণ 'গোরা' শোনা যায়; ঘাস>গাস; ভোঁতা>বোতা; ভীষণ>বীষণ; ধৌত>দৌত; ঢাকা>ডাকা; ঢোকা>ডুকা, কঠোর>কটর; বিধবা>বিদবা; ভাত>বা'ত, আরম্ভ> আরম্ব ইত্যাদি।

চলিত বাংলায় 'খ' ও 'গ' এবং 'ভ' ও 'ব' এর মধ্যে মহাপ্রাণতা ও স্বল্পপ্রাণতা জনিত বৈপরীত্য আছে। আমরা পর পর 'ঘা' ও 'গা' এবং 'ভাত' ও 'বাত' উচ্চারণ করে স্বতন্ত্র অর্থবোধক দুটো করে শব্দ পাই। ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে 'ঘ' ও 'ভ' প্রভৃতির মহাপ্রাণতা লুপ্ত হয়ে implosive তথা recursive রূপ ধরেছে। এ সব জায়গায় ধ্বনিগুলো 'ধ'ও নয়, 'গ'ও নয়, 'ভ'ও নয়, 'ব'ও নয়, 'ঘ'ও 'গ' এবং 'ভ' ও 'ব' এর মাঝামাঝি ধ্বনি–নিঃশ্বাস ছাড়ার সঙ্গে নয় বরঞ্চ নিঃশ্বাস গ্রহণের সঙ্গে উচ্চারিত হয়। তাই এ সব অঞ্চলে গা' ও গা, বা'ত ও বাত-এর মধ্যে ধ্বনিগত বৈপরীত্য জনিত শব্দের অর্থগত পার্থক্য শুনি।

প্রচলিত বাংলায় 'চ', 'ছ', 'জ', 'ঝ', দন্তমূলীয় তালব্যধ্বনি কয়টি মূলতঃ স্পর্শধ্বনিই। ঘৃষ্টতা গুণ কিছু থাকলে থাকতে পারে, কিন্তু এদের মধ্যে স্পৃষ্টতা গুণই প্রধান। পূর্ব বাংলায় এ ধ্বনিগুলো নানাভাবে সমস্যার সৃষ্টি করছে। এগুলো ঢাকার আদিম অধিবাসীদের কাছে ঘৃষ্ট-স্পৃষ্ট (affricate), কিন্তু খাস পূর্ব বাংলার নোয়াখালি প্রভৃতি অঞ্চলের উষ্ম তথা শিস্-ধ্বনি। এ সব অঞ্চলে এ ধ্বনিগুলো উচ্চারিত হয় স (s), য (z), ঝ (zh) রূপে। এ সব অঞ্চলের লোকের মুখে চলিত বাংলারও যথার্থ উচ্চারণ আমরা শুনতে পাইনে, শুনি আঞ্চলিক উচ্চারণ। এর ফলে 'মুসলমান', 'ইসলাম' প্রভৃতি শব্দ এঁরা যেমনই উচ্চারণ করুন না কেন লিখতে চান 'স'-এর বদলে 'ছ' দিয়ে; কিন্তু চলিত উচ্চারণে 'ছ' একটি নির্ধারিত ধ্বনির প্রতীক প্রতীক বলেই এ সব শব্দ এঁদের 'ছ' ব্যবহার সকলের কাছেই সমস্যার সৃষ্টি করে।

পূর্ব বাংলার নোয়াখালি অঞ্চলে 'প' ধ্বনিটি নেই। ওষ্ঠ্যবর্গীয় স্পৃষ্ট 'প' ও 'ফ'-এর জায়গায় এঁরা ব্যবহার করেন ঘর্ষণজাত 'ফ' (ইংরেজী f)-এর সমতুল্য ধ্বনি। এ কারণে তাঁদের মুখে 'পানি' হয়ে যায় 'ফানি', পাওয়া>ফাওয়া, ফুল>ful 'ভ' (bh) ও স্পৃষ্ট থাকে না, তাঁহাদের মুখে ইংরেজীর মতে 'v' ভাবে উচ্চারিত হয়। 'ভালো', 'ভারী', ভয়' প্রভৃতি শব্দ তাঁদের মুখে আমরা 'valo', 'vari', 'vay'-এর মতো উচ্চারিত হতে শুনি।

উত্তর-বঙ্গের মালদহ অঞ্চলের দন্তমূলীয় 'শ' ধ্বনির উচ্চারণ দন্ত্য কিংবা দন্তমূলীয় না হয়ে দুটোর মাঝামাঝি জায়গা থেকে উচ্চারিত হয়। 'এসো', 'বসো', 'আসো', প্রভৃতি শব্দ আমরা এ অঞ্চলে 'এসো' (eso), 'বসো' (baso), 'আসা', (asa) রূপে উচ্চারিত হতে শুনি।

চলিত বাংলার পশ্চাত্তালুজাত অর্ধসংবৃত স্বরধ্বনি 'ও' মৈমনসিংহের অঞ্চল বিশেষে সংবৃত স্বরধ্বনি 'উ'র মতো উচ্চারিত হয়। তাই সেখানে 'লোক' শব্দটি উচ্চারিত হয় 'লুক' রূপে, 'দোষ'-এর উচ্চারণ শুনি 'দুষ'। 'বোকা' হয় 'বুকা', বিধবা>বিদুবা, আমোদ>আমুদ, গোপনীয়>গুপনীয়, ভোঁতা>ভুতা, চোর>চুর, কোনমতে>কুনমতে, ঢোকা>ঢুকা, খোকা>খুকা, আলোক>আলুক ইত্যাদি।

এ শব্দগুলো সাদৃশ্যে এ অঞ্চলে 'আলো'>'আলু' আর 'গরু'>'গুরু' হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

পূর্ব বাংলায় চন্দ্রবিন্দুর উচ্চারণ নেই বললেই চলে। চলিত ভাষায় একই স্বরধ্বনির মৌখিক রূপ ও অনুনাসিক রূপ শুধু অনুরণন ব্যঞ্জনাগত দিক থেকেই যে স্বতন্ত্র তা নয়, তার phoneme বা মূলধ্বনি হিসাবেই স্বতন্ত্র। সেজন্য 'কাদা' এবং 'কাঁদা', 'কাচা' এবং 'কাঁচা', 'কাটা' এবং 'কাঁটা', 'খাটি' এবং 'খাঁটি', 'বাস' (উচ্চারণ বাশ) এবং 'বাশ' প্রভৃতি শব্দগুলো অর্থের দিক থেকেও পরস্পর পৃথক। পূর্ব বাংলায় এ ভেদ করা হয় না; তাই 'কাদা', 'কাঁদা', 'কাচা', 'কাঁচা' প্রভৃতি শব্দ সর্বত্রই একাকার হয়ে যায়। পূর্ব বাংলায় এখানেই চন্দ্রবিন্দুর দুর্গতির শেষ নয়, শব্দের উৎপত্তিগত দিক থেকে যেখানে চন্দ্রবিন্দুর একান্ত প্রয়োজন, যেমন কন্টক>কন্টঅ> কাঁটা প্রভৃতি শব্দে, সেখানেও চন্দ্রবিন্দু ব্যবহৃত হয় না। অথচ এখানে এমন সব শব্দে চন্দুবিন্দুর ব্যবহার হয় যেখানে অর্থগত কিংবা ইতিহাসগত কোন দিক থেকেই এর প্রয়োজন নেই।

এতক্ষণ আমি আমাদের উচ্চারণের স্থূল দিক নিয়ে আলোচনা করলাম। চলতি বাংলা উচ্চারণের অনেক সূক্ষ্ম ও সুন্দর দিকও আছে। তার সৌন্দর্য মাধুর্যের সৃষ্টি হয়েছে স্থান বিশেষে 'এ' ও 'অ' প্রভৃতি স্বরধ্বনির যথার্থ উচ্চারণে। 'এ'-র উচ্চারণ কোথাও সরল কোথাও তির্যক 'এ্যা'-র মতো, ঠিক তেমনি 'অ'-র উচ্চারণও কোথাও অবিকৃত যথার্থ 'অ' আর কোথাও বিকৃত–অর্থাৎ ও-কারের মতো। একটু খেয়াল করলেই দেখা যাবে, আমরা যে সব জায়গায় লিখি 'এ' অথচ পড়ি 'এ্যা' কিংবা লিখি 'অ' পড়ি 'ও', সেগুলো আমাদের নেহাৎ খেয়াল-খুশী চরিতার্থ করার জন্য নয়, সেগুলো স্বরসঙ্গতি জনিত উচ্চারণ। চলিত বাংলায় স্বরধ্বনির সমন্বয় জনিত এ ধরনের উচ্চারণ এ উপভাষার গতিশীলতারই পরিচয় দেয়, কিন্তু পূর্ব বাংলায় এ সব ক্ষেত্রে হয় প্রাক-পরিবর্তন যুগের আদিম উচ্চারণই রয়ে গেছে, নয়তো যথারীতি অনুকরণ করা হয়নি বলে নানা গোলাযোগের সৃষ্টি হয়েছে।

প্রথমতঃ অর্ধসংবৃত সম্মুখ স্বরধ্বনি, 'এ'-র কথাই ধরি। শব্দে ব্যবহৃত হলে 'এ' হরফটির দুটো উচ্চারণ দেখি–একটি 'এ' এবং অন্যটি 'এ্যা'। 'এ' হরফটির সাধারণতঃ 'এ' উচ্চারণ হয়।

(১) শব্দের মধ্যে ও শব্দের শেষে: যেমন–অনেক, এসেছে, করেছে, করে, ধরে, মাঝে, কাছে, দূরে ইত্যাদি।

(২) আ-কার এবং ই-কার থেকে জাত অভিশ্রুতি (umlaut)-তে বা সন্ধিস্বর হলে, যেমন–হেটো, ধেনো, লেখা, লেখো, লেখে, রেখো, রেখে, জেলে, বেলে, কেনা, ছেড়া ইত্যাদি।

(৩) 'ই' এবং 'উ' স্বরধ্বনির আগে; যেমন–দেশী, দেখি , ঢেঁকি, নেবু, জেবু, গেদু, হেঁদু ইত্যাদি।

(৪) পরে য়া, হা ইত্যাদি থাকলে কিংবা নেতিবাচক 'বে' উপসর্গরূপে ব্যবহৃত হলে; যেমন–কেয়া, খেয়া, দেয়া, বেহায়া, বেহেড্, বেলেল্লা ইতাদি।

(৫) সংযুক্ত ধ্বনির আগে; যেমন–চেষ্টা , কেষ্টা, এক্কা, টেক্কা ইত্যাদি।

(৬) তেল, বেল, কেবল, বেতন, বেদনা, দেবতা ইত্যাদি শব্দে। আর 'এ'-এর সাধারণতঃ 'এ্যা' উচ্চারণ হয়।

১। 'অ' এবং 'আ' পরে থাকলে পূর্বের 'এ'-কার অনেক সময় 'এ্যা' হয়ে যায়; যেমন–কেন>ক্যান, হেন> হ্যান, একা>এ্যাকা, এত>এ্যাত, খেলা>খ্যালা, মোলা>ম্যালা, পেঁচা> প্যাঁচা, ফেলা>ফ্যালা, এগারা>এ্যাগার ইত্যাদি।

২। হলন্ত একাক্ষরিক (mono-syllabic) ক্রিয়ামূলের আদিতে 'এ' থাকলে; যেমন–ফেল্>ফ্যাল, দেখ্>দ্যাখ, বেচ্> ব্যাচ্, দেয়্>দ্যায়্, নেয়্> ন্যায়্ ইত্যাদি।

এ সব স্থলে আমাদের পূর্ব বাংলায় আমরা কি উচ্চারণ শুনি? 'এ্যাক' হয় 'য়েক্', 'এ্যাকটা' হয় 'য়েকটা', 'একটি' হয় 'এ্যাকটি', 'এ্যাখন' হয় 'য়েখন', এক্ষুনি আর এখনি হয় এ্যাখনি; দ্যাখা>দেখা, এ্যাকা>য়েকা, লেখা>ল্যাখা, ল্যখ্য>ল্যাখ্য, লেখক>ল্যাখক, লেখাপড়া>ল্যাখাপড়া, লেখনী>ল্যাখনী, কেবল>ক্যাবল, তেল>ত্যাল, বেল>ব্যাল, দেশ>দ্যাশ, ভেস>ভ্যাস, লেঝ>ল্যাজ, বেলা>ব্যালা, ব্যালা>বেলা, স্নেহ>স্ন্যাহ, এবং>এ্যাবং ইত্যাদি।

এর পর 'অ' হরফটির উচ্চারণ বিচার করা যাক। এটি যদিও 'অ' স্বরধ্বনির প্রতীক, তবু শব্দে মধ্যে কোথাও 'অ' এবং কোথাও 'ও' হিসেবে উচ্চারিত হয়। সাধারণতঃ যে সব জায়গায় 'অ' এর 'ও' উচ্চারণ হয়:

(১) ই, উ এবং ঋ-কারে পূর্বে স্বরসঙ্গতিজনিত অবস্থায় যেমন–অতি, মতি, গতি, নতি, অগ্নি, অগ্রিম, কপি, গরু, জরু, সরু, মরু, পটু, অঙ্গুলি, অধু, হনু, যকৃত, কর্তৃক, ভর্তৃমসৃণ, বক্তৃতা ইত্যাদি।

(২) য-ফলা'যুক্ত ধ্বনির পূর্বের, যেমন–গদ্য, পদ্য, সদ্য, মদ্য, সভ্য, লভ্য, দন্ত্য, গব্য, যোগ্য, হত্যা, সত্য, সত্যগ্রহ ইত্যাদি।

(৩) ব-ফলা'যুক্ত ধ্বনির পূর্বের 'অ' কারও প্রায় 'ও' হয়ে যায়, যেমন: অন্বেষণ>ওন্বেষণ, ধন্বন্তবী>ধোন্বন্তরী, মন্বন্তর>মোন্বন্তর ইত্যাদি।

(৪) 'ক্ষ'-এর পূর্বে; যেমন–বক্ষ, লক্ষ, যক্ষ, রক্ষা ইত্যাদি।

(৫) ক্রিয়াপদে স্থান বিশেষে অ-কারের উচ্চারণ 'ও' হয়ে যায়, যেমন–হ'লে, ক'রলে, ব'লে, ব'লো, প'লো ম'লো ইত্যাদি।

(৬) দ্ব্যক্ষর (দুই সিলেব্‌ল) বিশিষ্ট শব্দের শেষের সিলেব্‌লটি closed তথা বদ্ধাক্ষর হ'লে

তার অন্তর্নিহিত অ>ওতে পরিণত হয়, যেমন– বালক>বালোক, পালক>পালোক, সবক>সবোক, ডবল>ডবোল, মোরগ>মোরোগ, বেদন>বেদোন, যতন>যতোন, আপন>আপোন, মরণ>মরোণ, ধরণ>ধরোণ, (কণক ও গণক শব্দ দু'টিতে এ নিয়ম বোধ হয় এখনও খাটে না অর্থাৎ এদের দ্বিতীয় অক্ষরের 'অ' এখনও 'ও'তে পরিণত হয়নি)।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সৌরভ, কৌরভ, গৌরব, ভৈরব প্রভৃতি শব্দের দ্বিতীয় অক্ষরের 'অ' সম্পূর্ণ 'ও' না হয়ে ঈষৎ ও-কারবৎ উচ্চারণ লাভ করে।

(৭) ন ও ণ-র সাহায্যে বদ্ধাক্ষর (closed) বিশিষ্ট একাক্ষরিক শব্দের অন্তর্নিহিত 'অ'>ও রূপে উচ্চারিত হয়; যেমন : বন>বোন, মন>মোন, মণ>মোণ, ধন> ধোন, জন>জোন, পণ>পোণ, ক্ষণ>ক্ষোণ ইত্যাদি; কিন্তু 'গণ' এবং 'রণ' এ শব্দ দু'টি এ নিয়মের মধ্যে পড়ে না অর্থাৎ এদের অন্তর্নিহিত 'অ' উচ্চারণে রক্ষিত হয়, 'ও'তে পরিবর্তিত হয় না।

(৮) র-ফলা সংশ্লিষ্ট ধ্বনিতে অ-কার থাকলে তাও 'ও'তে পরিণত হয় যেমন– শ্রবণ>শ্রোবণ, ভ্রম>ভ্রেম, ভ্রমণ>ভ্রোমণ, ব্রহ্ম>ব্রোহ্ম, ব্রজ>ব্রোজ, গ্রহ>গ্রোহ, এস্ত>ত্রোস্ত, প্রতাপ>প্রোতাপ, প্রমাণ>প্রোমাণ ইত্যাদি; কিন্তু '্' ফলা সংশ্লিষ্ট ধ্বনির 'অ' কারের পরে 'য়' থাকলে সে 'অ'-এর বিকার হয় না, যেমন–ক্রয়, বিক্রয়, ক্রয়, আশ্রয় ইত্যাদি।

(৯) মন্দ, মন্ত্র, মঙ্গল, নখ এক'টি শব্দে কোন নিয়ম ছাড়াই প্রথম অক্ষরের অন্তর্নিহিত 'অ' এর উচ্চারণ 'ও' হয়, অর্থাৎ মন্দ, মন্ত্র , মঙ্গল, নখ যথাক্রমে মোন্দ, মোন্ত্র, মোঙ্গল, নোখ রূপে উচ্চারিত হয়।

(১০) অ-স্বরান্তিক শব্দের অন্ত্যস্বরের উচ্চারণে; 'অ' 'ও' রূপে উচ্চারিত হয় যেমন–কর (করো), ধর (ধরো), মার, পাড়, গাড়, গাঢ়, দৃঢ়, পড়, অনন্ত, তরতম, ধরধর, মরমর, পড়পড়, ভরভর ইত্যাদি।

নিম্ন তালিকাভুক্ত শব্দে অন্ত্য 'অ' প্রায় 'অ' রূপে উচ্চারিত হতো, কিন্তু এ সব জায়গারও 'অ'-র উচ্চারণের ঝোঁক (tendency) বর্তমানে 'ও'র দিকে:

(১) ঋ-কারের পরে: যেমন–তৃণ, বৃষ, মৃত, কৃত, অমৃত ইত্যাদি।

(২) ঐ-কারের পরে; যেমন–শৈল, হৈম, নৈশ ইত্যাদি।

(৩) কতকগুলো যুক্তধ্বনির পরে এবং অনুস্বার ও বিসর্গের পরে; যেমন–রক্ত, ভক্ত, শঙ্খ, দন্ত, হংস, মাংস, দুঃখ ইত্যাদি।

(৪) শব্দশেষের 'হ'-এর সঙ্গে; যেমন–দেহ, স্নেহ, কটহ, প্রমেহ ইত্যাদি।

কিন্তু স্কুল-কলেজে, গণ্যমান্য লোকের কথাবার্তায় ও বেতার বক্তৃতায় আমরা কি নিত্য 'পদ্য' (পোদ্য) পঅদ্দ, পদ্য (গোদ্দ) গঅদ্দ, চোদ্দ চঅদ্দ, সদ্য (সোদ্দ) সঅদ্দ, অদ্য (ওদ্দ) অদ্দ, সব্যসাচী (সোব্বসাচী) সঅব্বসাচী, সন্ধ্যা (সোন্ধ্যা) সঅন্ধ্যা, কন্যা (কোন্না) কঅন্না, বন্যা (বোন্না) বঅন্না, বক্ষ (বোক্ষ) বঅক্ষ, লক্ষলক্ষ (লোক্ষলাক্ষ) লোক>লঅক্ষ লঅক্ষ লুক, অন্য (ওন্য) অন্ন রূপে উচ্চারিত হতে শুনছিনে? এখানে কি নিত্য 'সত্য' (সোত্ত) আর 'সত্ত' দুটোই 'সত্ত' হয়ে দাঁড়াচ্ছে না? এ তো আছেই, তা ছাড়া সাশ্বিস্বরজনিত 'ও' যেমন ওতি, গেতি, গোভীর, জোপিছে ইত্যাদি হচ্ছে অঅতি, গঅতি, গঅভীর, জঅপিছে। গোরু, জোরু, সোরু>গঅরু, জঅরু, সঅরু; কোর্তৃক>কঅর্তৃক। আর অধীর, অসীম, অশেষ, অজিত প্রভৃতি নঞ্তৎপুরুষ সমাস-জাত নেতিবোধক শব্দগুলো ওধীা, ওসীম, ওজিত হয়ে যাচ্ছে। করো, ধরো, মারো, কালো, ধলো, জ্বালো প্রভৃতি শব্দগুলো হচ্ছে করঅ, ধরঅ, মারঅ, কালঅ, ধলঅ, জ্বলঅ। মরোমরো, ভরোভরো, ধরোধরো, পড়োপড়ো, হচ্ছে মরঅমরঅ, ভরঅভরঅ, ধরঅধরঅ, পড়অপড়অ। করো এবং কো'রো>কঅরঅ, আর কো'রোনা হচ্ছে কঅরঅ না। কোরতাম>কঅরতাম, কোরলাম>কঅরলাম, হোলাম>হঅলাম, মোরলাম>মঅরলাম, বন্ধ>বোন্ধ; মন (মোন) (mind)>মঅন, বন (forest) বঅন; নখ (নোখ)> নঅখ।

এ ছাড়া রাজ্য, বাল্য, কাব্য, খাদ্য প্রভৃতি শব্দে আমরা এখানে আকারের তির্যক উচ্চারণ তথা এ ধরনের য-ফলা যুক্ত ব্যঞ্জন ধ্বনির পূর্বে অপিনিহিতি-জাত 'আ+ই'র মিশ্র উচ্চারণ রাইজ্য, বাইল্য, কাইব্য, খাইদ্য শুনতে পাচ্ছি।

কিছু দিন হলো কুমিল্লার কয়েকটি ছেলের মুখে রবীন্দ্রনাথের 'দুঃসময়' কবিতার আবৃত্তি শুনছিলাম। তাদের মধ্যে প্রায় সকলেই 'মহা আশঙ্কা জপিছে মৌন অন্তরে' পংক্তিটি পড়ল 'মহা আশঙ্কা জঅপিছে মৌন অন্তরে।' পরে জানতে পরলাম এ অঞ্চলে আকাঙ্ক্ষার সাদৃশ্যে আশাঙ্কা হয়েছে আশাঙ্ক্ষা।

পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলের উদাহরণে এত বেশী তারতম্য রয়েছে বলেই এ সম্পর্কে আজ আমাদের অবহিত হবার এবং কর্তব্য নির্ধারণ করার সময় এসেছে। একটা standard বা আদর্শ উচ্চারণ যদি আমাদের না থাকে তাহলে প্রত্যেকে নিজের উচ্চারণকেই শিক্ষা ও সংস্কৃতির বাহন হিসেবে চালু করতে চেষ্টা করবে। পূর্ব পাকিস্তানের প্রত্যেকটি অঞ্চলের অধিবাসী এবং প্রত্যেকটি দায়িত্বশীল মানুষই যদি নিজেদের উপভাষাগত উচ্চারণটিকে আদর্শ মনে করেন এবং তাঁরা যা উচ্চারণ করবেন সেটাকেই যদি যথার্থ উচ্চারণ বলে চালু করতে চান তাহ'লে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উচ্চারণে একটি অরাজকতা দেখা দেবে।

পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশের ভাষাতেই নানা উপভাষাগত উচ্চারণ রয়েছে, তবু একটি বিশেষ অঞ্চলের উপভাষাই উচ্চারণের দিক থেকে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার বাহন হয়েছে। ইংলণ্ডে লণ্ডনের ভাষা, জার্মানীতে বার্লিনের, ফ্রান্সে প্যারিসের, চীনে পিকিং-এর, ভারতে প্রাদেশিক ভাষাগুলোর মধ্যে তাদের রাজধানী কেন্দ্রিক রূপের , প্রাক্-আজাদী যুগের বাংলা দেশেও তাই কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের উপভাষাই ছিল এ ব্যাপারে মুখ্য। বিংশ শতাব্দীর এ গণতান্ত্রিক যুগে কোন একটি অঞ্চলের উচ্চারণকে অন্য অঞ্চলের লোকেরা আদর্শ বলে হয়তো মানতে চাইবে না; তাই বলে ভাষা ব্যাপারে দেশব্যাপী অরাজকতার হাত থেকে বাঁচবার জন্য কি কোন উপায় নেই? বর্তমান বিশ্বের সেরা গণতান্ত্রিক দেশ সমগ্র ইংল্যাণ্ডে যে উচ্চারণ শিক্ষা

ও সংস্কৃতির বাহন হিসেবে চলে, তাকে ইংরেজরা তাই Standard বলেন না, বলেন received. প্রত্যেক অঞ্চলের অধিবাসীরা নিজেদের মধ্যে আঞ্চলিক উচ্চারণই ব্যবহার করেন। অথচ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলোতে, সভা সমিতিতে সাংস্কৃতিক আলাপ-আলোচনায় সর্বত্রই দক্ষিণ ইংলণ্ড অর্থাৎ লণ্ডনের উপভাষাভিত্তিক 'received pronunciation বা সর্ববাদী স্বীকৃত উচ্চারণই ব্যবহৃত হয়। বি-বি-সি থেকেও এ ভাষায় সংবাদ ও কথিকা ইত্যাদি প্রচার করা হয়। সমগ্র ইংলণ্ডে উচ্চারণ দেশব্যাপী সকলকে শেখানোর ব্যবস্থাও রয়েছে।

পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীরা নিজেদের মধ্যে নিজেদের আঞ্চলিক উচ্চারণ ব্যবহার করুন তাতে কারও কোনো আপত্তি থাকার কারণ নেই; সমগ্র শিক্ষা ও সংস্কৃতির বাহন হিসেবে received pronunciation-এর মত একটা কিছু গ্রহণ না করলে এমন দিন আসবে যে দিন পরস্পরের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান করার মধ্যে ভাষার সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য নিহিত আছে, তা ব্যাহত হবার সম্ভাবনা দেখা দেবে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমরা কোন্ উচ্চারণটি গ্রহণ করবো? আমাদের শিক্ষিত লোকেরা যদি চলিত বাংলার উচ্চারণের সঙ্গে পরিচিত না থাকতেন এবং স্কুল-কলেজে এর ব্যাপক প্রয়োগ না করতেন তাহলে পূর্ব পাকিস্তানের বিশেষ কোন অঞ্চলের হয়ত বা ঢাকা অঞ্চলের উচ্চারণই ধীরে ধীরে আদর্শ উচ্চারণ হিসেবে চালু হয়ে যেতো; কিন্তু দীর্ঘ দু'শো বছরে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠা একটি চলিত উচ্চারণের ঐতিহ্য আমাদের সামনে থাকায় এবং আমরাও তার উত্তরাধিকারী হওয়ায় তা সম্ভব হচ্ছে না।

আবার আজাদী-উত্তর যুগে কলকাতা-ভিত্তিক এ উচ্চারণকে হুবহু গ্রহণ করতে আমাদের আত্মসম্মানে বাধছে বলে আমরা আমাদের উচ্চারণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলছি এবং যে যারটা চালাতে চেষ্টা করছি।

এ থেকে মুক্তির পথ আছে। এ পথ বেছে নিতে হলে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন চাই। চলিত উচ্চারণকে যাঁরা কলকাতা, শান্তিনিকেতন তথা পশ্চিমবাংলা ভিত্তিক বলে বর্জন করতে চান, আমি তাঁদের সঙ্গে একমত নই। এ উচ্চারণ পশ্চিম বাংলা ভিত্তিক হলেও প্রাক্-আজাদী যুগের বহু জিনিসের মত আমরা এর উত্তরাধিকারী। এই উচ্চারণই হবে আমাদের ভবিষ্যৎ আদর্শ উচ্চারণ গড়ে তোলার ভিত্তি। এ উচ্চারণ পশ্চিম বাংলার হলেও সুদূর ভবিষ্যতে পশ্চিম বাংলাতেও যেমন অবিকৃত থাকবে না বলা বাহুল্য, তিরিশ-চল্লিশ বছর পরে পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম বাংলার আদর্শ উচ্চারণেও স্বতন্ত্র পথ ধরে একে অন্য থেকে পৃথক হয়ে দাঁড়াবে।

পূব পাকিস্তানের ঢাকা নগরীতে দেশের বৃহত্তম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানের সন্তান-সন্ততিরা ঢাকায় আসবে লেখাপড়া তথা শিক্ষা ও সংস্কৃতির চর্চা করতে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঢাকার অন্যান্য কলেজগুলোতে (অবশ্য প্রদেশের অন্যান্য কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়েও) বর্তমানে যাঁরা শিক্ষকতা করেন তাঁদের অনেকেরই উচ্চারণ বর্তমানের চলিত উচ্চারণের ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাঁদের কাছে লেখাপড়া করে, তাঁদের উচ্চারণের সঙ্গে নিজেদের উচ্চারণের রদবদল করে নানা প্রকার গ্রহণ-বর্জনের ভেতর দিয়ে কালক্রমে এখানকর একটি আদর্শ উচ্চারণ গড়ে উঠবে।

যতদিন তা না উঠছে ততদিন যথাসম্ভব বর্তমান উচ্চারণের বিশুদ্ধতা রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় ও স্কুল-কলেজগুলোর শিক্ষকদের। তাঁরা তাঁদের ছাত্রছাত্রীদের যে উচ্চারণ শিক্ষা দেবেন তার ওপরেই ভবিষ্যতের গতিপথ নির্ধারিত হবে; কিন্তু আমরা যখন দেখি অঞ্চল বিশেষের স্কুল-কলেজগুলোতে আমাদের অধিকাংশ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী তাঁদের আঞ্চলিক ভাষাতেই পড়াচ্ছেন এবং কথাবার্তাও বলছেন তখন আমরা ব্যথিত হই। এ রকম হলে অদূর ভবিষ্যতে কেন সুদূর ভবিষ্যতেও দেশব্যাপী একটি আদর্শ উচ্চারণ গড়ে উঠবে না। এ উদ্দেশ্যে এবং যতদূর সম্ভব বর্তমানের উচ্চারণের শালীনতা ও মাধুর্য রক্ষার্থে প্রথমতঃ আমাদের শিক্ষকদের উচ্চারণ পরিশোধনের অভিযানই চালাতে হবে। এ ব্যাপারে আমাদের ট্রেনিং কলেজগুলো এবং বিশ্ববিদ্যালয় দুটোকেই বিশেষভাবে উদ্যোগী হতে হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে বর্তমানে যেসব ছাত্রছাত্রী রয়েছে তাদেরকে উচ্চারণের গুরুত্ব সম্পর্কে নানা ভাবে অবহিত করতে হবে; আর যে সব শিক্ষক এ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে কোনদিনই আসেননি, গ্রীষ্ম কি হেমন্তকালীন অবকাশে তাঁদের নিয়ে সভা-সমিতি করে কিংবা প্রয়োজন হলে 'refresher course'-এর ব্যবস্থা করে তাঁদেরকেও এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ সজাগ করে তুলতে হবে। এ ভাবে এগুলে অদূর ভবিষ্যতে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য একটি standard pronunciation বা আদর্শ উচ্চারণ না হোক অন্ততঃ received pronunciation বা সকলের গ্রহণযোগ্য একটি উচ্চারণ গড়ে তোলা সহজসাধ্য হয়ে উঠবে।

লেখক-পরিচিতি

অধ্যাপক ও ভাষাবিজ্ঞানী মুহম্মদ আবদুল হাই ১৯১৯ সালের ২৬শে নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদের রাণীনগর থানায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আবদুল গণি, মাতা ময়মুন্নেসা খাতুন। তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু হয় বর্ধনপুর জুনিয়র মাদ্রাসায়। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৪১ সালে বাংলায় বি.এ. অনার্স এবং ১৯৪২ সালে এম.এ. ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি কর্মজীবন শুরু করেন ঢাকা ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে শিক্ষকতা দিয়ে এবং পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। মুহম্মদ আবদুল হাই ১৯৫০ সালে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজে ভাষাতত্ত্বে অধ্যয়ন ও গবেষণার জন্য গেলে ভাষাতত্ত্ব, ধ্বনিতত্ত্ব ছাড়াও ইংরেজি, আরবি, সংস্কৃত, দ্রাবিড় প্রভৃতি ভাষা শিক্ষার সুযোগ লাভ করেন এবং ১৯৫২ সালে 'A Phonetic and Phonological Study of Nasal and Nasalization in Bengali' অভিসন্দর্ভ রচনা করে পুনরায় এম.এ. ডিগ্রি লাভ করেন। অধ্যাপনার পাশাপাশি তিনি নানা ধরনের গ্রন্থ রচনা করেন। এসময় প্রকাশিত হয় তাঁর রচিত 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি' (১৯৫৪), 'বিলেতে সাড়ে সাত শ'দিন' (১৯৫৮), 'তোষামোদ ও রাজনীতির ভাষা' (১৯৫৯), 'ভাষা ও সাহিত্য' (১৯৬০), 'ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব' (১৯৬৪) প্রভৃতি গ্রন্থ। শেষোক্ত গ্রন্থটি তাঁকে অমর করে রাখে। বাংল ভাষার ধ্বনির গঠন, উচ্চারণ ও ব্যবহারবিধি সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা-বিশেষণ দিয়ে রচিত তাঁর 'ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব' গ্রন্থটি মুহম্মদ আবদুল হাইকে আন্তর্জাতিক খ্যাতিও দান করে। গ্রন্থটির বর্ণনাভঙ্গি বিজ্ঞানানুগ, এর ভাষাভঙ্গি ও রচনাকৌশল বিবেচনায় এখানে নিরস তত্ত্বকথাও রসপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ফলে এ বিষয়ে অনভিজ্ঞ পাঠকও সহজে আকৃষ্ট হয়। ১৯৬৯ সালের ৩ জুন ঢাকায় তাঁর মৃত্যু হয়।

মূল-বক্তব্য

'আমাদের বাংলা উচ্চারণ' প্রবন্ধটিতে আজকের স্বাধীন বাংলাদেশবাসীর বাংলা উচ্চারণ-মান সম্পর্কে একটি অভিমত ব্যক্ত হয়েছে। লেখক মুহম্মদ আবদুল হাই বলেছেন, ভারত-ভাগের পর বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে বাংলা মান উচ্চারণ নিয়ে দ্বিধা দেখা গেছে। অনেক ১৯৪৭-এর স্বাধীনতার সুযোগে বাংলা ভাষার উচ্চারণে নানা আঞ্চলিক উচ্চারণ প্রবেশ করিয়ে জগাখিচুড়ি অবস্থার সৃষ্টি করেন। কোথায় কোথায় এমন অপমিশ্রণ ঘটছিল, তার প্রচুর দৃষ্টান্ত এই প্রবন্ধে উপস্থাপিত হয়েছে। স্বঅঞ্চলে নিজের মধ্যে এমন মিশেল ভাষায় কথা হতে পারে; কিন্তু শিক্ষাগ্রহণ, প্রদান বা আনুষ্ঠানিক ব্যবহারের জন্য সর্ববাদী স্বীকৃত ভাষারীতি থাকা জরুরি। এক্ষেত্রে বর্তমানের প্রমিত ভাষারীতিকে যারা পশ্চিমবঙ্গীয় বলে বর্জনের পক্ষপাতী, লেখক তাদের সঙ্গে একমত নন। তিনি মনে করেন, অভিন্ন ঐতিহ্য থেকে এই ভাষারীতি বাঙালি পেয়েছে, এর ওপর দাবি আমাদেরও। আর এই রীতি অনুসরণ করলে, দেশে ভিন্ন বলে কিছু কাল পরেই পশ্চিমবঙ্গের ভাষা থেকে আমাদের ভাষারীতি পৃথক হয়ে যাবে। আর এভাবেই আমাদের সর্ববাদী স্বীকৃত ভাষারীতি গড়ে উঠবে।

আমাদের আত্মপরিচয়

কবীর চৌধুরী

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলাদেশে তার মাটি, প্রকৃতি ও পারিপার্শ্ব থেকে প্রাণরস আহরণ করে একান্তভাবে দেশজ ও লোকজ ঐতিহ্যলালিত এক ধরনের ইন্টিগেটেড বা সমন্বিত বাঙালী সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিলো। সম্প্রদায় ভেদে, শ্রেণীভেদে, ধর্মভেদে, পেশাভেদে, কিছু কিছু আচার অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে উপরস্তরে বিভিন্নতা থাকলেও মৌল স্তরে ঐক্য ছিলো। ব্যাপক জনগোষ্ঠীর আবেগ অনুভূতির ক্ষেত্রে তলের দিকে বিদ্যমান ওই মৌলিক এক্যই সমাজকে তখন বেঁধে রেখেছিলো, তার সুস্থতা সুনিশ্চিত করেছিলো। বাঙালীর লোকসঙ্গীত, লোকগাথা, লোককাব্য, বাউল তত্ত্ব সাধনা ও গ্রামীণ মেলাসহ নানা লোক-উৎসবের মধ্যে আমরা তা লক্ষ্য করি। ধর্মীয় উগ্রতাসৃষ্ট ভেদবুদ্ধি তখনো প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি। চণ্ডীদাস লিখলেন, সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই। লালন শাহকে কৌতুক ভরে প্রশ্ন করতে শুনলাম পৈতা দিয়ে তো ব্রাহ্মণকে চিনলাম কিন্তু বামণীকে চিনবো কি ভাবে? কাজী নজরুল ইসলামের মধ্যে এই ঐতিহ্য ধারারই নববিকাশ দেখি আমরা।

আধুনিক কালে ইংরেজের এই উপমহাদেশে আগমন, বাংলায় তাদের প্রথমে বাণিজ্য ও পরে রাজত্ব বিস্তার, ইংরেজী শিক্ষার প্রসার, সীমিত নগরায়ণ, পাশ্চাত্য ভাবধারার অনুপ্রবেশ প্রভৃতি তার সকল দোষগুণ নিয়ে বাঙালী বুর্জোয়ার উদ্ভবের সূচনা করলো। শিক্ষিত নগরকেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত বাঙালীর চিন্তাধারা ও কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে তখন বাঙালী সংস্কৃতির একটা রূপান্তর হ'লো। কিন্তু এ-রূপান্তরে সমন্বয় আর থাকলো না। রাজনৈতিক-ঐতিহাসিক কারণে গোটা উনবিংশ শতাব্দী জুড়ে, এমনকি বিংশ শতাব্দীর প্রথমে দশকের শেষ অবধি, উপরোক্ত রূপান্তর বাঙালী মুসলমানের জীবনকে ইতিবাচকভাবে স্পর্শ করলো না। ফলে এযাবৎ কাল যে লোকজ ঐতিহ্যভিত্তিক সমন্বিত বাঙালী সংস্কৃতির একটা ধারা গড়ে উঠেছিলো তার বিকাশের পথে বাধার প্রাচীর তৈরী হতে শুরু করলো। রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক পরিবেশ বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক থেকেই মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবোধকে উদ্দীপ্ত করতে শুরু করেছিলো। বঙ্গভঙ্গ আইন ও তা রোধ করার আন্দোলন, বাঙালী মুসলমানের সর্বক্ষেত্রে পশ্চাদপদতা ও তদ্‌জনিত ক্ষোভ, সুবিধাজনক স্থানে অবস্থিত অমুসলমান নেতবর্গের প্রকৃত অবস্থা অনুধাবনে এবং সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণে ব্যর্থতা, মিঃ জিন্নাহর দ্বিজাতিতত্ত্ব প্রচার প্রভৃতি বিষয় ওই বাধার প্রাচীরকে দৃঢ় করে তোলে। আর অবশ্যই উপনিবেশবাদী বিদেশী ইংরেজ শাসকবর্গ তাদের কূটবুদ্ধিজাত 'ভাগ কর এবং শাসন কর' নীতি অনুসরণ করে এই প্রক্রিয়ায় ইন্ধন যোগায়। গভীর দুংখে নজরুল হাসির গান লিখলেন, 'বদনা গাড়ুতে পুনঃ ঠোকাঠুকি, রোল উঠিল হা হন্ত/ ঊর্ধে থাকিয়া সিঙ্গী-মাতুল হাসে ছিরকুটি দন্ত।" প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তাধারার ফলে শিক্ষিত নগরকেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত বাঙালীর চিত্তে, সাধারণভাবে, বুর্জোয়া বিকাশ রেনেসাঁসের পথ না ধরে রিভাইভালিজমের পথ ধরে অগ্রসর হলো। সপ্তদশ শতকের কতিপয় শ্রেষ্ঠ বাঙালী

কবি, শুধু মুসলমানদের মধ্যে নয়, হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে যারা শ্রেষ্ঠ, বাংলাভাষাকে নিজের ভাষা জ্ঞান করে উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম সৃষ্টি করলেন, কাহিনীর পাত্র-পাত্রী হিন্দু কি মুসলমান তা নিয়ে মাথা ঘামালেন না, নিঃসকোচে লোকাচারকে তাদের রচনায় স্থান দিলেন। কবি আব্দুল হাকিম তো যারা বাংলাদেশে বাস করে, বাংলার অন্নজলে পুষ্ট হয়ে, বাংলাকে মাতৃভাষা বিবেচনা করতে দ্বিধা করে তাদের সরাসরি বেজন্মা বলে আখ্যায়িত করলেন। সেই অবস্থান থেকে সরে এসে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে কতিপয় শিক্ষিত বাঙালী মুসলমান মাতৃভাষা নিয়ে অহেতুক বিভ্রান্তিকর প্রশ্ন তুললেন। বাঙালী মুসলমান কোন ভাষাকে আঁকড়ে ধরবে কোন ভাষাকে প্রাধান্য দেবে? বাংলাকে, নাকি আরবী, ফার্সী, অথবা উর্দুকে? ইসলামী সংস্কৃতির একটা কৃত্রিম ধোঁয়াটে আদর্শের কথা বলে তাঁরা বাংলা ভাষা ও বাঙালী সংস্কৃতির মধ্যে হিন্দু পৌত্তলিকতার নিদর্শন আবিষ্কার করলেন। মিলন ও সমন্বয়ের জায়গায় দানা বাধঁতে শুরু করলো বিরোধ ও বিচ্ছিন্নতা।

আমরা কি বাঙালী, নাকি মুসলমান, কিম্বা বাঙালী মুসলমান? এবং যদি বাঙালী মুসলমান হই, তবে কি আগে বাঙালী ও মুসলমান, নাকি আগে মুসলমান ও পরে বাঙালী? এই জাতীয় কৃত্রিম বৈপরীত্য ও বিরোধের অবতারণা করে, কৃত্রিম অগ্রাধিকারের প্রশ্ন তুলে মিথ্যা আত্মাভিমানী, প্রতিক্রিয়াশীল, সাম্প্রদায়িক শক্তিসমূহ, বাঙালী সংস্কৃতির পরিচ্ছন্ন এবং বৈচিত্র্যের মধ্যেও অখণ্ড এযাবৎকাল প্রবহমান স্রোতধারাকে আবিল ও খণ্ডিত করে তুললো। অবশ্য বাংলার গ্রামজীবনের গভীরে যাবতীয় বিচ্ছিন্নতামুখী নাগরিক তৎপরতাকে উপেক্ষা করে তখনো এক ধরনের ঐক্য-স্রোত প্রবাহিত হয়ে চলেছিলো। সমন্বিত বাঙালী সংস্কৃতির সেই রূপ আমরা ঘুরেফিরে বারবার প্রত্যক্ষ করি লালন-সহ বহু বাউল সাধকের গানে। তাছাড়া কোনো কোনো নগরকেন্দ্রিক ব্যক্তিত্বও এক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেন। শিল্প-সাহিত্যের ভুবনে এ প্রসঙ্গে সহজেই কাজী নজরুল ইসলামের নাম মনে পড়ে। তাঁর অজস্র গানে ও কবিতায় আচার-সর্বস্ব আনুষ্ঠানিকতাপূর্ণ বিভেদসৃষ্টিকারী ধর্মের প্রসঙ্গ অনায়াসে উপেক্ষিত ও অতিক্রান্ত হয়েছে। তার জায়গায় সেখানে ফুটে উঠেছে একটা সুস্থ মুসমন্বিত নির্ভেজাল বাঙালী সংস্কৃতির উজ্জ্বল ছবি। ঢাকাকেন্দ্রিক বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের কথাও এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ হলেও এখানে আরেকটি ধারার উল্লেখও অসঙ্গত হবে না। ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের ঢেউ একসময় বাংলাদেশেও এসে পৌছায় এবং সেই বিপ্লবের তরঙ্গাভিঘাতে, বিশেষভাবে ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে, বাঙালীর সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ সম্বলিত একটা নতুন ধারাও যুক্ত হয়েছিলো।

কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার উপর ভিত্তি করে রচিত দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রসার, তৎকালীন সর্বভারতীয় নেতৃত্বের অদূরদর্শিতা ও ঔদার্যের অভাবজনিত ব্যর্থতা, বিপুল নিরক্ষর কুসংস্কারাচ্ছন্ন জনগোষ্ঠীর সাময়িক অন্ধ ভাবাবেগ, সুবিধাবাদী শ্রেণীর ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধি এবং ইংরেজের কূট রাজনীতির ফলে শেষ পর্যন্ত ১৯৪৭ সালে এই উপমহাদেশ বিভক্ত হল। বাংলাদেশও দ্বিখণ্ডিত হয়ে তার এক অংশ পরিণত হল ভারতের অঙ্গরাজ্য পশ্চিম বাংলায়, অন্য অংশ পাকিস্তানের পূর্ব শাখা পূর্ব বাংলায়, তথা পূর্ব পাকিস্তানে। রাষ্ট্রীয় ও নাগরিকত্বের পরিচয়ে বাঙালী বিভক্ত হয়ে গেল, কিন্তু সাংস্কৃতিক বিভাজন এত সহজ সূত্রে ধরে ঘটে না, তার একটা নিজস্ব লজিক আছে। কিন্তু পাকিস্তানের নয়া-উপনিবেশবাদী, শাসকবর্গ সে সত্য মানতে চাননি। তারা

শোষণের স্বার্থে পশ্চিম বাংলার বাঙালী এবং পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালীর সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে একটা দুর্ভেদ্য স্থায়ী পার্থক্য গড়ে তুলতে চান। বাংলা সাহিত্যের হাজার বছরের ঐতিহ্যকে তাঁরা নানাভাবে মুছে ফেলবার চেষ্টা করেন। হিন্দু দেবদেবীদের কথা বলা হয়েছে, হিন্দু সমাজের চিত্র পরিবেশিত হয়েছে, এই জাতীয় নানা হাস্যকর কুযুক্তির অবতারণা করে তারা বহু শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্মের অবমূল্যায়নে ব্রতী হন। এমন কথাও বলা হলে যে রবীন্দ্রনাথকে খুব বড় করে দেখা ঠিক হবে না, বস্তুতপক্ষে তিনি আমাদের কবি নন, তাকে প্রয়োজনবোধে বর্জন করতে হবে। রবীন্দ্রনাথের প্রতিপক্ষ হিসাবে দাঁড় করানোর চেষ্টা করা হল নজরুলকে। মহান, মানবতাবাদী, বিদ্রোহী, সমাজতান্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ, জাত-অসাম্প্রদায়িক, বাঙালীর সুস্থ জীবনবাদী সমন্বিত সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠতম ধারক নজরুলকে তুলে ধরা হল একান্ত খণ্ডিত রূপে, শুধু মুসলমান কবি-রূপে। পূর্ব পাকিস্তানের কিছু বাঙালী সংস্কৃতিসেবীও হয় ভ্রান্তি, নয়তো অস্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী, কিম্বা নেহাৎই আত্মস্বার্থবুদ্ধির কারণে উক্তি প্রক্রিয়ার সঙ্গে নিজেদের সম্পৃক্ত করেন। সেদিন সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত হাওয়ায় সম্বিত হারিয়ে তাঁরা নজরুলের কবিতা ও গানের সর্বজনপরিচিত পঙ্‌ক্তিমালা পর্যন্ত পরিবর্তন করতে এগিয়ে আসেন। এর ফলে কবির বিখ্যাত গান 'চল্ চল্ চল'-এর 'নব নবীনের গাহিয়া গান/সজীব করিব মহাশ্মশান' হল 'নব নবীনের গাহিয়া গান/সজীব কবির গোরস্থান'। তাঁর অববদ্য শিশুতোষ কবিতা 'ভোর হল দোর খোল'-র 'জয় গানে ভগবানে তুষি বর মাগো রে' হল 'জয় গানে রহমানে তুষি বর মাগো রে'। এসব উদ্যোগ যে কিরকম নির্বোধ, অবিবেচনাপ্রসূত ও হঠকারী ছিলো তার দৃষ্টান্ত স্বরূপ আরো দু'একটি তথ্যের উল্লেখ করছি। ১৯৪৯ সালে গঠিত পূর্ববঙ্গ ভাষা কমিটির সংস্কার সাবকমিটির পরামর্শ অনুযায়ী 'আমি তোমায় জন্মজন্মান্তরেও ভুলিব না' বাক্যটি কোনো মুসলমানের পক্ষে বলা সম্ভব নয়, কারণ কোনো মুসলমান জন্মান্তারবাদে বিশ্বাস করে না। মুসলমান প্রেমিক-প্রেমিকা বড় জোর এই বলতে পারে যে 'আমি তোমায় কেয়ামতের দিন পর্যন্ত ভুলিব না।' সেই সময় আমাদের জনৈক কবি পরামর্শ দেন যে আমাদের উচিত হবে দাতা কর্ণের বদলে দাতা হাতেম লেখা, বিদ্যাদিগ্‌গজের বদলে এলেমের জাহাজ, অতি সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্টের বদলে অনেক পীরে মোজেজা নষ্ট, বাঘের মাসীর বদলে বাঘের খালা ইত্যাদি বলা। একজন শক্তিমান কথা সাহিত্যিক ও ব্যঙ্গরচয়িতা পূর্বপাকিস্তানী বাংলার আঞ্চলিকীকরণের স্বপক্ষে জোরালো মত প্রকাশ করেন। তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী 'অবিভক্ত বাংলার সাহিত্যকে গণসাহিত্য করিবার প্রয়োজনের তাগিদে যে কারণে কলিকাতার কথ্যভাষাকে সাহিত্যের সম্মান দিতে হইয়াছিল, ঠিক সেই প্রয়োজনের তাগিদে আমাদের রাজধানী ঢাকার কথ্যভাষাকেও আমাদের সাহিত্যের ভাষায় মর্যাদা দিতে হইবে। সাহিত্যে ব্যবহারোপযোগী কোন নিজস্ব ভাষা ঢাকার নাই; তাতে ভয় পাইবার কিছু নাই। গোড়াতে কলিকাতারও ছিলো না... পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন জিলার অঞ্চলিক ডায়ালেক্টের মধ্যে বিপুল পার্থক্য থাকায় শান্তিপুরী ডায়ালেক্ট যেমন তাদের ভাষিক একতার নিউক্লিয়াস হইয়াছিল, আমাদের বিক্রমপুরী ডায়ালেক্ট তেমনি ঢাকাইয়া বাংলার নিউক্লিয়াস হইতে পারিবে।" পাকিস্তানী শাসনের এক পর্যায়ে প্রেসিডেন্ট আইউব খান আরো সাংঘাতিক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের কথা ভেবেছিলেন। বাংলা ও উর্দু মিলেজুলে একটা নতুন পাকিস্তানী ভাষা তৈরী করার চেষ্টার কথা বলেছিলেন তিনি। তাছাড়াও পাকিস্তানী স্বৈরাচারী দুঃশাসনের আমলে বাংলা বর্ণমালা, বানান, ব্যাকরণ প্রভৃতির সংস্কার, বাংলাভাষা সরলীকরণ, রোমান হরফে বাংলা লেখা প্রবর্তন প্রভৃতি উদ্যোগের মধ্য দিয়ে বাংলাভাষাকে,

এবং সেই সূত্রে বাংলা সাহিত্যকে, দুর্বল ও বিকৃত করে বাঙালী সংস্কৃতিকে পঙ্গু ও খণ্ডিত করার অপপ্রয়াস চালানো হয়েছিলো। কিন্তু ওইসব প্রয়াস সফল হয়নি। প্রতিক্রিয়া বিরোধী শক্তিসমূহ প্রথম থেকেই এসব উদ্যোগের তীব্র বিরোধিতা করেছেন। এ প্রসঙ্গে বাংলাভাষা আন্দোলনের কথা বিশেষভাবে স্মর্তব্য। ১৯৫২ সালের গৌরবদীপ্ত ভাষা আন্দোলনের কথা সর্বজনবিদিত।

কিন্তু আমরা কেউ কেউ সম্ভবতঃ মনে রাখি না যে ১৯৪৭-এর শেষভাগে ও ১৯৪৮-এর গোড়ার দিকে পূর্বে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার অব্যহিত পরেই যখন বাংলাভাষা তথা বাঙালী সংস্কৃতির উপর আঘাত হানার প্রথম উদ্যোগ গৃহীত হয় তখনই তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়। এ প্রসঙ্গে ১৯৪৮ সালের শুরুতে কার্জন হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে মিঃ জিন্নাহ কর্তৃক উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার সদম্ভ উক্তি ও তার বিরুদ্ধে কতিপয় শ্রোতার তৎক্ষণিক প্রতিবাদ জ্ঞাপন, তারও কিছু দিন আগে মন্ত্রী হাবীবুল্লাহ বাহারের সভাপতিত্বে ঢাকা জিলাবোর্ড হলে রাষ্ট্রভাষা নিয়ে অনুষ্ঠিত একটি সংগ্রাম প্রতিবাদী সভা, এবং ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ বাংলাভাষা আন্দোলনে গণ-হরতাল প্রভৃতির কথা অবশ্য স্মরণীয়। এই সব আন্দোলন চূড়ান্ত রূপ নেয় ১৯৫২-র ২১শে ফেব্রুয়ারী। বাঙালীর আত্মপরিচয় সংহতিকরণে, তার সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও বিকাশে এর ভূমিকা অপরিসীম। অবশ্য ১৯৫২-এর পরেও বাঙালীর ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে নয়া ঔপনিবেশিক শাসক শোষকদের চক্রান্ত থেমে যায়নি। কিন্তু আমাদের ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতিকে তার গৌরবোজ্জ্বল এতিহ্যে সমৃদ্ধ হয়ে বিকশিত হবার বিরুদ্ধে সকল চক্রান্ত প্রতিরোধ করে দেশের সাধারণ মানুষ ও ছাত্র-শিক্ষক-বুদ্ধিজীবীদের বলিষ্ঠ প্রতিবাদী কার্যাবলী। এরাই বাঙালী সংস্কৃতির উপর চরম বিধ্বংসী কুঠারাঘাত হানতে দেয়নি। এদের জন্যই বাংলা বর্ণমালার পরিবর্তে আরবী বা রোমান হরফ চালু হয়নি, বাতিল হবার পরিবর্তে স্বৈরাচারী পাকিস্তানী শাসনামলেই সারা বাংলাদেশে পরম উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে রবীন্দ্রনাথের জন্ম শতবার্ষিকী পালিত হয়, বাংলা সাহিত্যের হাজার বছরের ঐতিহ্য শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকৃতি পায়, এবং সামগ্রিকভাবে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মান্ধতার পরিবর্তে একটা উদার, ধর্মনিরপেক্ষ, জীবনধর্মী মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী বিকাশ লাভ করে। ধর্মান্ধ ও সাম্প্রদায়িক শক্তিসমূহ সেদিন মেয়েদের টিপ পরা, উৎসব অনুষ্ঠানে আলপনা আঁকা, বাংলা নববর্ষ পালন করা, ঋতুভিত্তিক বসন্তউৎসব কি বর্ষাবরণের আয়োজন করা সহ বাঙালী সংস্কৃতির বিভিন্ন সহজ স্বাভাবিক প্রকাশের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছিলো। শোষণবাদী শক্তি নিজেদের শোষণকে অব্যাহত রাখার লক্ষ্যেই ধর্মের অপব্যাখ্যা করে সংস্কৃতির প্রশ্নে সুপরিকল্পিতভাবে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপপ্রয়াস চালিয়েছিলো সেদিন কিন্তু সে প্রয়াস সফল হয়নি। বাঙালী সংস্কৃতির দীপ্র চেতনাকে আশ্রয় করে বাঙালী জাতীয়তাবাদী চেতনা ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক চিন্তাধারা বিকশিত হল এবং তারপর ধাপে ধাপে বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলনে, স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে ওই প্রগতিশীল ধারাসমূহ আরো উজ্জ্বল ও বলিষ্ঠ হয়ে উঠল। "বীর বাঙালী অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর", "তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা-মেঘনা-যমুনা", "জয় বাংলা" প্রভৃতি শ্লোগানের মধ্য দিয়ে শুধু বাঙালীর জাতীয়তাবাদী চেতনাই নয়, বাঙালীর সংস্কৃতির একটি সংগ্রামী চারিত্র্যও তার যৌথ অবচেতনে দানা বেঁধে উঠেছিলো। স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে এরই প্রতীকী প্রতিফলন আমরা লক্ষ্য করি কতিপয় ক্ষেত্রে। আমাদের জাতীয় ফুল

হল শাপলা, জাতীয় পাখি দোয়েল, জাতীয় সংগীত রবীন্দ্রনাথের গান "আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি", টেলিভিশন অনুষ্ঠানের প্রারম্ভিক সুরমূর্চ্ছনা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বিখ্যাত দেশাত্মবোধক গান "ধন ধান্য পুষ্পভরা"-র সুর, সামরিক কুচ-কাওয়াজের গান নজরুলের "চল চল চল।"

লেখক-পরিচিতি

কবীর চৌধুরী হলেন অধ্যাপক ও শিক্ষাবিদ। ১৯২৩ সালে ৯ই ফেব্রুয়ারি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় তাঁর জন্ম। তবে তাঁর পৈতৃক নিবাস নোয়াখালি জেলায়। তাঁর পিতা ছিলেন খান বাহাদুর আব্দুল হালিম চৌধুরী এবং মাতা উম্মে কবীর আফিয়া চৌধুরী। কবীর চৌধুরীর প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন হয় স্বগৃহে পিতার তত্ত্বাবধানে। তবে ১৯৩৮ সালে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে বি.এ. (সম্মান) ও এম.এ. ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৬৫ সালে সাদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিষয়ে তিনি আবার এম.এ. ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৪৪ সালে পাবনা এডওয়ার্ড কলেজে অধ্যাপনার মধ্যে দিয়ে অধ্যাপনায় আগমন করেন, পরে সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব (১৯৪৭) হয়েছিলেন। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক পদে যোগ দেবেন বলে শিক্ষাসচিব পদে ইস্তফা দেন। কবীর চৌধুরীকে ১৯৯৮ সালে 'জাতীয় অধ্যাপকে'র মর্যাদায় ভূষিত করা হয়। তাঁর সাহিত্যকর্ম বহুমুখী, বস্তুনিষ্ঠ ও অসাধারণ। কবীর চৌধুরী রচিত, সম্পাদিত ও অনূদিত গ্রন্থের সংখ্যা দুই শতের বেশি। তিনি ইংরেজি ও বাংলা উভয় ভাষায় সুদক্ষ ছিলেন এবং গ্রন্থরচনা ও অনুবাদ করেছেন। আর্নেস্ট হেমিংওয়ে, মপার্শাঁ, চেখভ, স্ট্রিনবার্গ, ইবসেন, স্যামুয়েল বেকেট, নাগিব মাহফুজ, জেএম কোয়েতজি, বেওউলফ ও জোসে সারামাগো প্রমুখ প্রখ্যাত লেখকদের শ্রেষ্ঠ রচনাবলির বাংলা অনুবাদ করে তিনি বাঙালির পাঠক্ষেত্র তৈরিতে সাহায্য করেন। একদিকে বাঙালি পাঠকদের বিশ্বসাহিত্যর সঙ্গে পরিচিত করে তোলা এবং অন্যদিকে বাংলা সাহিত্যকে ইংরেজি অনুবাদের মাধ্যমে বিদেশি পাঠকদের সামনে তুলে ধরা ছিল কবীর চৌধুরীর অনুবাদকর্মের অনন্যসাধারণ সাফল্য। তাঁর রচিত কয়েকটি গ্রন্থের নাম উল্লেখযোগ্য: গবেষণা-প্রবন্ধ: 'ইউরোপের দশ নাট্যকার' (১৯৮৫), 'শেক্সপীয়র ও তাঁর মানুষেরা' (১৯৮৫), 'শেক্সপীয়র ও গ্লোব থিয়েটার' (১৯৮৭), 'অভিব্যক্তিবাদী নাটক' (১৯৮৭), 'এ্যাবসার্ড নাটক' (১৯৮৫), 'ফরাসী নাটকের কথা' (১৯৯০),'আধুনিক মার্কিন সাহিত্য' (১৯৮০), 'প্রাচীন ইংরেজী কাব্যসাহিত্য' (১৯৮০) 'আমেরিকার সমাজ ও সাহিত্য' (১৯৬৮); বাংলা-অনুবাদ: 'শেখভের গল্প' (১৯৬৯) 'অল দি কিংস মেন' (১৯২০), 'দি গার্ল উইথ এ পার্ল ইয়ার রিং' (২০০৭), নাটকের অনুবাদ ও রূপান্তর: 'আহবান' (১৯৫৬), 'শত্রু' (১৯৬২), 'হেক্টর' (১৯৬৯), 'ছায়া বাসনা' (১৯৬৬) 'অমা রজনীর পথে' (১৯৬৬), 'লিসিসস্ট্রাটা' (১৯৮৪); কাব্যনুবাদ: 'আধুনিক বুলগেরীয় কবিতা' (১৯৮০) 'কাহলিল জিবরানের কবিতা' (১৯৯২) ইত্যাদি। কবীর চৌধুরী আজীবন ছিলেন প্রগতিশীল মতবাদে বিশ্বাসী এবং সেক্যুলার গণতান্ত্রিক ধারার প্রবক্তা। বাঙালির আত্মপরিচয়ের সংকটকালে তিনি ইতিহাসের আলোয় এর সমাধানসূত্র প্রদানের চেষ্টা করেন। ২০১১ সালের ১৩ই ডিসেম্বর ঢাকায় এই মনীষীর মৃত্যু হয়।

মূল-বক্তব্য

কবীর চৌধুরী তাঁর প্রবন্ধ 'আমাদের আত্মপরিচয়'-এ লিখেছেন, একদা বাঙালীর আত্মপরিচয়ের সংকট ছিল না। কবিভাষ্যের সেই 'সবার ওপরে মানুষ সত্য' নীতি তখন মানা হতো। ইংরেজ আগমনের ফলে আধুনিককালে নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে আন্তঃবিরোধের সৃষ্টি হয়। হিন্দু-মুসলিমের বিভেদটি তখন প্রকটতর হতে থাকে। মুসলিম সম্প্রদায়ও ধর্মীয় পরিচয়টিকেই বড় করে একদা সরে আসে জাতীয় ভাষা ও সংস্কৃতির অধিকার থেকে। বাঙালি মুসলিমরা স্বভাষা ও সংস্কৃতিতে কথিত পরসংস্কৃতির প্রাবল্য আছে মনে করে নিজের মাতৃভাষা ও সংস্কৃতিকে নিজেরাই বর্জন করে। ১৯৪৭ সালের পর পাকিস্তানি শাসকবর্গ এই মানসিকতাকে আরো উস্কে দেয়। তাই রবীন্দ্রনাথও বাঙালি মুসলিমের প্রতিপক্ষ বলে প্রচার পায়। শুধু তাই নয়, নজরুলের রচনাও পাকিস্তান আমলে ইসলামি ভাবাপন্ন করার অপচেষ্টা হয়েছে। কিন্তু ১৯৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে অংশ নিয়ে বাঙালি, বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক এবং তা তারা প্রত্যাখ্যান করে। তাই শাকসদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষ ১৯৬১ সালে তারা সম্মিলিতভাবে পালন করে। এরপর নববর্ষ, বসন্ত উৎসব ইত্যাদি জাতধর্মবর্ণ নির্বিশেষে তারা পালন করে এবং এই ঐক্যবদ্ধ পথেই আসে বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন দেশ। কোনো ধরনের বিভেদ নয়, সাংস্কৃতিক সম্মিলিত ও যূথবদ্ধতাই আমাদের আত্মপরিচয়।

নাটক

কবর

মুনীর চৌধুরী

চরিত্র

নেতা

হাফিজ

ফকির

গার্ড

ছায়ামূর্তি কয়েকটি

মঞ্চে কোনরূপ উজ্জ্বল আলো ব্যবহৃত হইবে না। হারিকেন, প্রদীপ ও দিয়াশলাইয়ের কারসাজিতে নাটকের প্রয়োজনীয় ভয়াবহ, রহস্যময়, অশরীরী পরিবেশকে সৃষ্টি করিতে হইবে।

দৃশ্য: গোরস্তান। সময়: শেষ রাত্রি।

তিন চার ফুট উঁচু একটি পুরু কালো কাপড়ের মজবুত পর্দার দ্বারা মঞ্চটি দুই অংশে বিভক্ত, লম্বালম্বিভাবে নয়, পাশাপাশি। সামনের অংশে কী ঘটিতেছে সবই দেখা যাইবে; কিন্তু বিভক্ত মঞ্চের পশ্চাৎ অংশে কেহ দাঁড়াইলে দর্শকের চোখে পড়িবে না।

পর্দা উঠিলে দেখা যাইবে খালি মঞ্চের ডান কোণে একটি লণ্ঠন টিম টিম করিয়া জ্বলিতেছে। সামনে একটি মোটা পোর্ট-ফোলিও ব্যাগ, মুখ খোলা। পাশে একটি ছোট গ্লাস, খালি। একটি রুমাল মাটিতে পাতা রহিয়াছে। মনে হয়, এইমাত্র তাহার উপর কেহ বসিয়াছিল। সেই লোকটিই মঞ্চের ভিতরে আবার ঢুকিল। হৃষ্টপুষ্ট বড়-সড় শরীর। চালচলন গণ্যমান্য নেতার মতো। ভারিক্কী উপযুক্ত সাজগোজ। ভিতরে ঢুকিয়াই আবার ডাকিল–)

নেতা : গার্ড! গার্ড!

(নীল কোর্তা পাজামা পরা গার্ডের প্রবেশ। পায়ে খয়েরী ক্যাম্বিসের জুতা। পাজামার প্রান্তদেশ মোজার মধ্যে গোঁজা। হাবভাবে প্রভুভক্তির ঝলক; কিন্তু আপাতত একটু হতবুদ্ধি ও ভয়ার্ত ভাব! হাতে নিভন্ত লণ্ঠন। ছুটিয়া প্রবেশ)

গার্ড : জী হুজুর! (দ্রুত নি:শ্বাস)

নেতা : কী রকম গার্ড দিচ্ছ? তোমার পাহারা দেবার এই নাকি নমুনা? ছিলে কোথায় এতক্ষণ? কতক্ষণ ধরে ডাক্‌ছি কোনো সাড়া নেই।

গার্ড : পরথম পরথম ঠাওর করতে পারি নাই হুজুর। এমন ঠাণ্ডা আর আন্ধার হুজুর যে, কানের মধ্যে খামুখাই কেবল ঝাঁ ঝাঁ করে।

নেতা : তোমার পোষ্টিং কোথায় ছিল?

গার্ড : ঐ পশ্চিম কোণে। ঐ কিনারের শেষ লাল বান্ধানো কবরের পাড়।

নেতা : ওখান থেকে এখানে আসতেই একেবারে হাঁপিয়ে পড়েছ? বাহাদুর গার্ড দেখছি। বাতি নিভিয়ে রেখেছ কেন?

গার্ড : (চমকাইয়া হাতের লণ্ঠন দেখে) ওহ। এ্যা পইড়া গ্যাছলাম। তাড়াতাড়ি কইরা আইতে গিয়া পইড়া গ্যাছলাম! গর্তের মধ্যে।

নেতা : গর্তে?

গার্ড : কবর। পুরান কবর হইব! একদম ঠোসা আছিল। না বুইঝা পা দিতেই ভস্ একদমকইরা ভিতরে ঢুইকা গেছি।

নেতা : Idiot! চোখ মেলে পথ চলো না? খেলার মাঠ পেয়েছ নাকি? এটা গোরস্তান। সাবধানে পা ফেলতে পার না? যাও। ডিউটিতে যাও।

(অন্যদিক হইতে নিঃশব্দে প্যান্ট-কোর্ট-মাফলার চাদর জড়ানো কিম্ভূতকিমাকার এক ব্যক্তির প্রবেশ। নেতা তাহাকে লক্ষ করে নাই।)

গার্ড : জী হুজুর।

(স্যালুট)

নেতা : যাওয়ার পথে আবার আরেকটার মধ্যে পড়ো না। কাতার দেখে আল দিয়ে চলবে। যাও। কোনো কাজ নেই। এমনি ডেকেছিলাম! বাতিটা জালিয়ে দিও।

গার্ড : জি হুজুর।

(স্যালুট। প্রস্থান)

ব্যক্তি : (নেতার পেছন হইতে) তখই বলেছিলাম স্যার এসব আজে বাজে লোক–

নেতা : (চমকাইয়া) কে? তুমি কে?

ব্যক্তি : আমি স্যার, ইন্সপেক্টর হাফিজ।

নেতা : ওহ্! আপনি! এমন করে নাকে-মুখে কাপড় জড়িয়েছেন যে, অন্ধকারে চমকে উঠেছিলাম। ভবিষ্যতে এ-রকম আর করবেন না। না, ভয় পাইনি। গত চার-পাঁচ বছরের মধ্যে ভয় কখনই মনে ঢুকতে পারেনি। তবু ডাক্তার বলেছে আমার নাকি হার্ট উইক। সাবধানে থাকতে বলেছে। কী বলছিলেন বলুন–

(বসিয়া গ্লাসটা হাতে লইবে এবং অন্যমনস্কভাবে পোর্ট-ফোলিও ব্যাগটার মুখ খুলিবে। ইন্সপেক্টর হাফিজ খুব স্বাভাবিকভাবে কথা বলিতে চেষ্টা করিবে। কিন্তু নজর পুরাপুরি নেতার হাতের দিকে।)

হাফিজ : এই বলছিলাম, এ সব হাবা-গোবা লোক সঙ্গে না আনলেই পারতেন। কাজ বানাবার চেয়ে পণ্ড করাতেই বেটারা বেশী পটু!

নেতা : তা হোক। ওরা আমার বিশ্বাসী লোক। আপনার সারা অফিস ঢুড়লেও অমন লোক জুটত না।

হাফিজ : এটা স্যার ঠিকই বলেছেন। সব একেবারে হারামীর বাচ্চা! বেতনটাকে পাওয়া দাবী হিসেবে আদায় করতে চায়, নিমক বলে মানে না। এ জন্যেই তো আজকাল কোনো অফিসেই ফেইথ-ডিসিপ্লিন এগুলো খুঁজে পাবেন না স্যার!

নেতা : হুম্ (ব্যাগটা আবার দেখেন। চারিদিকে কী যেন খুঁজিতেছেন।)

হাফিজ : তবু কিছু কাজ আছে স্যার, যা বিবির সামনেও বেপর্দা করতে নেই। তা-ছাড়া শহরে কারফিউ লাগানো থাকতে এখানে গার্ডের কোনো দরকার ছিল না। কটাই বা লাশ আর। গোর-ঘুঁড়িগুলোকে নিয়ে আমি একলাই সব সাফসুফ করে রাখতাম। তার উপর শীতের মধ্যে আপনি কষ্ট করে–

নেতা : কিছু কাজ আছে যা, অন্যের উপর চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিত হওয়া যায় না, তা সে যতই পটু হোক না কেন! (দাঁড়াইয়া পড়িয়া খুঁজিতে থাকে।)

হাফিজ : কিছু খুঁজছেন স্যার?

নেতা : হ্যাঁ। একটা বোতল, ওই গ্লাসটার পাশে ছিল। ভূত-জিনে আমি বিশ্বাস করলেও, তারা কেউ এসে একবারে বোতল সমেত আমার হুইস্কি শেষ করে যাবে–মনে হয় না। একটু আশে-পাশে খুঁজে দেখুন ত, আমিই ভুলে কোথাও ফেলে গেছি নাকি!

হাফিজ : ব্যাগের ভিতরে পুরে রাখেন নি তো?

নেতা : না। ওগুলো ভরা বোতল। একটা কিছু খালি হয়েছিল।

হাফিজ : ওহ্! তাই তো! এ-তো বড় সাংঘাতিক কথা! না না। ভালো করে খুঁজে দেখা দরকার। বোতলটা কী রকম স্যার?

নেতা : না খেয়ে থাকলে বোঝানো যাবে না।

হাফিজ : না স্যার, মানে স্যার আমি, বোতলটার শেপ্–গড়নের কথা বলছিলাম।

নেতা : ওহ্ খুঁজে দেখুন। আমি নতুন একটা খুলছি, আপনি ওটার খোঁজ করুন।

হাফিজ : (দর্শকের দিকে পিছন দিয়া, মঞ্চের অন্য কোণে উপুড় হইয়া কী খোঁজে। তারপর মাটিতে হাত ঠেকাইয়াই চীৎকার করিয়া উঠে।) পেয়েছি! পেয়েছি! স্যার! এই যে! এইটে না স্যার?

(একটি খালি মদের বোতল খুলিয়া দেখায়।)

নেতা : অত জোরে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠবেন না। গত চার-পাঁচ বছরের মধ্যে কোনোদিন ভয় পাই নি, এটা ঠিক। তাহলেও এটা গোরস্তান। খেলার মাঠ নয়। হঠাৎ চেঁচালে বুকে লাগে। আপনাকেও বলেছি একবার। দেখি। হ্যাঁ। বোতল এটাই।

হাফিজ : কিন্তু, মানে, একদম খালি যে স্যার!

নেতা : তাতে ক্ষতি নেই। যে খেয়েছে সে যে বোতলশুদ্ধা সাবাড় করতে সক্ষম নয়, বর্তমানে সেটাই আমাদের জন্য–এরকম জায়গায় সুখের কথা। অন্ততঃ ভয়ের কথা নয়।

হাফিজ : ভয়? কী যে বলেন স্যার! মানে আমি ভেবেছিলাম হয়তো এমনিতেই কারো পায়ের ধাক্কা লেগেই ছিটকে পড়ে গিয়ে থাকবে। সব হয়তো মাটিতে গড়িয়ে পড়ে বরবাদ হয়ে গেছে। নিশ্চয়ই ওই গার্ড ব্যাটার কাণ্ড। কবরের গর্ত থেকে উঠে এসে সোজা আপনার বোতলের ওপরই হয়ত আবার হোঁচট খেয়েছে। এমন দামী জিনিসটা নষ্ট করে দিল স্যার!

নেতা : আপনাকে প্রথম ভেবেছিলাম নেহায়েত সরকারী কর্মচারী। এত দরদী লোক বুঝিনি।

হাফিজ : সব মাটিতেই পড়েছে স্যার। হাত দিয়ে দেখলাম। জায়গাটা ভিজে একেবারে কাদা কাদা হয়ে গেছে।

নেতা : আপনার এ চাকরী নেয়া সার্থক হয়েছে। একবার একটু বসে আরাম করুন। ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডা। আপনার পা-সুদ্ধ কাঁপছে।

হাফিজ : অ্যাঁ! পা? টলছে–মানে, কাঁপছে? ওহ! হ্যাঁ, তাইতো ইস্ কী বেজায় শীত। একটু বসি তাহলে স্যার, এ্যা?

(নেতা তখন হোৎকা পোর্ট-ফোলিও ব্যাগ হইতে নতুন বোতল খুলিয়া ক্রমাগত ঢালিতেছেন।)

নেতা : ওদিককার কাজ কতদূর এগুলো? আর কতক্ষণ দেরী হবে?

হাফিজ : প্রায় হয়ে এল বলে। এতক্ষণে সব চুকে-দু-একটা যেত। গোলমাল কাজে বাধা না পড়লে–কখন সব শেষ করে ফেলতাম!–

নেতা : গোলমাল! এখানেও গোলমাল? গোরস্তানের মুর্দারাও মিছিল করতে শিখেছে নাকি?

হাফিজ : কী যে বলেন স্যার! ঐ গোর-খুঁড়েগুলো দু'-একটা আপত্তি তুলেছিল, সেটা মেটাতে একটু দেরি হয়ে গেল।

নেতা : আপত্তি? টাকা-পয়সা নিয়ে আপনি কোনো গোলমাল করেননি ত? আপনাকেও বলেছি যে, টাকার জন্য চিন্তা করবেন না। যা দরকার তার চেয়েও বেশী ছাড়িয়ে যান। সরকারের অনুমোদন আমি জোগাড় করে দেব। টাকা ঢালতে আপনার কষ্ট হয় কেন? কমতি পড়লে আপনি আমার কাছে চেয়ে নিতেন।

হাফিজ : সে কি স্যার আমি বুঝিনি। সরকারের কাজে সরকারী টাকা খরচ করতে পেছ-পা হব কেন। তবে ওই ছোটলোকগুলোর আবার অদ্ভুত সব ধর্মীয় কুসংস্কার রয়েছে কিনা–তাইতেই ত যত ফ্যাঁকড়া বাধে। মজুরী তো ষোলো আনা আদায় করেই,

তার ওপর ধর্মের নাম করে সাত রকম ফষ্টি-নষ্টি! কুসংস্কারই দেশটাকে খেল স্যার!

নেতা : আমার বক্তৃতা আমাকে শোনাবেন না। আসলে কী ঘটেছে বলুন।

হাফিজ : হাসপাতাল থেকে লাশগুলো তাড়াহুড়ো করে টেনে হেঁচড়ে গাড়ীতে তুলতে হয়েছে। তার ওপর এতখানি পথ ট্রাকে আনা, ঝাঁকুনি কিছু কম খায় নি। আর ডাক্তারগুলোও যেমন পশু, মড়াগুলোকে কেটে-কুটে একেবারে নাশ করে রেখেছিল।

নেতা : এসব কাজে নার্ভাস হলে এত বড় প্রতিষ্ঠানের নেতা হতে পারতাম না। তবু আপনাকে বলেছি আমার হার্ট একটু উইক। বেশী স্ট্রেইন সহ্য হয় না। বাজে কথা না ঘেঁটে আসল কথাটা বলুন।

হাফিজ : যা হবার তাই হয়েছে। টানা-হেঁচড়ায় আর ট্রাকের ঝাঁকুনিতে গাড়ীর মধ্যেই লাশগুলো একেবারে তালগোল পাকিয়ে গিয়েছিল। কাটা টুকরোগুলো এলোমেলো হয়ে যাওয়ায় এখন আর বোঝবার উপায় নেই, কোনটার সঙ্গে কোনটা যাবে।

নেতা : তাতে কী ঘটেছে?

(নতুন বোতল খুলিবে)

হাফিজ : আরেকটা খাচ্ছেন স্যার? মানে, তাই দেখে আমি গোর-খুঁড়েগুলোকে বল্লাম আলাদা করে অতগুলো কবর বানিয়ে কী দরকার। একটা বড়-মতোন গর্ত করে সবগুলো তার মধ্যে ঠেসেঠুসে পুরে মাটি চাপা দিয়ে দিলেই হয়।

নেতা : Resourceful officer! আপনার নামটা মনে রাখতে হবে! সকাল বেলাই একবার পার্টি হাউসে আসবেন, রিকমেণ্ডেশন লিখে দেব।

হাফিজ : মেহেরবানি স্যার! পাকিস্তান হবার পর আমরা পেটি-অফিসাররাই কেবল কিছু পেলাম না। বৃটিশ আমলেও সমাজে মিশতে পারিনি। পাকিস্তানের জন্য এত ফাইট করে, আমাদের এখনও সেই দশা! যদি আপনারাও আমাদের দিকে ফিরে না তাকান আমরা বাঁচব কি করে? আমাদের ত কোনো রাজনীতি নেই স্যার! সরকারই মা-বাপ! যখন যে দল হুকুম ও চালায় তার হুকুমই তামিল করি।

নেতা : এর মধ্যে গোলামালটা কীসের? আপত্তি উঠল কোথায়?

হাফিজ : এ্যা? ওহ্। ইয়ে–মানে, ওই গোড়খুঁড়ে। বজ্জাত ব্যাটারা বলে কিনা 'কভি নেহি।' বলে কিনা মুসলমানের মুর্দা, দাফন নেই, কাফন নেই, জানাজা নেই–তার ওপর একটা আলাদা কবর পর্যন্ত পাবে না? এ হতে পারে না 'কভি নেহি!' গো ধরে বসে রইল। কত বোঝালাম।

নেতা : আহাম্মকী করেছেন। সরকারী কাজ করেন কি-না! পাবলিক সেন্টিমেন্ট বোঝেন না। বোঝাতে গিয়ে সময় নষ্ট না করে ওদের খুশীমতো কাজ করতে দিলে

আপনার ইজ্জত ডুবত? কাজ আদায় করা নিয়ে আপনার কারবার। সমাজ সংস্কারের বক্তৃতা দেবার জন্য আপনাকে সরকার বেতন দেয় না। আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আকাশ ফরসা হয়ে যাবে–আজান পড়বে–কারফিউ শেষ হবে। লাশগুলো নিয়ে আপনি এখনও মিটিং করছেন?

হাফিজ : আমি সঙ্গে সঙ্গে ওদের কথায় রাজী হয়ে গিয়েছিলাম।

নেতা : তা'হলে এতক্ষণ দেরী হচ্ছে কেন?

হাফিজ : ঐ তখনই ত স্যার আরেকটা নতুন ফ্যাঁকড়া বাঁধল। কোত্থেকে ছুটে এসে ঐ মুর্দা ফকির চ্যাঁচামেচি শুরু করে দিল।

নেতা : কে? আপনাকে এতবার করে বলছি, দম্‌কা দম্‌কা একেকটা উদ্ভট কথা আমাকে বলবেন না। ধড়াক করে বুকে লাগে! যা বলবার তা অত নাটক করে টিপে টিপে না বলে খোলাখুলি প্রথমেই সবটা বলে ফেলতে পারেন না। (বুকে হাত বুলাইয়া) এই মুর্দা ফকিরটি কে আবার? কবর ফুঁড়ে বেরিয়েছে নাকি? কারফিউর মধ্যে এখানে ঢুকল কী করে? গার্ডগুলো কী করছিল?

হাফিজ : এখানেই থাকে স্যার। গোরস্তানের বাইরে কখনো যায় না বলেই ত ওই নাম। দিনরাত এখানেই পড়ে থাকে! মাঝে মাঝে কবরের সঙ্গে আলাপ করে। পাগল। বদ্ধ পাগল!

নেতা : হুম!

হাফিজ : লোকটা এমনিতে ভাল লেখা-পড়া জানে। ভাল আলেম। গ্রামের স্কুলে মাষ্টারী করত। তেতাল্লিশে দুর্ভিক্ষে চোখের সামনে ছেলে-মেয়ে মা-বৌকে মরতে দেখেছে। কিন্তু কাউকে কবরে যেতে দেখেনি। মুর্দাগুলো পচেছে। শকুনে খুবলে দিয়েছে। রাতের বেলায় শেয়াল এসে টেনে নিয়ে গেছে। সেই থেকে পাগল। গোরস্তান থেকে কিছুতেই নড়তে চায় না। বলে: মরে গেলে কেউ যদি কবর না দেয়। মরার সময় হলে, কাছাকাছি থাকব, চট করে যাতে কবরে ঢুকে পড়তে পারি। বড় ট্র্যাজিক স্যার।

নেতা : অনেক খবর রাখেন দেখছি।

হাফিজ : চাকরী, চাকরী স্যার! চারদিকের হরেক রকমের খোঁজ আমাদের রাখতে হয় স্যার।

নেতা : বেশী খোঁজাখুঁজি করতে গিয়ে নিজের বুদ্ধিটাই কোথায় যেন খুইয়ে এসেছেন। মেহেরবানী করে তাড়াতাড়ি বলবেন কি গোলমালটা কিসের! লাশগুলো মাটি চাপা দিতে এত দেরী হচ্ছে কেন? ঠাণ্ডায় আপনার মগজ জমে গেছে। কেবল এলোমেলো বকছেন। নিন। (বোতলটা আগাইয়া দিয়া) এক চুমুক টেনে নিন। শরীর গরম হবে। বুকে সাহস পাবেন। কথা গুছিয়ে বলতে পারবেন। নিন।

হাফিজ : আপনার সামনে স্যার? তার ওপর স্যার এখন অন ডিউটি–

নেতা : তাকাল্লুকের সময় নেই। লাশগুলো মাটি চাপা দিয়ে কারফিউ শেষ হবার আগে আমাদের এখান থেকে সরে পড়তে হবে। ঢিলেমির এটা সময় নয়। ধরুন। একচুমুক টেনে চট্‌পট্ কাজটা শেষ করে ফেলুন।

হাফিজ : বেতালে মুখ লাগিয়ে খাব স্যার?

নেতা : কেন চুসনি লাগিয়ে দিতে হবে নাকি?

(হাফিজ বোতলটা মুখে লাগাইয়া চোঁ চোঁ করিয়া টানে টানে একদম খালি করিয়া ফেলিল। ঢক্ করিয়া বোতলটা মাটিতে রাখিয়া চোখ বড় করিয়া এক মুহূর্ত থম্ ধরিয়া থাকে। তারপর আকর্ণবিস্তৃত হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া–)

হাফিজ : এ মালটা স্যার আরও ভালো। একেবারে কলজেয় গিয়ে ঘা মারে।

নেতা : মুর্দা-ফকির লাশগুলো দেখেছে?

হাফিজ : এ্যা! ওহ্ হ্যাঁ, মানে না। বোধ হয় দেখেনি। ও ব্যাটার চলা-ফেরা কিছু ঠাওর করা যায় না। কোত্থেকে হঠাৎ হুস্ করে একবার সামনে এসে পড়ে।

বোধ হয়, আড়াল থেকে গোর-খুঁড়েদের সঙ্গে আমার কথাবার্তা শুনে থাকবে। আচমকা পেছন থেকে লাফিয়ে পড়ল। ঠিক আমাদের মাঝখানে। তারপর কী তুখোড় বক্তৃতা। আমি তো গোর-খুঁড়েদের কথা মেনেই নিয়েছিলাম। এ-ব্যাটাই না কোত্থেকে উড়ে এসে ওদের বোঝাতে শুরু করল– কিছুতেই না, একটা কবরেই কাজ সারতে হবে। যে হারে মানুষ মরছে তাতে নাকি শেষটায় ওর কবরের বাজারে ঘাটতি পড়ে যেতে পারে। দেখুনতো কি সব বিদঘুটে কথা!

নেতা : ওকে সুদ্ধ পুঁতে ফেললেন না কেন?

হাফিজ : কী যে বলেন স্যার! মন ভুলিয়ে কাজ আদায় হলে জানে মেরে ফেলে ফায়দা কি? পাগলা আদমি, একটু তাল দিয়ে কথা বলতেই শুড় শুড় করে আমার সঙ্গে চলে এল। ওকে এই দিকে পার করে দিয়ে আমি পাহারা দিচ্ছিলাম যেন আবার হামলা না করে। আর এই শালারাও সেই কখন থেকে শাবল চালাচ্ছে, এখনও নাকি খোঁড়াই শেষ হলো না! (ঘড়ি দেখিয়া) এতক্ষণে নিশ্চয়ই প্রায় হয়ে এসেছে।

নেতা : (গ্লাসে চুমুক দিয়া) না। কাজটা ঠিক হয় নি। এ-সব ফকির-দরবেশ বড় ধড়িবাজ লোক হয়। কোত্থেকে কী উৎপাত সৃষ্টি করবে কে জানে!

হাফিজ : লাশ ও ব্যাটা দেখেনি। দেখলেও কিছু বুঝতে পারত না! রক্ত-মাংসের স্তূপ। দেখে ও কী বুঝবে? এ রকম লাশ তো ট্রেন-চাপা মড়ারও হতে পারে।

নেতা : গুলী চলেছে দুপুর বেলা। খবর দেশময় ছড়িয়ে পড়েছে সঙ্গে সঙ্গে, এফোঁড়-ওফোঁড়। ফকির হোক পাগল হোক–শহরে থেকেও এ খবর ওর কানে পৌঁছেনি তা ভাবতে আমি রাজী নই। এসব খবর ঝড়ো হাওয়ার মুখে আগুনের ফুলকীর মতো ছড়িয়ে পড়ে।

হাফিজ : মুর্দা-ফকির ঝড়ও বোঝে না, আগুনও বোঝে না। ওত এক রকম কবরের

বাসিন্দা। ভাষার দাবীতে মিছিল বেরিয়েছিল বলে পুলিশ গুলী করে কয়েকটাকে খতম করে দিয়েছে–এত কথা বোঝবার মতো জ্ঞান-বুদ্ধি ওর নেই। লাশ দেখলেই ও মুখের মধ্যে ভাত গুঁজে দিতে চায়–কারণ ওর ধারণা, মানুষ শুধু এক রকমেই মরতে পারে–খেতে না পেয়ে। পাগল, বদ্ধ পাগল!

নেতা : কিন্তু লাশগুলো কোথায় কবর দেয়া হচ্ছে তাত ও দেখেছে। সকালবেলা যদি কাউকে আঙ্গুল দিয়ে জায়গাটা দেখিয়ে দেয়? লাশ নিয়ে মিছিল করতে না পেরে ক্ষেপে গিয়ে সকাল বেলা যদি ছাত্ররা এখানেও খোঁজ করতে আসে?

হাফিজ : আপনারা লীডার। অনেক দূর ভাবেন। আমরা পেটি-অফিসার হুকুম তামিল করেই খালাস। কী করতে হবে?

(স্তব্ধতা)

নেতা : ওটাকে শুদ্ধো পুঁতে দাও।

হাফিজ : এ্যা? কী বলছেন স্যার? আপনি এক্সাইটেড হয়ে গেছেন স্যার! আর খাবেন না এখন।

নেতা : আমার মাত্রা আমি জানি। পুঁতে ফেল। দশ-পনেরো-বিশ-পঁচিশ হাত–যত নিচে পারো। একেবারে পাতাল পর্যন্ত খুঁড়তে বলে দাও। পাথর দিয়ে মাটি দিয়ে, ভরাট করে গেতে ফেল। কোনদিন যেন আর ওপরে উঠতে না পারে। কেউ যেন টেনে ওপরে তুলতে না পারে। যেন মিছিল করতে না পারে, শ্লোগান তুলতে না পারে, যেন চ্যাঁচাতে ভুলে যায়।

হাফিজ : আপনি বড় এক্সাইটেড স্যার। এসব কাজ বড় সূক্ষ্ম স্যার! এক্সাইটমেন্ট সব পণ্ড করে দিতে পারে। আমাদের ট্রেনিংই এজন্য অন্যরকম। কোনো সময়ই আমাদের উত্তেজিত হতে নেই। ভান করতে পারি কিন্তু আসলে উত্তেজিত নই।

নেতা : পুঁতে ফেল।

হাফিজ : ভুল খুব ভুল হবে। যাই করতে হয় স্যার খুব কুললী করতে হবে। এসব আমাদের রীতিমতো প্রঐকটিস করে আয়ত্ত করতে হয়েছে। এতে কাজ হয়। আমি একবার ওই দিকটা দেখে আসি। এত দেরী হচ্ছে কেন বুঝতে পাচ্ছি না।

নেতা : যান তাড়াতাড়ি যান! আপনার কথা শুনতে শুনতে কানে তালা লেগে গেছে। নেশাটা পর্যন্ত জমতে পারছে না। আর বেশীক্ষণ আপনাকে দেখলে, আপনাকে শুদ্ধো পুঁতে ফেলতে ইচ্ছে হবে।

হাফিজ : এ্যা। ওহ–হে হে হে! আপনার কথা শুনলে হাসি পায় ঠিক–কিন্তু, মানে পিলে পর্যন্ত চমকে ওঠে স্যার। বুকটা ধড়ফড় করে উঠেছে। উঠতে গিয়ে মনে হলো যেন পড়ে যাবো। বড়ডো ভয় পেয়ে গেছি স্যার। আরেকটু দেবেন স্যার? খেলে একটু মনে সাহস আসবে। তাড়াতাড়ি গুছিয়ে কাজ করতে পারব। এই নূতন বোতলটা কেমন স্যার?

নেতা : (চোখ তুলিয়া) আপনার মাত্রা আমার জানা নেই। এই দফায় একটু কমিয়ে দিলাম। (গ্লাসে কিছুটা ঢালিয়া বোতলটা তুলিয়া দিলেন।)

(নিঃশব্দে পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে মুর্দা ফকির। কেহ তাহাকে দেখে নাই। সর্বাঙ্গ কম্বলে ঢাকা। রুক্ষ ময়লা চুল। তীক্ষ্ম কোটরাগত চক্ষু জ্বলিতেছে। হাফিজ ও নেতা বোতল ও গ্লাস চুমুকে শেষ করিয়াছে।)

ফকির : (হাফিজের কাঁধে হাত দিয়া) ঝুঁটা!

(হাফিজ ও নেতা সভয়ে চীৎকার করিয়া ওঠে। নেতা দুর্বল হৃৎপিণ্ড চাপিয়া ধরে।)

নেতা : কে?

হাফিজ : এ্যা! ওহ! আপনি? হঠাৎ অন্ধকারে চিনতে পারিনি হুজুর!

ফকির : ঝুঁটা, মিথ্যাবাদী। আমাকে চিনতে পারে না এ-গোরস্তানে এমন কেউ নেই। জিন্দা-মুর্দা কেউ না। জিন্দা আর মুর্দায় পার্থক্য বোঝো? দেখলে চিনতে পারবে?

হাফিজ : সে হুজুর আপনার দোয়ায়।

ফকির : ঝুঁটা! তুমি কোনো পার্থক্য বোঝো না, কিছু চেন না। তুমি বাঁচার না-লায়েক। তোমার মতো জিন্দা আদমীকে কেউ দোয়া করে না। পাগলেও না! তুমি আমাকে ধোঁকা দিয়েছ। আমি ওদের ভালো করে দেখেছি, ওরা মুর্দা নয়। মরেনি। মরবে না। ওরা কখনো কবরে যাবে না। কবরের নীচে ওরা কেউ থাকবে না। উঠে চলে আসবে।

হাফিজ : আপনি তো এইদিকে ছিলেন। ওদিক গেলেন কখন?

ফকির : বাবা! তোমরা শহরের অলি-গলি যেমন চেন, এ গোরস্তান আমার তেমনি চেনা। এখানে কবরের নীচ দিয়ে সুড়ং আছে। আমি তৈরী করেছি। নইলে তোমাদের সঙ্গে পারব কেন?

হাফিজ : হো হো হো। আপনি বড় মজার কথা বলেছেন হুজুর।

ফকির : এই ত ঠিক বুঝতে পেরেছ বাবা! তুমি আমায় ফাঁকি দিতে চেয়েছিলে। ভেবেছিলে পাসপোর্ট না করিয়েই ওপার চালান করে দেবে! পরীক্ষা না করে কি আর আমি এমনি যেতে দি।

হাফিজ : সালাম হুজুর! আপনি বুঝি এখানকার পাসপোর্ট অফিসার? মাফ করে দিন হুজুর, এতক্ষণ চিনতে পারিনি।

ফকির : সাবাস বেটা! তোর নজর খুলছে।

হাফিজ : তা হুজুর এখন অনুমতি দিন ওদের পার করে দি!

ফকির : না! আমি প্রথমেই সন্দেহ করেছিলাম একটা কিছু গোলামাল নিশ্চয়ই আছে। তাই না চুপে চুপে সুড়ং দিয়ে ঢুকে একেবারে তোদের ঢাকা মোটর গাড়ীর ভেতর গিয়ে

উঠলাম!

নেতা : ইন্সপেক্টর!

ফকির : প্রথমে দেখে মনে হোলো ঠিক আছে। উল্টে-পাল্টে দেখি, কোনটার বুকের কাছে এক খাবলা গোশ্‌ত নেই, কোনটার ফাটা খুলি দিয়ে কি সব গড়িয়ে পড়ছে, ভাবলাম ঠিকই আছে। কবরের কাবেল। কিছু নয়, শেয়াল-শকুনে খামছে কামড়ে একটু খারাপ করে গেছে। তারপর হঠাৎ খেয়াল করে দেখি–না ত, ঠিক ত নাই! উহুম!

হাফিজ : সে কি হুজুর! ঠিক। সব ত ঠিকই আছে!

ফকির : চোপরও। ঠিক নেই। গন্ধ ঠিক নেই। তোমরা চোরাকারবারী। আমি শুঁকে দেখেছি গন্ধ ঠিক নেই।

হাফিজ : গন্ধ?

ফকির : বাসি মরার গন্ধ আমি চিনি না? এ লাশের গন্ধ অন্যরকম। ওষুধের, গ্যাসের, বারুদের গন্ধ। এ-মুর্দা কবরে থাকবে না। বিশ-পঁচিশ-ত্রিশ হাত যত নীচেই মাটি চাপা দাও না কেন–এ মুর্দা থাকবে না। কবর ভেঙে বেরিয়ে চলে আসবে। উঠে আসবে।

হাফিজ : ওহ্! তা হলে বলুন কবর দেয়া হয়ে গেছে। থাক। গন্ধ থাকুক। মাটির নিচ থেকে নাকে লাগবে না।

ফকির : ওরা জোর করে কবর দিল। আমায়ও বলল না। আমিও তোমাদের কথা মানবো না। ও মুর্দা কবরের নয়। আমি ওদের ডেকে তুলে নিয়ে চললাম।

হাফিজ : খোদা হাফিজ!

(ফকির কিছুদূর যাইয়া আবার ফিরিয়া আসে। টানিয়া টানিয়া চারিদিক হইতে কি শুঁকিতে চেষ্টা করে। নিজের শরীরও শুঁকে দেখে)

ফকির : নাঃ আমার গায়ের গন্ধ নয়। দেখি–

(আগাইয়া আসিয়া একবার হাফিজের গা শুঁকিবে। তারপর ঝুঁকিয়া হাফিজের মুখের ঘ্রাণ নিয়াই জ্বলজ্বলে চোখ বিস্ফারিত করিয়া দেয়। ছুটিয়া নেতার মুখের ঘ্রাণ নেয়। মুখ-চোখ অধিকতর উজ্জ্বল করিয়া)

উহ্! তাই বলো! এইবার পেয়েছি। ব্যাটারা কি ভুলই না করেছে!

নেতা : ইন্সপেক্টর, লোকটাকে দূর করে দাও এখান থেকে।

ফকির : গন্ধ! তোমাদের গায়ে মরা মানুষের গন্ধ! তোমরা এখানে কি কোরছো? যাও, তাড়াতাড়ি কবরে যাও। ফাঁকি দিয়ে ওদের পাঠিয়ে দিয়ে নিজেরা বাইরে থেকে মজা লুটতে চাও, না? না, না। আমার রাজ্যে এসব চলবে না। (গন্ধ শুঁকে) তোমাদের গায়ে মুখে পাই মরার গন্ধ!

তোমাদের সময় হয়ে গেছে। ছি, এ-রকম ফাঁকি দেবে না! আমি ওদের তুলে নিয়ে আসছি, তোমরা তৈরি হয়ে নাও। ইস! গোর-খুঁড়েরা কী ভুলই-না করেছে! না, না এ তো হতে পারে না–

(বিড়বিড় করিতে করিতে ফকিরের প্রস্থান। মঞ্চে বিমূঢ় নেতা। হাফিজ হাসিতেছে। প্রাণ খুলিয়া হাসিয়া লইতেছে। সাফল্যের হাসি। পানাধিক্য হেতু কিঞ্চিত বেসামাল)

হাফিজ : হে হে হে হে স্যার! সব খতম স্যার। আমরা এখন ফ্রী! দেখলেন তো, পাগলটাকে কি রকম পোষ মানালাম। পাগলটাকে অত হুজুর হুজুর না বললে হয়তো গায়ের দিকেই ছুটত। আর শরীরটা অনেকক্ষণ থেকেই এমন নড়বড়ে মনে হচ্ছে যে, এর ওপর এখন কিছু এসে পড়লে পাত্তা পাওয়া যেত না।

নেতা : ভালো হতো। তুলে নিয়ে আপনাকে শুদ্ধো পুঁতে ফেলার ব্যবস্থা করতাম।

হাফিজ : ঐ একটা নোংরা কথা বারবার বলবেন না, স্যার। তা'হলে আমিও আপনার সম্পর্কে দু'একটা হক্ কথা বলে ফেলবো কিন্তু।

নেতা : যেমন?

হাফিজ : যেমন? বেশ। একটা বলছি। আমাকে তুলে নিয়ে যাবার মতা ক্ষমতা বা অবস্থা আপনার এখন নেই। আপনি এখন নিজেকে নিজে খাড়া রাখতে পারলেই প্রচুর হাততালি পাবেন। বক্তৃতা না করলেও হাততালি দেবো।

নেতা : মারহাবা! সাবাস! খুব ধরেছেন। ডিপার্টমেন্টের মুখ উজ্জ্বল করবেন একদিন। একবারও তো ঠিকমত উঠে দাঁড়াইনি, ধরে ফেললেন কী করে?

হাফিজ : অনেক দিন হোলো এ লাইনে আছি স্যার, এতটুকু বুঝবো না?

নেতা : সবটা ঠিক ধরতে পারেন নি। উঠতে হয়তো কষ্ট হবে, কিন্তু বক্তৃতা আমি ঠিক দিতে পারব। কি, বিশ্বাস হয় না বুঝি!

হাফিজ : বিশ্বাস? হ্যাঁ! পারবেন! তা পারবেন। আমি, আমি মানে আমার ব্রেনটাও ঠিক আছে। যে-জেনও পরিস্থিতিতে এখনও আমার ডিউটি ঠিক করে যেতে পারবো তবে, তবে মানে এই চোখ, আর কান খামোকাই একটু বেশী কাজ করছে বলে ভয় হচ্ছে।

নেতা : ভয়? ভয় কিসের! তুমি মনে করেছ ঐ মুর্দা ফকিরের কথায় আমি ডরাই? এখান থেকে যাওয়ার আগে ওটাকে মুর্দা বানিয়েই যাব। কোথাকার আবার জীন্দা পীর এসেছেন–ওর কথায় গোর থেকে লাশ উঠে আসবে!

হাফিজ : কিছু মনে করবেন না স্যার। একটা সওয়াল পুছ করছি আপনাকে । মনে করেন, সত্যি যদি ঐ মুর্দা ফকির লাশগুলোর একটা মিছিল নিয়ে এসে দাঁড়ায়–কী করবেন তখন আপনি?

নেতা : সব্বাইকে, আপনাকে শুদ্ধো, একসঙ্গে পুঁতে ফেলতাম।

হাফিজ : আমি কিন্তু আপনার সঙ্গে রসিকতা করি নি। ঐ মুর্দা ফকির শুনেছি অনেক কিছু জানে। কিন্তু যদি ত্যাসেও আমি ভয় পাই না। একটুও না। প্রথমে হাসবো। দেখব এগিয়ে যাবো। হাত মেলাবো। ভয় কিছুতেই পাবো না। (নিজের গলা দুই হাতে সজোরে টিপিয়া ধরিয়া) গ...লা টিপে ধরে রাখবো। যাতে বুকের মধ্যে ভয়...য় কিছুতেই ঢুকতে না পারে। আরেকটু দেবেন স্যার? বুকে সাহস আসবে। কেন জানি ইয়ে করছে।

(ততক্ষণে পার্টিশনের ওই পাশ হইতে সকলের অলক্ষ্যে ক্রমোজ্জ্বলিত আলোকশিখার কম্পিত গোলকের মধ্যে একটি ভয়াবহ মুখ ভাসিয়া উঠিয়াছে। সমস্ত বদনমণ্ডল পরিবেষ্টিত করিয়া রক্তাক্ত ব্যাণ্ডেজ। মূর্তি নিশ্চল। নেতা যখন শেষবারের মতো ইন্সপেক্টরকে পানীয় দিবার জন্য গ্লাসে বোতল উপুড় করিয়া ধরিয়াছেন তখন ঐ স্তব্ধ মূর্তির একটি প্রায় অদৃশ্য হাত অন্ধকার হইতে কি যেন ছুড়িয়া মারিল। কাঁচের গ্লাসের ঝন্‌ঝন্ শব্দ। নেতা ও হাফিজের ভয়ার্ত অস্ফুট চীৎকার!)

হাফিজ : গুলী। গুলী স্যার! শুয়ে পড়ুন শীগ্‌গীর! গুলী!

(দুই জনে উপুড় হইয়া শুইয়া পড়ে। পশ্চাতে কম্পিত শিখায় নিস্পন্দ মুখ! কয়েক মুহূর্তের সুতীব্র স্তব্ধতা)

নেতা : (চাপা স্বরে) গুলী যে বুঝলে কি করে?

হাফিজ : দেখেছি!

নেতা : কে ছুঁড়েছে তুমি দেখেছো?

হাফিজ : না। তবে কি ছুঁড়েছে দেখেছি।

নেতা : কোথায়?

হাফিজ : বেশী নড়বেন না। খুঁজে দেখছি পাই কি না? (উপুড় হইয়া একটু চারিদিকে হাতড়ায়। হঠাৎ কি তুলিয়া দেখে) ধরুন, পেয়েছি।

নেতা : (হাতে লইয়া) এ কি? এ যে বুলেট! রক্তমাখা!

হাফিজ : কুল্‌লী! কুল্‌লী! ভয় পাবেন না স্যার! ভয় পেলেই সব গেল। এ নিশ্চয়ই ঐ মুর্দা ফকিরের কাণ্ড! ট্রাকের ভিতর ঢুকে লাশের গা থেকে হয়ত খুলে নিয়ে এসেছে। সেগুলোই ছুঁড়ে মেরে এখন আমাদের ভয় দেখাচ্ছে।

নেতা : ও! তা'হলে বলো কিছু না! মুর্দা ফবির–সে ত জ্যান্ত আদমী। বড় ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।

হাফিজ : এখন উঠে পড়া যাক স্যার। মিছেমিছি ভয় পেয়ে লাভ কি!

নেতা : ইন্সপেক্টর!

হাফিজ : জী!

নেতা : আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে–যে মেরেছে, সে এখনও আমাদের পেছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

হাফিজ : এ্যা।

নেতা : তুমি একটু ঘুরে একবার দেখ তো। আমিও তাকাচ্ছি।

হাফিজ : (ধীরে মাথা ঘুরাইয়া দেখে সর্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠে। আপ্রাণ চেষ্টায় অস্বাভাবিক স্থির কণ্ঠে) উঠে এসেছে।

নেতা : কে?

হাফিজ : সেই লাশটা।

নেতা : লাশ? কোন লাশটা?

হাফিজ : বুলেট খাওয়া। ছাত্র। খুলি নাই!

নেতা : ওহ্!–কী চায়?

হাফিজ : চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। জিজ্ঞেস করে দেখব?

নেতা : কী জিজ্ঞেস করবে?

হাফিজ : এই, কি চায়, কেন উঠে এসেছে, ঠাণ্ডা লাগছে নাকি–এই সব?

নেতা : আমাদের কথা বুঝবে?

নেতা : ট্রাই করতে হবে। সব লাইনই ট্রাই করতে হবে। এটা একটা নতুন সিচুয়েশান স্যার। কুল্‌লী অগ্রসর হ'তে হবে। ঘটনা হিসেবে এটা অবাস্তব হ'তে বাধ্য। কিন্তু, অন্যরকম হলেও আমাদের ভয় পেলে চলবে না। ফেইস করতেই হবে।

(উঠিয়া দাঁড়াইবে। বেশ কষ্ট। নাটুকে মাতালের টলায়মান অবস্থা নয়, তবে নেশা যে উভয়েরই খুব গাঢ় হইয়াছে তাহা স্পষ্ট।)

নেতা : আপনি কিছু ভয় পাবেন না। আমি পেছনে রয়েছি। পিস্তলের টিপ আমার পাক্কা।

হাফিজ : খবরদার, অমন কাজও করবেন না। (ফিস্‌ফিস্ করিয়া) পিস্তলের কেস এটা নয় স্যার! বুঝতে পারছেন না–এটা–ঠিক মানে, অন্য জিনিস, মানুষ নয়। পিস্তল রেখে দিন। লক্ষ করুন আমি কি রকম সামলে নিচ্ছি। একটু আলাপ করতে পারলেই পোষ মানিয়ে নেব। (ধীরে ধীরে আগাইয়া মূর্তির নিকট আসে! বাতাসে টানিয়া টানিয়া স্পর্শ করিতে চেষ্টা করে) এই!–এই! আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? এই! (মূর্তি নীরব। নিশ্চল) (ঘুরিয়া) স্যার, কোন সাড়া দিচ্ছে না যে?

নেতা : বোধ হয় আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসেনি। আমাদের সঙ্গে হয়ত কোন কাজ নেই। ভালো। তা ভালো। ও থাকুক। আমরা চলো আমাদের কাজে যাই।

হাফিজ : তা হয় না স্যার। ওকে এখানে দাঁড় করিয়ে আমরা চলে যাবো? তা হয় না স্যার। আমার ডিউটী আমাকে করতেই হবে। ওকে ফেরত না পাঠিয়ে আমরা চলে যেতে পারি না, স্যার!

মূর্তি : আমি যাবো না। আমি থাকবো।

(দু'জনে হতবাক! ধীরে ধীরে হাফিজ আগাইয়া যায়)

হাফিজ : কোথায় যাবে না? কোথায় থাকবে?

মূর্তি : কবরে যাবো না। এখানে থাকবো।

হাফিজ : অবুঝের মত কথা বোলো না। তোমাদের এখন এখানে আর থাকতে নেই। তোমরা মরে গেছ। অন্যখানে তোমাদের জন্য নতুন জায়গা ঠিক হয়ে গেছে। সেখানেই এখন তোমাদের চলে যাওয়া উচিত।

মূর্তি : মিথ্যে কথা। আমরা মরিনি। আমরা মরতে চাইনি। আমরা মরবো না।

হাফিজ : (নেতার কাছে আসিয়া) বড় একগুঁয়ে স্যার। আলাপ করে সুবিধে হবে, মনে হচ্ছে না। একটা বক্তৃতা দিয়ে দেখবেন স্যার? যদি কিছু আছর হয়! পারবেন না স্যার? আপনি তো বলেছিলেন–যাই হোক–বক্তৃতা দিতে আপনার কোন কষ্ট হবে না। একবার ট্রাই করুন না!

নেতা : (ভাল করিয়া শুনিয়া) দেখ ছেলে, আমার বয়স হয়েছে। তোমার মুরুব্বিরাও আমাকে মানে। বহুকাল থেকে এ-দেশের রাজনীতি আঙ্গুলে টিপে টিপে গড়েছি, শেপ দিয়েছি। কওমের বৃহত্তম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের বলতে পার, আমি একচ্ছত্র মালিক! কোটি কোটি লোক আমার হুকুমে ওঠে বসে–

মূর্তি : কবরে যাবো না।

নেতা : আগে কথাটা ভাল করে শোন। তুমি বুদ্ধিমান ছেলে শিক্ষিত ছেলে। চেষ্টা করলেই আমার কথা বুঝতে পারবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে উঁচু ক্লাসে উঠেছ। অনেক কেতাব পড়েছ। তোমার মাথা আছে।

মূর্তি : ছিল। এখন নেই। খুলিই নেই। উড়ে গেছে। ভেতরে যা ছিল রাস্তায় ছিটকে পড়ে নষ্ট হয়ে গেছে।

নেতা : জীবিত থাকতে তুমি দেশের আইন মানতে চাও নি। মরে গিয়ে তুমি এখন পরপারের কানুনকেও অবজ্ঞা করতে চাও। কম্যুনিজমের প্রেতাত্মা তোমাকে ভর করেছে, তাই মরে গিয়েও এখন তুমি কবরে যেতে চাও না। তোমার মত ছেলেরা দেশের মরণ ডেকে আনবে। সকল সর্বনাশ না দেখে বুঝি কবরে গিয়েও শান্ত থাকতে পারছো না। তোমাকে দেশের নামে, কওমের নামে, দীনের নামে, যারা এখনও মরেনি–তাদের নামে–মিনতি করছি–তুমি যাও, যাও, যাও!

মূর্তি : আমি বাঁচবো।

নেতা : কি লাভ তোমার বেঁচে? অশান্তি ডেকে আনা ছাড়া তোমার বেঁচে কি লাভ? তুমি বেঁচে থাকলে বারবার দেশে আগুন জ্বলে উঠবে, সব কিছু পুড়িয়ে ছারখার না করে সে আগুন নিভবে না। তার চেয়ে তুমি লক্ষী ছেলের মত কবরে চলে যাও। দেখবে দু'দিনে সব শান্ত হয়ে যাবে। দেশে সুখ ফিরে আসবে। (মূর্তি মাথা নাড়ে) আমি ওয়াদা করছি তোমাদের দাবী অক্ষরে অক্ষরে আমরা মিটিয়ে দেবো। তোমার নামে মনুমেন্ট গড়ে দেবো। তোমার দাবী এ্যাসেম্বলীতে পাশ করিয়ে নেবো। দেশজোড়া তার জন্য প্রচারের ব্যবস্থা করবো। যা বলবে তাই করবো। দোহাই তোমার তবু অমন স্তব্ধ পাথরের মূর্তির মত আকাশ ছোঁয়া পাহাড়ের মত নিশ্চল হয়ে থেকো না। সরে যাও, তলে যাও, অদৃশ্য হয়ে যাও।

(সর্বাঙ্গে কাফনের কাপড় জড়াইয়া আর একটি মূর্তি নিঃশব্দে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। চুলে রক্ত-মাখা। মুখে আঘাতের চিহ্ন। ঠোঁটের দুই পাশে বিশুষ্ক রক্তরেখা।)

কে? তুমি কে?

মূর্তি (২): নাম বললে চিনতে পারবেন না। হাইকোর্টের কেরানী ছিলাম। তখন টের পাইনি। ফুসফুসের ভেতর দিয়ে চলে গিয়েছিল। এপিঠ-ওপিঠ। বোকা ডাক্তার খামোকা কেটেকুটে গুলীটা খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়েছে। জমাট রক্তের মধ্যে ফুটো নজরেই পড়েনি প্রথমে!

নেতা : তুমিও এই দলে এসে জুটেছো নাকি?

মূর্তি (২): গুলী দিয়ে গেঁথে দিয়েছেন। ইচ্ছে করলেও আল্‌গা হতে পারবো না।

নেতা : তুমি আমাকে চেন?

মূর্তি (২): চশমাটা আজ খুঁজে পাই নি। অন্ধকারে আপনাকে চেনা যাচ্ছে না। তবে আপনার গলা চিনি।

নেতা : আমার কথা শুনেছ ? এই মাত্র যা বলছিলাম?

মূর্তি (২): আপনি মিথ্যেবাদী। কথা দিয়ে আপনি কথা রাখেন না। আপনি অনেক ওয়াদা করে সেবার আমাদের দেড় মাস লম্বা ধর্মঘট ভেঙে দিয়েছেন। আমার ছোট ছেলেটা তখন মারা যায়। আপনার কথা শুনেছি। আপনার কথা ভুলিনি। আপনি মিথ্যেবাদী।

মূর্তি : আমরা কবরে যাবো না।

মূর্তি : আমরা বাঁচবো। (বিড়বিড় করিতে করিতে পশ্চাতে গিয়া উপুড় হইয়া বসিবে। আর দেখা যাইবে না।)

(নেতা মাথা নীচু করিয়া সরিয়া আসে। হাফিজ অগ্রসর হইয়া কানের কাছে বেশ জোরে ফিস্ ফিস্ করিয়া।)

হাফিজ : হবে না। এই লাইনে ঠিক কাজ হবে না স্যার। অন্য রাস্তা ধরতে হবে। আমার মাথায় একটা প্লান এসেছে। দেখবেন ঠিক কাবু করে ফেলবো। একটু ভোল বদলাতে হবে। সবই আমাদের করতে হয় স্যার। আপনি চুপ করে বসে দেখুন। (হাফিজ চাদরটা খুলিয়া এক প্যাঁচ গায়ের উপর জড়াইয়া বাকি অংশ ঘোমটার মত মাথার উপর তুলিয়া দিল।)

নেতা : ঢং ছাড়ো। মেয়েলোকের মতো ঘোমটা দিয়েছ কেন?

হাফিজ : (ফিস্ ফিস্ করিয়া) চুপ! আমি এখন স্ত্রীলোক। ওই ছোকরার মা। কথা বলবেন না। দেখে যান। বুঝতে পারছেন না সবাই একটু ঘোরের মধ্যে আছি, কিছু ধরতে পারবে না।

(আঁচল টানিয়া, ঘোমটা উঠাইয়া সামনে আসিয়া দাঁড়ায়। কণ্ঠস্বরকে অনাবশ্যকভাবে স্ত্রীলোকের মত করিয়া তুলিবার চেষ্টা নাই। তবে যথোপযুক্ত আবেগে ভরপুর।) খোকা! খোকা!

মূর্তি : (চঞ্চল। বেদনাহত।) কে? কে ডাকে?

হাফিজ : খোকা কোথায় গেলি তুই? খো–কা!

মূর্তি : ...কে? মা! মা! তুই কোথায় মা! (শূন্যে হাতড়ায়)

হাফিজ : এই যে যাদু, আমি এইখানে।

মূর্তি : তুমি আমার ওপর খুব রাগ করেছিলে না মা? তুমি বারণ করলে, তবু আমি শুনলাম না। রাস্তা থেকে ওরা ডাকলো। আমি ছুটে বেরিয়ে গেলাম। তোমার কাছে বলতে গেলে পাছে তুমি বাধা দাও–সেই জন্যে তোমাকে কিছু না বলেই চুপে চুপে চলে গেছি। আজ যে ওরকম গোলমাল হবে তুমি আগে থেকে কি করে জানলে মা?

হাফিজ : মা হ'লে সব জানতে হয়। মা হ'লে জানতি, মা'র কষ্ট কি! মা'র বুক খালি হ'লে, মার কেমন লাগে, তুই দস্যু ছেলে বুঝবি না।

মূর্তি : তোমরা সব কষ্ট বুঝি মা। নাক-মুখ বেয়ে আমার কেবল রক্ত গড়িয়ে পড়ছিল। সমস্ত দুনিয়াটা ঝাপসা হয়ে এল। আমার তখন খালি কি মনে হচ্ছিল জান মা? মনে হচ্ছিল তুমি বুঝি আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছো। সেই সেবার টাইফয়েড জ্বরের ঘোরে যখন খালি প্রলাপ বকতাম, তখন যেমন আমায় জড়িয়ে ধরে কাঁদতে–ঠিক তেমনি। আর আমার নাক-মুখ গড়িয়ে তোমার চোখের গরম নোনা পানি কেবল ঝরছে। ঝরছে।

হাফিজ : তবু তো কোন কথা শুনিস্ না। তোরা কেবল মার দুঃখ বাড়াতেই জন্মেছিস! এ তোদের কি নতুন নেশা! এত মরণ-পাগল কেন তোরা?

মূর্তি : মিছে কথা মা! আমরা কেউ মরতে চাই নি মা। তোমার কাছে থাকতে কি আমার ইচ্ছে করে না? হারিকেনের লণ্ঠন জ্বেলে অনেক রাত পর্যন্ত পড়ব পড়ব পড়ব। তেল কমে এলে সলতে উস্কে দিয়ে পড়ব, আর তুমি বা'র বা'র এসে

বকবে–কেবল বকবে। তারপর লণ্ঠন জোর করে কেড়ে নিয়ে যাবে। টেনে বিছানায় শুইয়ে দেবে। অন্ধকারে মশারীর ফাঁক দিয়ে ছায়া-মূর্তির মতো ঘুমে জড়ানো তোমার ছোট্ট এলোমেলো শরীরটা দেখবো–দেখবো–মা, চলে যেও না–মা! তোমায় আমি দেখব–তোমায় আমি আদর কোরবে মা– তুমি কোথায় মা?– মা!

হাফিজ : ঘুমের ঘোরে কি বকছিস? স্বপ্ন দেখছিলি বুঝি? অনেক রাত হয়েছে লক্ষ্মী বাবা, আর রাত জেগে পড়ে কাজ নেই। বিছানা করে রেখেছি। যাদু আমার শুতে যা!

মূর্তি : আমাকে শুতে যেতে বলছো মা? না। না। আমি শোব না। আমি এখন শোব না মা। আমি আর কোনোদিন শোব না। একবার ঘুমিয়ে পড়লে ওরা আমাকে আর জাগতে দেবে না। তুমি বুঝতে পারছ না মা– না, না আমি শোব না। আমি যাব না। আমি থাকব। আমি উঠে আসব।

নেতা : ইন্সপেক্টর! তোমার এ ভুতুড়ে নাটক আর কতক্ষণ চলবে?

হাফিজ : ছিঃ বাবা! জিদ কোরো না। লক্ষ্মীটি শুতে যাও। মা'র কথা শোনো। (দ্বিতীয় মূর্তি আচমকা চঞ্চল হইয়া উঠিয়া দাঁড়ায়)

মূর্তি (২): (অস্পষ্টভাবে হাফিজের দিকে হাত বাড়াইয়া) মিন্টু! মিন্টু! মিন্টু ঘুমায়নি এখনও।

হাফিজ : (সুর পাল্টাইয়া) তোমার কোলে আসার জন্যে কাঁদছে।

মূর্তি (২): দাও, আমার কোলে দাও। (বাচ্চা কোলে লইবার ভঙ্গি করে) ইস্!

জ্বরে যে গা পুড়ে যাচ্ছে গো!

নেতা : খবরদার! ফেলে দাও। ওটাকে ফেলে দাও কোল থেকে। এই শেষবারের মত বলছি। এখনও ভালো চাও তো সরে পড়। চলে যাও। সব।

মূর্তি : আমি যাবো না। আমি বাঁচবো মা! বৃষ্টিতে ভেজা নরম ঘাসের ওপর দিয়ে খালি পায়ে আমি আরও হাঁটিবো মা! ঠাণ্ডা রূপোর মত পানি চিরে হাত-পা ছুড়ে সাঁতার কাটবো মা!

মূর্তি (২): কাঁদিসনে মিন্টু! তোর বাপ কি কম চেষ্টা করেছে? দুষ্টু মুদী কিছুতেই মাসের শেষ বলে এক রত্তি বার্লি বাকি দিল না। বেতন নেই দেড় মাস, দেবে কেন? তুই কাঁদিসনে মিন্টু। তুই কাঁদলে তোর মাও কেবল কাঁদবে। এখন চুপ করে ঘুমিয়ে থাক। দেখবি, কাল ভোরে সব জ্বর কোথায় চলে গেছে!

নেতা : সকাল পর্যন্ত তোমদের নিয়ে এখানে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে নাকি? না আমি তা পারব না। এতসব আবদার আমার সঙ্গে চলবে না। গেট আউট। ডেভিল্স্! যাও বলছি।

হাফিজ : উত্তেজিত হবেন না স্যার! কুল্লী! কুউল্লী!

মূর্তি : তুমি একটুও ভয় পেয়ো না। কিচ্ছু ভেব না মা। আমি কিছুতেই মরব না। ছায়া

মূর্তির মতো বার বার আসবো। তুমি যদি আমার কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ো, দরজায় এসে টোকা দেবো। চৌমাথার মোড়ে দাঁড়িয়ে হাতছানি দিয়ে তোমায় ইশারা কোরবো। তোমার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়বো মা!

মূর্তি (২): (কোলের কল্পিত সন্তানকে) ধূর বোকা! তুই স্বপ্ন দেখদিস। ভয়ের কি আছে! তুই ত আমার কোলে! আমি থাকতে তোকে মারে এমন দৈত্য দুনিয়ায় নেই। (সামনের দিকে ইশারা করিয়া) ওগুলো কিছু না। সব সং সেজে তোকে ভয় দেখাতে চায়। তুই ঘুমো। ঘুমো।

নেতা : ইন্সপেক্টর! আমি এসব মানি না। আমি স–ব পুঁতে ফেলবো। একটা একটা করে গুলী করে আমি সব মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেবো। হাজার হাজার হাত মাটির নীচে সব পুঁতে ফেলবো। যাতে কোনদিন আর উঠতে না পারে। ভয় দেখাতে না পারে। গুলী, সবগুলোকে আবার গুলি করো। গার্ড! গার্ড! (হন্তদন্ত হইয়া প্রবেশ করে মুর্দা ফকির।)

ফকির : জী হুজুর।

নেতা : (লক্ষ না করিয়া) গুলী করো।

ফকির : গুলী? ওহ্! হ্যাঁ! আছে! আমার কাছে আরও কয়েকটা আছে। এই নিন বুলেট। খুব তাজা। টাট্‌কা। এখনও খুন লেগে রয়েছে। হাত পাতুন। ধরুন!

(স্তম্ভিত ভয়ার্ত বিমূঢ় নেতা হাত বাড়াইয়া গ্রহণ করিবে)

লোড আপনি করুন! আমি ওদেরকে ডেকে নিয়ে আসি! যাই। আমি মিছিলটা এইদিকে ডেকে নিয়ে আসি।

(হন্তদন্ত হইয়া ফকিরের প্রস্থান। সেই গমন পথের দিকে তাকাইয়া নেতা একবার নিজের বুক চাপিয়া ধরে। হাফিজ পিছন হইতে আগাইয়া তাহাকে ধরে।)

(নেপথ্যে মুর্দা ফকির চীৎকার করিতেছে : তোরা কোথায় গেলি? সব ঘুমিয়ে নাকি? উঠে আয়। তাড়াতাড়ি উঠে আয়। সব মিছিল করে উঠে আয়। গুলী গুলী হবে। স্ফূর্তি করে উঠে আয় সব। কোথায় গেলি? সব উঠে আয়। মিছিল করে আয় এদিকে। আজ গুলী–গুলী হবে আজ! কবর খালি করে সব উঠে আয়!)

(মঞ্চের উপরের লাল মূর্তিদ্বয় মুর্দা ফকিরের ডাক কান পাতিয়া শুনিতেছিল। ক্রমে একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল। তারপর ধীরে ধীরে একজনের পিছনে আরেকজন–ক্রমে আরও অনেকে–সারি দিয়া চলিয়া যাইবে এবং তাহাদের উপর প্রতিফলিত আলোর রেখাও ক্রমে বিলীন হইয়া যাইবে)।

(হাফিজ ও নেতা লক্ষ্য করে নাই যে মঞ্চ খালি হইয়া গিয়াছে।)

নেতা : (বিবর্ণ মুখে) ইন্সপেক্টর! হার্টটা জানি কেমন করছে। বড় ভয় পেয়ে গেছি! একটু ধরে রেখো আমাকে? আর আর একটু ঢেলে দিতে পারবে?

হাফি : না! আপনার এখন হুঁশ নেই! আমার নিজেরও হয়ত নেই! ঠিক বুঝতে পারছি না!

(পিছন হইতে গার্ড হঠাৎ লণ্ঠন হাতে ঢুকিয়া পড়িয়া প্রচণ্ড শব্দে বুট ঠুকিয়া স্যালুট করে!)

নেতা : (চমকাইয়া) কে? এটা কি আবার?

হাফিজ : (দেখিয়া) ইডিয়ট! এটা কি তোমার প্যারেড গ্রাউণ্ড নাকি? বন্দুকের গুলীর মত স্যালুট করতে শিখেছ দেখছি! কি চাও?

গার্ড : গাড়ীতে উইঠ্যা হগলে আপনাগো লাইগা এন্তেজার করতাছে! সব কাম খতম! কারফিউ শেষ হইতেও আর দেরী নেই!

হাফিজ : (প্রথম লক্ষ্য করিল যে, মঞ্চ খালি! ভাল করে কয়েকবার চোখ কচলায়) গুড! সব কাজ খতম ত? গুড্! সব কাজ খতম স্যার! নীট জব! বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি স্যার? ভালো করে দেখুন না নিজেই।

নেতা : (ধীরে ধীরে চোখ ঘুরাইয়া দেখে, তারপর সামনের দিকে অর্থহীন বিষণ্ন দৃষ্টি মেলিয়া চুপ করিয়া থাকে) হুম!

গার্ড : কিছু তালাশ করতেছেন হুজুর? খুঁইজা দেখুম?

নেতা : না চলো!

হাফিজ : কিছু না স্যার! এসব কিছু না। গোরস্থানে এ রকম কত কিছু হয়। তার ওপর আবার স্যার–মানে–

নেতা : হুম! চলো! আর দ্যাখো মুর্দা ফকিরটাকে সঙ্গে নিতে হবে। কিছুদিন থাকুক।

(বুকে হাত চাপিয়া ধরে)

হাফিজ : এ্যা? মুর্দা ফকির? ওহ্! নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই! ইয়েস স্যার!

(সকলে ধীরে ধীরে চলিয়া যাইবে। গার্ড গ্লাস বোতল ইত্যাদি গুছাইয়া লইবে।)

লেখক-পরিচিতি

মুনীর চৌধুরী ১৯২৫ সালের ২৭শে নভেম্বর মানিকগঞ্জ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস নোয়াখালি জেলায়। পিতা খানবাহাদুর আবদুল হালিম চৌধুরী ছিলেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। ১৯৪১ সালে মুনীর চৌধুরী ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাস করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে বি.এ. অনার্স (১৯৪৬) ও এম.এ. (১৯৪৭) এবং ১৯৫৪ সালে বাংলায় এম.এ. পাস করেন। পরে ১৯৫৮ সালে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভাষাতত্ত্বে আবার এম.এ. ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি ও বাংলা বিভাগের (১৯৫০-'৭১) অধ্যাপক ছিলেন। মুনীর চৌধুরী সাহিত্যচর্চায় কৃতিত্ব অর্জন করেন মূলত প্রগতি লেখক ও শিল্পীসংঘের সঙ্গে যুক্ত থাকা অবস্থায়। প্রথম জীবনে তিনি বেশ কিছু ছোটগল্প রচনা করেছিলেন, কিন্তু সেগুলি সংগৃহীত হয়নি। তাঁর প্রধান আকর্ষণ ছিল নাটকের প্রতি। নাটকের মধ্যে আবার একাঙ্কিকার প্রতিই তাঁর ঝোঁক ছিল বেশি।

ছোটগল্পের মতো তাঁর অধিকাংশ একাঙ্কিকারই বিষয় সমকালীন সমাজজীবনের বৈষম্য ও বিকার। এসব একাঙ্কিকার মধ্যে বারোটি সংকলিত হয়েছে 'কবর' (১৯৬৬), 'দণ্ডকারণ্য' (১৯৬৬) এবং 'পলাশী ব্যারাক ও অন্যান্য' (১৯৬৯) গ্রন্থে। সাম্প্রদায়িকতা, বৈপ্লবিক আন্দোলন এবং নিম্নবিত্ত জীবনের করুণ কাহিনি নিয়ে তিনি নাটক রচনা করেছেন। তাঁর কবর নাটকের মতো রাজনৈতিক চেতনার এমন সূক্ষ্ম প্রকাশ বাংলা সাহিত্যে খুব কমই দেখা যায়। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের পটভূমিকায় লেখা তাঁর মৌলিক নাটক 'রক্তাক্ত প্রান্তর'-এর (১৯৫৯) মূল চেতনায় আছে যুদ্ধবিরোধী এবং সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদের উর্ধ্বে নরনারীর প্রেম। তাঁর আরেকটি মৌলিক নাটক 'চিঠি'-তে (১৯৬৬) আন্দোলনের নামে এক শ্রেণির লোকের স্বার্থবোধ ও অগণতান্ত্রিক আচরণ ধরা পড়েছে। মুনীর চৌধুরী বিদেশি নাটকের অনুবাদেও অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে দেশ আর সমাজ গঠনের জন্য নানামুখী কর্মের কারণে তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন। ১৯৭১-এর ১৬ই ডিসেম্বর মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয়ের দুদিন আগে ১৪ই ডিসেম্বর তিনি পাকবাহিনীর সহযোগীদের দ্বারা অপহৃত ও শহিদ হন।

মূল-বক্তব্য

একুশে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২-তে ছাত্ররা পাকিস্তানি প্রশাসন যন্ত্রের ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল বের করলে সরকারি নির্দেশে মিছিলে গুলি চালানো হয়েছিল; মুনীর চৌধুরীর 'কবর' নাটক সে প্রেক্ষাপটে লেখা। ১৯৫৩ সালে প্রথম শহিদ দিবসে জেলে আটক থাকাকালে লুকিয়ে অভিনয় করার জন্য মার্ক্সবাদী তাত্ত্বিক রণেশ দাশগুপ্তের অনুরোধক্রমে মুনীর চৌধুরী এই নাটক রচনা করেন। মুনীর চৌধুরী কারারক্ষীদের চোখ ফাঁকি দিয়ে ১৯৫৩ সালের ১ জানুয়ারি 'কবর' নাটক রচনা করেন। ভাষা আন্দোলন নিয়ে রচিত 'কবর'ই প্রথম সাহিত্যিক প্রতিবাদী প্রয়াস। মেরুদণ্ডহীন পুলিশ ইন্সপেক্টর হাফিজ পাকিস্তান প্রশাসনের অন্যায় (গুলি করে ছাত্র হত্যা এবং লাশ গুম করার ঘটনা) ধামা-চাপা দেয়ার কাজে নিয়োজিত। কিন্তু কবরস্থানের জীবন্ত বাসিন্দা মুর্দা-ফকির লাশের কথা জেনে গেছে ভেবে রাজনৈতিক নেতা ভয় পায়। মুনীর চৌধুরী 'কবর' নাটকের সংক্ষিপ্ত পরিসরে ব্যবহার করেছেন রূপক। তিনি সচেতনভাবেই নাট্যঘটনায় রূপক আরোপ করেছিলেন। নাট্যঘটনায় দেখা যায়, কবর থেকে ছাত্রদের লাশ উঠে এসে বাঁচার কথা বলেছে, দাবি তুলেছে। অর্থাৎ ভাষার দাবিতে যারা নিহত হয়েছিল তারা কবরে না থাকার কথা বলেছে। এ ঘটনা সম্পূর্ণ রূপক; এ রূপকের মধ্য দিয়ে নাট্যকার একইসাথে দুটো ব্যাপার হাজির করতে চেয়েছেন:

এক. যে ছাত্রদের ভাষার দাবিতে মিছিল করার অপরাধে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল, তাদের কারোই স্বাভাবিক মৃত্যুবয়স হয়নি; অপঘাতে মৃত্যু না হলে স্বাভাবিক নিয়মে তাদের বেঁচে থাকার কথা।

দুই. ভাষার দাবিতে যারা ১৯৫২-এর একুশে ফেব্রুয়ারি শহিদ হয়েছিল, তারা দৈহিকভাবে কবরে গেলেও চির অমর হয়ে মানুষের অন্তরগুলোকে থেকে যাবে; অথবা বলা যায় বেঁচে থাকবে। 'কবর' একাঙ্কবিশিষ্ট নাটক। চরিত্র বেশি নেই নাটকে। নেতা, পুলিশ-ইন্সপেক্টর হাফিজ, মুর্দা-ফকির, কবরস্থানের একজন গার্ড ও কয়েকটি ছায়া-চরিত্র। অল্প এ কয়েকটি

চরিত্রের মাধ্যমে মুনীর চৌধুরী ভাষা আন্দোলনের পূর্বাপর প্রেক্ষাপট এবং তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচারী মানসিকতার পরিচয় তুলে ধরেছেন অত্যন্ত সফলভাবে। নাটকে নেতা হচ্ছে–শাসকশ্রেণির অত্যাচারী ও নিষ্ঠুরতার প্রতীক; মুর্দা-ফকির সেই শাসক শ্রেণির বিরুদ্ধে বাঙালি জাতিসত্তার জাগ্রত বিবেক। ইন্সপেক্টর হাফিজ শাসক শ্রেণির তোষামুদে মেরুদণ্ডহীন মধ্যবিত্ত চাকুরে শ্রেণির প্রতিনিধি। ছায়া-চরিত্রগুলো তারুণ্যের প্রতিনিধিত্ব করেছে, যারা মৃত্যুবরণ করার পরও বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশের মধ্য দিয়ে ইতিহাসের পাতায় অমরত্বের ঘোষণা করেছে। সামগ্রিকভাবে 'কবর' ভাষা আন্দোলন নিয়ে রচিত একটি সফল নাটক, যা বাঙালি জাতির বিবেকের প্রতিনিধিত্ব করেছে সমকালে ও উত্তরকালে।

দেশবরেণ্য শিক্ষাবিদ জাতীয় অধ্যাপক ইমেরিটাস প্রফেসর ড. রফিকুল ইসলাম। নজরুল গবেষক হিসেবে তাঁর খ্যাতি অসামান্য। ১৯৫২ সালের মহান ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং ঐতিহাসিক আলোকচিত্র গ্রহণের জন্য তিনি জীবন্ত কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছেন। অধ্যাপক ইসলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে ১৯৫৬ সালে স্নাতকোত্তর এবং 'কাজী নজরুল ইসলাম জীবন ও কবিতা' শীর্ষক অভিসন্দর্ভের জন্য ১৯৭৬ সালে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬০ সালে ভাষাতত্ত্বে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৫৭-৫৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার মাধ্যমে তাঁর কর্মজীবনে প্রবেশ। বহু গ্রন্থের প্রণেতা প্রফেসর ইসলাম তাঁর বর্ণাঢ্য জীবনে বহুবিধ অবদানের জন্য নজরুল একাডেমী পুরস্কার, নজরুল ইনস্টিটিউট পুরস্কার, বাংলা একাডেমি পুরস্কার, একুশে পদক, স্বাধীনতা পদক, চ্যানেল আই লাইফ টাইম পুরস্কার, মার্কেন্টাইল ব্যাংক লাইফ টাইম পুরস্কার লাভ করেন।

ড. সৌমিত্র শেখর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক। তিনি ২০১৪ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত নজরুল গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের (টিএসসি) উপদেষ্টা। বাংলায় স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর উভয় পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণি প্রাপ্ত ড. শেখর সরকারি বৃত্তিপ্রাপ্ত গবেষক হিসেবে মাত্র উনত্রিশ বছর বয়সে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি অর্জন করেন ভারতের রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। সাহিত্যশিল্পানুরাগী এবং মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু বিষয়ে আগ্রহী গবেষক-লেখক। তাঁর গ্রন্থের সংখ্যা ২১। বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, বাংলা একাডেমি, বাংলাদেশ ভাষা-সমিতির জীবনসদস্য এবং নজরুল-পদক (২০১৪) প্রাপ্ত।